মাসুদ রানা

মহাপ্লাবন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



গোটা পৃথিবী জুড়ে
আসছে প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবন!
অফিসে ডেকে নিয়ে জানালেন বিসিআই
চিফ। আগামী বছর তলিয়ে যাবে বাংলাদেশ।
কাজেই, রানা, খোঁজ নাও কী ঘটছে। বসের
নির্দেশে রহস্যময় অ্যাসাইনমেন্টে জড়িয়ে গেল
রানা। চিনা বিলিয়নেয়ারের পেটের খবর জানতে
গিয়ে বন্দি হলো দুর্গম এক দ্বীপে। রানা ও
সোহেলের গর্দান নিতে কুখ্যাত তলোয়ারে শান
দিচ্ছে ভয়ঙ্কর খুনি ওরে চিচিওয়া!

এদিকে রানা যে খুন করতে চলেছে
জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে, সেটা ঠেকাবে কে?
মহা জটিল অবস্থা। ক'দিন পর পৃথিবীর উঁচু পর্বতের
চূড়াগুলো ছাড়া আর সবই ডুবে যাবে পানির নিচে! মরিয়া
হয়ে উঠল রানা। নিশ্চিত মৃত্যুর আগে লড়বে প্রাণপণে!



মাসুদ রানা ৪৫৮

মহাপ্লাবন

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7458-0

সেবা প্রকাশনী

একশ' পঞ্চান্ন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে কোলাজ
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-458
MAHAPLABON
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

এক

ঘোড়ায় চেপে তুমুল বেগে দুই সেনাবাহিনী মুখোমুখি হতেই চারপাশ ভরে উঠল তলোয়ারের ঝনঝনাৎ আওয়াজে।

সময়টা পনেরো শ' চৌষট্টি সাল।

মধ্য জাপানের পাহাড়ি এলাকা।

স্যাডলে ঝুঁকে নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়ছে পাখোয়াজ যোদ্ধা ইউসেই হায়াশি। আক্রমণ এলে ঠেকিয়ে দিচ্ছে শত্রুর তলোয়ার বা বর্শা, দেরি হচ্ছে না পাল্টা হামলা করতে। বিশ্ববিজয়ী সম্রাট অ্যালেকযাণ্ডারের মতই নিখুঁত তার তলোয়ারবাজি। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের জন্যে স্পার নেই, কারণ ওগুলো ব্যবহার করে না সামুরাই যোদ্ধারা।

রঙচঙে আর্মার পরনে ইউসেই হায়াশির দু'কাঁধে কাঠের বোর্ড, হাতে ভারী গ্লাভ, মাথায় স্ট্যাগ হরিণের শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ। হাতের চকচকে কাতানা থেকে ছিটকে উঠছে সূর্যের সোনালি আলো।

কবজির মোচড়ে কাছের আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র করল হায়াশি, পরক্ষণে উল্টো দিকে গেল তলোয়ারের ফলা। তাতে দু'টুকরো হলো আরেক শত্রুর অস্ত্র। লোকটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতেই বর্শা হাতে হায়াশির ওপর হামলে পড়ল তৃতীয় শত্রু। ধারালো ফলা হায়াশির পাঁজরে গাঁথতে চাইলেও সেটা ঠেকাল ভারী ধাতুর বর্ম, অক্ষত রয়ে গেল সামুরাই যোদ্ধা। পরক্ষণে ঘুরেই প্রচণ্ড বেগে শত্রুর মাথায় কোপ বসাল সে।

মাথা থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত দু'ভাগ হলো শত্রুর দেহ।

শত্রুমুক্ত হয়েই আর্মার পরা ঘোড়া চরকির মত ঘুরিয়ে নিল হায়াশি। আকাশে দু'পা ছুঁড়ে তীরবেগে ছুটল রণ-প্রশিক্ষিত জানোয়ার। সামনের দুই লোহার নাল নামল দুই শত্রুর মুখে। ক্ষত-বিক্ষত লাশ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তৃতীয় যোদ্ধার ওপর হুমড়ি খেল হায়াশির ঘোড়া। এদিকে চারপাশ থেকে হায়াশিকে ঘিরে ফেলেছে একদল সৈনিক।

ডানে ঘুরে তাকাল হায়াশি, পরক্ষণে বামে। এসেছিল শোগানের বিরুদ্ধে লড়তে, অথচ সংখ্যায় তার সৈনিক বহু গুণ বেশি। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে, ফুরিয়ে এসেছে ওর জীবনের শেষ ক'টি মুহূর্ত।

মৃত্যু নিশ্চিত, তবে খুন হওয়ার আগে খতম করবে আরও শত্রু, তাই ভেবে কাছের সৈনিকদের দিকে উন্মত্তের মত ঘোড়া ছোটাল হায়াশি। কিন্তু ও আক্রমণ করবে দেখে আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ তৈরি করল শত্রুরা। বাড়িয়ে ধরেছে ঢাল ও বর্শা। ওদিকে সুবিধা হবে না বুঝে অন্য আরেকদল সৈনিকের দিকে চলল হায়াশি। কিন্তু তারাও হুঁশিয়ার, থমকে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা।

তাতে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল হায়াশির। এরা বোধহয় বন্দি করতে চায় ওকে। সেক্ষেত্রে তাদের নেতা শোগান চাইবে, যেন সবার সামনে তলোয়ার দিয়ে নিজের পেট চিরে আত্মহত্যা করে ও। কিন্তু লড়াই না করে কাপুরুষের মত জীবন দেবে না হায়াশি!

ঘোড়া নিয়ে নানাদিকে যেতে চাইল সে। কিন্তু প্রতিবার পদাতিক সৈনিকরা বর্শা বা তলোয়ার তুলে আটকে দিল পথ। বাধ্য হয়ে ঘোড়া থামাল হায়াশি। ওটার জন্যেই বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, নইলে বহু আগেই খুন হতো।

'মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে লড়ো!' শত্রুদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল হায়াশি, 'সম্মান বলে কিছু থাকলে লড়ো!' ডানে তাকাল

জান্তব, চাপা গর্জন শুনে। তীরের মত উড়ে এল দীর্ঘ বর্শা। কিন্তু অবিশ্বাস্য বেগে এক কোপে ওটার কাঠের দণ্ড কাটল হায়াশি। একইসময়ে সরাল লোহার ছুটন্ত ডগা। দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ল শত্রুর অস্ত্র।

'ওকে খুন করবে না!' সৈনিকদের পেছন থেকে বলে উঠল কেউ। 'ওর মাথা শুধু আমার!'

ওই নির্দেশ শুনে থমকে গেছে সৈনিকরা।

ঘিরে রাখা একদল সৈনিকের মাঝ থেকে বেরোল এক অশ্বারোহী। পরনে সিল্কের রঙিন পোশাক। চট্ করে তাকে চিনল ইউসেই হায়াশি। ওই লোকের বুকে সোনালি বর্ম, মাথায় ডানাওয়ালা শিরস্ত্রাণ।

আজ সত্যিই লড়তে এসেছে স্বয়ং শোগান!

'সোসুকে সেইটো!' উঁচু গলায় বলল হায়াশি। 'ভাবিনি আমার সঙ্গে লড়তে সাহস পাবে!'

'তুমি নির্লজ্জ বেঈমান, তাই খতম করতে আসতেই হলো,' খাপ থেকে সড়াৎ শব্দে তলোয়ার বের করল সোসুকে সেইটো। হায়াশির তরবারির মত হলেও তার কাতানার ফলা পুরু এবং কালচে। 'সামন্ত রাজা হিসেবে তুমি ছিলে আমার অনুগত, অথচ যোগ দিলে বিদ্রোহী দলে!'

'তুমিও কথা দিয়েছিলে শান্তিতে থাকতে দেবে সাধারণ মানুষকে, অথচ নির্বিচারে খুন করছ, সব লুঠপাট করে নিয়ে যাচ্ছ!'

'ভুল, জমি সব আমার!' কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিল শোগান। 'জমি বা তোমাদের প্রভু আমি! যা আগেই আমার, তা আবার চুরি করে কেউ! তবে তুমি মাফ চাইলে পাবে প্রাণভিক্ষা।'

শিস বাজাল শোগান।

ওই ইঙ্গিত পেয়ে ঠেলে আনা হলো ক'টা বাচ্চাকে। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। শোগানের ভৃত্যদের পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে। ওই চারজনের পেছনে

গিয়ে ছোরা বের করল শোগান। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আমার হাতে হাজারেরও বেশি বন্দি। হেরে গেছে তোমার বিদ্রোহীরা। এবার কে বাঁচাবে তোমাদের গ্রাম? তবে তুমি আত্মহত্যা করলে প্রাণে বাঁচবে অন্যরা। আর যদি লড়তে চাও আমার সঙ্গে, তুমি খুন হওয়ার পর বাঁচতে দেব না কাউকে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মহিলা, শিশু বা পুরুষ— রক্ষা নেই কারও! পুড়িয়ে ছাই করে দেব তোমাদের গ্রাম!'

এমনই হবে, জানত হায়াশি। তবে আশার কথা: শোগানের অনর্থক নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তার সেনাবাহিনীর অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিকরা। আজ হোক বা কাল, ঠিকই টনক নড়বে তাদের। এ কথা ভেবেই হায়াশির বুকে জাগল ক্ষীণ আশা। শোগানকে খুন করলে হয়তো তার দলের লোক ভাববে, বন্ধ করা উচিত এই অকথ্য নির্যাতন। তাতে ফিরবে এই এলাকায় শান্তি।

কীভাবে দলের সবাইকে বাঁচাবে, ভাবছে হায়াশি। শক্তিশালী, দক্ষ এবং সুচতুর যোদ্ধা শোগান। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা কম নয় তার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার গায়ে নেই রক্ত, ঘাম বা মাটির চিহ্ন। বহু দিন নিজের প্রাণরক্ষা করতে লড়তে হয়নি শোগানকে।

'কী হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?'

পা দিয়ে প্রিয় ঘোড়ার পেট স্পর্শ করল হায়াশি, পরক্ষণে তেড়ে গেল শোগানের দিকে। হাতের তলোয়ার তুলেছে মাথার ওপর।

ধীর প্রতিক্রিয়া দেখাল শোগান। শেষসময়ে হামলা ঠেকাতে সামনে বাড়াল ঘোড়া। হায়াশির বাম পাশ কাটিয়ে গেল সে।

ঘোড়া চরকির মত ঘুরিয়ে নিয়ে আবারও পরস্পরের দিকে ছুটল দুই যোদ্ধা। এবার সৈনিকদের তৈরি বৃত্তের ঠিক মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো দুই ঘোড়ার। সামনের দুই পা আকাশে

তুলল জানোয়ার দুটো। স্যাডল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল দুই যোদ্ধা। আগে মাটি ছাড়ল হায়াশি, লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে তলোয়ার চালাল শোগানের বুক লক্ষ্য করে।

নিজ তলোয়ার দিয়ে আড়াআড়িভাবে হায়াশির তলোয়ার সরিয়ে দিল শোগান। তবে ঝট করে ঘুরেই ওপর থেকে তার মাথার ওপর তলোয়ার নামাল হায়াশি। হামলাটা ঠেকিয়ে দিল শোগান।

দুই তলোয়ারের প্রচণ্ড সংঘর্ষে চারদিকে ছিটকে গেল আগুনের ফুলকি। উঠে দাঁড়িয়ে একপাশ থেকে হায়াশির মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল শোগান। ছিটকে পড়ল সামুরাই যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ। কেটে গেছে গাল। হায়াশির ধারালো তলোয়ার উড়িয়ে দিল শোগানের কাঁধের কাঠের বোর্ড।

ব্যথা পেয়ে রেগে গেছে শোগান। পাশ থেকে চালাল তলোয়ার। পরক্ষণে সরেই সামনে বেড়ে চিরে দিতে চাইল সামুরাই যোদ্ধার বুক-পেট। খোঁচা মেরে ফুটো করতে চাইল হৃৎপিণ্ড। মাথা লক্ষ্য করে নামাল তলোয়ারের ফলা। এমন প্রচণ্ড আক্রমণ আগে দেখেনি কোনও জাপানি সৈনিক।

তীব্র হামলার মুখে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল হায়াশি। মাটিতে পড়তে পড়তেও সামলে নিল নিজেকে। ওর গলা কাটতে পাশ থেকে সাঁই করে তলোয়ার চালাল শোগান। মাথা কাটা পড়ত হায়াশির, তবে তলোয়ারের চ্যাপ্টা পাত দিয়ে ঠেকিয়ে দিল সে শোগানের তলোয়ার।

শোগানের আঘাত এতই প্রচণ্ড, কয়েক টুকরো হতো সাধারণ তলোয়ার, কিন্তু বেঁকে গিয়েও আবার সিধে হলো হায়াশির অস্ত্রটা। রক্ষা করল মালিককে।

পাল্টা হামলায় একপাশ থেকে শোগান সেইটোর পেট লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল হায়াশি। তার তলোয়ারের ফলা এতই ধারালো, রঙ করা লোহার পাত ও শক্ত চামড়ার ভেস্ট কেটে শোগানের পাঁজর থেকে ফিনকি দিয়ে বের করল রক্ত।

ভূস্বামী আহত দেখে হাঁ হয়ে গেছে সৈনিকরা।

টলমল করে পেছাল শোগান সেইটো। বামহাতে চেপে ধরেছে ক্ষত। বিস্মিত চোখে দেখল হায়াশিকে। 'তোমার তলোয়ার আস্ত রয়ে গেল, অথচ চিনা বাদামের মত ভেঙে গেছে আমার বর্ম! এখন বুঝলাম, গুজব সঠিক। তোমার কাছে আছে কিংবদন্তীর তলোয়ার-নির্মাতা মাসামিউনের অস্ত্র।'

গর্বের সঙ্গে ঝকঝকে তলোয়ার ওপরে তুলল হায়াশি। 'এটা পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। তার আগে তিনি পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। আমার দাদা পান তাঁর বাবার কাছ থেকে। মাসামিউনের তৈরি সেরা তলোয়ার এটা। আর এ দিয়েই তোমার নোংরা জীবনটা খতম করব।'

দম নিতে এবং ভালভাবে দেখার জন্যে শিরস্ত্রাণ খুলল শোগান। মাথা দুলিয়ে বলল, 'সত্যিই ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তবে তোমার লাশের হাত থেকে নেব, কারণ আমার তলোয়ারটা আরও ভাল। রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত এটার পাত।'

শোগানের হাতের কাতানা চিনল হায়াশি। ওটা তৈরি করেছে জাপানী উপকথার আরেক তলোয়ার প্রস্তুতকারী মিউরামাসা। সে ছিল তলোয়ার জাদুকর মাসামিউনের সাক্ষাৎ শিষ্য।

কিংবদন্তী অনুযায়ী: তিক্ত হয়েছিল দুই তলোয়ার কর্মকারের মন। গুরু মাসামিউনের প্রতি মিউরামাসার অন্তরে জমেছিল প্রবল হিংসা ও ঘৃণা। তাই কালো জাদু দিয়ে নিজ অস্ত্রের ভেতর মনের সবটুকু তিক্ততা ঢেলে দিয়েছিল সে। এসব তলোয়ার দখল, ধ্বংস ও মৃত্যুর বাহক। অন্যদিকে, মাসামিউনের অস্ত্র সবসময় ন্যায়ের পক্ষে থাকে। কাজে লাগে শান্তি নিশ্চিত করতে।

শ্রুতি যেমনই হোক, কখনও কখনও রয়ে যায় তাতে কিছু সত্য।

'কালো পাতের ওই তলোয়ারকে বিশ্বাস করলে নিজেই

শেষ হবে তুমি,' সাবধান করার সুরে বলল হায়াশি।

'হয়তো, তবে তার আগে কেটে নেব তোমার মাথা!'

বৃত্তের মাঝে মুখোমুখি হয়ে ঘুরছে দু'যোদ্ধা। স্বাভাবিক করতে চাইছে শ্বাস। তৈরি হচ্ছে শেষ হামলার জন্যে। ঘোড়া থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে হায়াশি, খুঁড়িয়ে হাঁটছে। শোগান সেইটোর পাঁজরের ক্ষত থেকে ঝরছে রক্ত। একটু পর খুন হবে দু'জনের যে-কোনও জন।

খুব সতর্ক হয়ে হামলা করতে হবে, ভাবছে ইউসেই হায়াশি। নইলে ওকে খুন করবে শোগান সোসুকে সেইটো। ভূস্বামী মারাত্মকভাবে আহত হলেও প্রাণের ভয়ে লোকদের বলবে, ওর ওপর হামলা করতে। তা যদি ঘটে, হায়াশির হাতের এই অপূর্ব সুন্দর তলোয়ার বাঁচাতে পারবে না ওকে।

কাজেই এমন হামলা করতে হবে, যাতে এক আঘাতে খুন হয় শোগান।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে হঠাৎ থমকে গেল হায়াশি। দাঁড়াল চিরকালীন সামুরাই যোদ্ধার ভঙ্গিতে— এক পা পেছনে, অন্য পা সামনে। উরুর কাছে কোমরের পাশে দু'হাতে ধরেছে তলোয়ারের বাঁট।

'তোমাকে কিন্তু ক্লান্ত লাগছে,' টিটকারির সুরে বলল শোগান।

'লড়ে দেখো ক্লান্ত কি না,' দর্পের সঙ্গে জানাল হায়াশি।

জবাবে নিজেও আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিমা করল শোগান। পা দেবে না ফাঁদে।

হামলা বাধ্যতামূলক বুঝে ঝড়ের বেগে এগোল হায়াশি, কয়েক স্তরের লোহার পাত বা বর্ম দু'পাশে প্রসারিত হলো পাখির ডানার মত। কাছাকাছি পৌঁছে শোগানের গলা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল হায়াশি। কিন্তু লোহার পাতভরা গ্লাভ বাড়িয়ে আক্রমণ ঠেকাল শোগান। নিজের তলোয়ারের ধারালো ফলা সরাসরি নামাল হায়াশির বাহুর ওপর।

চিরচির করে কাটল হায়াশির বাহুর ত্বক ও মাংস। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা সয়েও ঘুরেই নতুন হামলা চালাল সে শোগানের ওপর। হায়াশির প্রবল আক্রমণের মুখে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল শোগান। প্রথমে বামে তারপর আবারও ডানে সরল। তাল সামলাতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে দুই পা। ফোঁস-ফোঁস করে পড়ছে শ্বাস। হায়াশির তুমুল হামলা সামলাতে না পেরে কাত হয়ে বাচ্চা এক বন্দির পাশে বসে পড়ল সে। এবার এক কোপে কল্লা কাটবে সামুরাই যোদ্ধা হায়াশি। কিন্তু প্রাণের ভয়ে নিজের সামনে বাচ্চাটাকে টেনে নিল শোগান সোসুকে সেইটো।

এদিকে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে বিদ্যুদ্বেগে অস্ত্র নামিয়ে এনেছে হায়াশি। তবে একেবারে শেষসময়ে অন্যদিকে সরাল ফলা। তাতে শোগান বা বাচ্চাটা রক্ষা পেলেও হায়াশির ক্ষুরধার তলোয়ারের ফলা শোগানের গোড়ালিতে লেগে গাঁথল পদদলিত কাঁচা মাটিতে।

হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে তলোয়ার উপড়ে নিতে চাইল হায়াশি, কিন্তু ওই একমুহূর্তই প্রয়োজন ছিল শোগানের। বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দু'হাতের জোরে হায়াশির ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ বসাল সে। চোখের পলকে খুন হলো সামুরাই যোদ্ধা। ধপ্ করে মাটিতে পড়ল কবন্ধ। পরের সেকেণ্ডে একটু দূরের মাটিতে পড়ে বলের মত গড়িয়ে থামল মুণ্ডুটা।

কিন্তু হঠাৎ বসা থেকে উঠে সামনে বাড়তে গিয়ে মচকে গেছে শোগানের রক্তাক্ত, আহত গোড়ালি, মাটিতে আছড়ে পড়ছে বুঝে হাত বাড়িয়ে পতন ঠেকাতে চাইল সে। তাতে নিজের বুকের দিকেই তাক হলো তলোয়ারের ডগা।

হায়াশির ভেদ করা বর্মের জায়গা দিয়ে পড়পড় করে তলোয়ারটা ঢুকল সোসুকে সেইটোর হৃৎপিণ্ডে। পাণ্ডবদের দাদু তীরবিদ্ধ ভীষ্মের মতই মাটি থেকে ওপরে রয়ে গেল শোগান।

প্রাণের ভয়ে আর্তচিৎকার দিতে চাইল, কিন্তু মুখ থেকে বেরোল না টুঁ শব্দ। গেঁথে রইল নিজের তলোয়ারে। কারুকাজ করা কালচে পাত বেয়ে নামল তাজা লাল রক্ত।

লড়াই সত্যিই শেষ!

লড়তে লড়তে ক্লান্ত শোগানের সৈনিকরা। তা ছাড়া, এখন নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। বহু সপ্তাহের পথ দূরে তাদের বাড়ি। কাজেই আরও গ্রাম না পুড়িয়ে নিজেদের মৃত যোদ্ধাদের নিয়ে ফিরতি পথ ধরল তারা। তাদের কাছে রয়ে গেল মাসামিউনের চকচকে তলোয়ার ও তাঁর স্যাঙাতের রক্তে ভেজা কালচে অস্ত্র।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল শোগান সোসুকে সেইটো ও সামন্ত রাজা ইউসেই হায়াশির লড়াইয়ের কাহিনী। চিরকালের মতই বাস্তব ঘটনায় সাধারণ মানুষ যোগ করল তাদের অলীক কল্পনা।

হায়াশির কাতানার স্রষ্টা জাপানের সর্বকালের সেরা তরবারি-কর্মকার মাসামিউনে, তাই তাঁর নামেই ওই তলোয়ারের নাম হলো: হঞ্জো মাসামিউনে। প্রচলিত কথা অনুযায়ী: পাতলা চাবুকের মত বাতাস কাটলেও, প্রায় দু'ভাঁজ হলেও ভাঙত না ওটা। ওই তলোয়ার থেকে ছিটকে বেরোত আলো, তাই অন্ধ হতো প্রতিপক্ষ। ওই তলোয়ারের পাত এতই নিখুঁত, হায়াশি চোখের কাছে ধরতেই দেখেছিল রামধনুর সাত রঙ ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়েছে ওটা।

বিখ্যাত হয়েছে হঞ্জো মাসামিউনে, আর কুখ্যাত হয়েছে শোগানের কালচে তলোয়ার। সবাই বলত, শোগানের রক্ত পান করে আরও কালচে হয়েছে ওটা। নাম দেয়া হলো: খয়েরি তলোয়ার। বহু বছর ধরে ও-দুটোকে নিয়ে উপকথার বোঝা জমল মানুষের মনে। যারা পেয়েছে ওই দুই তলোয়ার, হাতে এসেছে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতা। কিন্তু শেষে নিজেরাই খুন হয়েছে করুণভাবে।

শত শত বছর ধরে দুই তরবারি ঘুরল সামুরাই যোদ্ধা বা বিদ্রোহী নেতাদের হাতে হাতে। পরে হয়ে উঠল জাপানের জাতীয় সম্পদ। আমজনতা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত, ক্ষমতাশালী পরিবারে রয়েছে বিখ্যাত ও কুখ্যাত দুই তরবারি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল ও-দুটো।

দুই

মহাচিনের শাংহাই শহর থেকে মাত্র নব্বুই মাইল পুব সাগরে ডুব দিলে যে-কেউ ভাববে, পেয়েছে সে সত্যিকারের নিমজ্জিত স্বর্গ। এ মুহূর্তে সে স্বর্গের দিকে নেমে চলেছে ধূসর ছোট একটা সাবমারসিবল। ওপর থেকে আসছে সূর্যের সবজেটে-সোনালি রোদ। সাগরের মেঝেতে বয়ে যাওয়া স্রোতে দুলছে বাদামি সামুদ্রিক-শৈবাল। ডুবোজাহাজ দেখে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মাছ। দূরে নীল অসীমে হাঁ মেলেছে বিশাল ছায়া, ওটা প্রকাণ্ড হলেও নিরীহ ওয়েইল শার্ক বা তিমি হাঙর—চওড়া মুখ হাঁ করে প্রাণপণে পেটে পুরছে পানি, ও খুদে সব প্ল্যাঙ্কটনের ঘোলাটে মেঘ।

সাবমারসিবলের নাকের কাছে কমাণ্ড চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর উই হ্যানত্যান, মুগ্ধ হয়ে দেখছেন চারপাশের সাগর ও বিচিত্র সব প্রাণী।

পাশের চেয়ার থেকে জানাল নারীকণ্ঠ, 'একটু পর পৌঁছুব সরীসৃপের চোয়ালে।'

তথ্যটা পেয়ে মৃদু মাথা দোলালেন ডক্টর হ্যানত্যান। চোখ

রেখেছেন বাইরের দুনিয়ায়। আর দেখবেনই বা না কেন, আগামী পুরো একটা মাস প্রাকৃতিক আলো থেকে বঞ্চিত হবেন তিনি।

সমুদ্র-শৈবাল ভরা মেঝে পেছনে ফেলে সামনে পড়ল প্রবালের রঙিন মাঠ, ওপাশেই ভি আকৃতির ক্যানিয়ন। প্রথমে মনে হবে ওই ক্যানিয়ন বড়জোর সরু কোনও ফাটল। দেখতে অনেকটা খোলা মুখের মত।

ওটাই সরীসৃপের চোয়াল বা সার্পেন্ট'স জ'।

ভাসতে ভাসতে বা উড়তে উড়তে ক্যানিয়নের ওপরে পৌঁছুল সাবমারসিবল। নিচে সরাসরি অতলে নেমেছে সাগরের মেঝে।

'নেমে যাও,' নির্দেশ দিলেন ডক্টর হ্যানত্যান।

সাবমারসিবলের কন্ট্রোল নাড়ল মহিলা পাইলট। খুঁত নেই তার কাজে। দরকারি সব রসদ নিয়ে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে নামতে লাগল খুদে ডুবোজাহাজ।

পাঁচ শ' ফুট নামতেই হারিয়ে গেল সূর্যের আলো। নয় শ' ফুট গভীরতায় আবারও আলো দেখলেন হ্যানত্যান। তবে এবারের আলো প্রাকৃতিক নয়, আসছে ক্যানিয়নের পাশের দেয়ালে গেঁথে রাখা স্থাপনা থেকে।

কিছু মডিউলের ওপর বসিয়ে দেয়া ছোটখাটো এক বাড়ি থেকে আসছে আলো। কেউ নেই লিভিং রুমের কাঁচের ওদিকে। জড়িয়ে পেঁচিয়ে ক্যানিয়নের মেঝে ভেদ করে নেমেছে সব মডিউল। ওখানে অসংখ্য পাইপ ও টিউব।

'আশা করি ভুল হবে না ঠিকভাবে ডক করতে,' বললেন ডক্টর হ্যানত্যান।

'অবশ্যই, স্যর। অপেক্ষা করুন।'

প্রথমবারের মত পাইলটের দিকে তাকালেন ডক্টর। মহিলার চোখে নিস্পলক, নির্বিকার দৃষ্টি। গায়ের ত্বক ও ঠোঁট লালচে। দেখতে ভাল, কিন্তু নির্মাতা তাকে দেয়নি মাথার চুল

বা গায়ের রোম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুক-পেটের সব মেশিনারি।

ডক্টর হ্যানত্যান ভাল করেই জানেন, এ রোবটের প্রতিটা হাড় ও জোড়া তৈরি হয়েছে টাইটেনিয়াম দিয়ে। ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে ছোট ছোট হাইড্রলিক পাম্প, সার্ভো ও অসংখ্য তার। শেষেরগুলো কাজ করছে সাদা প্লাস্টিকের বুক, পেট ও উরুর প্যানেলের নিচে রক্তবাহী শিরার মত। নির্মাণকারীরা যতই ভাবুক তাদের রোবট মানুষের বিকল্প, দেখতে এখনও ওটা ম্যানিকিনের মতই। তারচেয়েও বড় কথা, পাইলটের শক্তিশালী কবজি ও আঙুল স্টিলের তৈরি। দরকারি কিছু ধরার জন্যে আঙুলের ডগায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে রাবারের খাপ।

ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডক্টর হ্যানত্যান মনে মনে প্রশংসা করছেন এই রোবটটাকে। তবে সত্যিকারের মানব সৌন্দর্য নেই যান্ত্রিক মানবীর। ডক্টর ভাবলেন: কে জানে, কেন সুন্দর মুখ ও কোমল কণ্ঠ দিলেও মহিলা রোবটকে দৈহিক রূপ দেয়নি নির্মাতারা। আসলে শেষ হয়নি তাদের সব কাজ। মানুষ আর মেশিনের মাঝে আটকা পড়েছে রোবটিক সুন্দরী।

ডক কলারে মৃদু শব্দে সাবমারসিবল আটকে যেতেই ভিউ পোর্ট দিয়ে ওদিকে তাকালেন ডক্টর। রিনরিনে কণ্ঠে বলল রোবট: 'কনফার্ম্ড্। সমস্যা নেই ডকিঙে। ঠিক জায়গায় রয়েছে সিল।'

দেরি না করে সিট ছেড়ে বোঁচকা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর, এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেললেন সাবমারসিবলের ইনার ডোর। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল রোবট, ঘুরেও দেখল না প্রফেসরকে। নির্বিকার, নিষ্পলক চোখ সরাসরি সামনে।

না, আধামানুষও হয়নি এই রোবট, ভাবলেন ডক্টর হ্যানত্যান। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন ক্যাটারপিলারে ভর করে চলছে কিছু ধীর গতির মেশিন। বিড়বিড় করলেন তিনি, 'সাবমারসিবলের পাইলটের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় এরা!'

ফোর্কলিফটের স্বয়ং নিয়োজিত প্যালেটের মত এসব মেশিন। সাবমারসিবল থেকে নেবে রসদ ও ইকুইপমেন্ট, পৌঁছে দেবে নির্দিষ্ট স্টোররুমে, এজন্যে কারও নির্দেশ লাগবে না।

একইসময়ে অন্য মেশিন সাবমারসিবলের পেটে তুলবে "ওর"। জিনিসটা আগে কখনও দেখেনি মানুষ। সাগরের বহু নিচ থেকে তোলা হচ্ছে এক ধরনের অ্যালয়। টাইটেনিয়ামের চেয়ে শক্ত, অথচ তিনগুণ হালকা। তা ছাড়া, আরও রয়েছে নানা উপযোগ, যেগুলো নেই পৃথিবীর অন্য অ্যালয় বা পলিমারে।

ডক্টর হ্যানত্যানের মত কম মানুষই জানেন এই অ্যালয়ের কথা। তাঁরা সংক্ষেপে নাম দিয়েছেন: *সোনালি শিখা*। ওটা পেতেই খনির কাছে তৈরি করা হয়েছে সাগরতলে এই স্থাপনা।

সব গোপন রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখছে স্বয়ংক্রিয় মেশিন বা রোবট। এ স্টেশনে একমাসের জন্যে থাকে একজন করে ইঞ্জিনিয়ার। তার অধীনে কাজ করে স্বয়ংক্রিয় চার শ' মেশিন কর্মী।

এরা নানাধরনের। চিনা ডুবোজাহাজের পাইলটের মত দেখতে রোবট কম। একদলের নাম: জলকন্যা। হাত ও ক্যামেরাসহ চৌকো মাথা। পিঠে প্রপালশন প্যাক। মানুষের মতই এরা নানাদিকে যেতে পারে সাঁতার কেটে।

আরেকটি দল যেন সাধারণ রোভ। ঘুরে ঘুরে দেখে সাগরতল। এ ছাড়া, রয়েছে অন্যান্য রোবট, সেগুলো নির্মাণ এলাকায় ভারী মেশিন নতুন করে মেরামত করে। সাগরের বহু গভীরে খনন কাজে ব্যস্ত রয়েছে কিছু নতুন মডেলের রোবট। নিচের মডিউলের কাছে ছোট এক পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের মাধ্যমে ব্যাটারি রিচার্জ করে এরা। আগে ওই রিঅ্যাক্টর ছিল চাইনিয অ্যাটাক সাবমেরিনের পেটে।

প্রথমবার সাগরতলের স্টেশন দেখে হতবাক হন ডক্টর হ্যানত্যান! ঘুরে ঘুরে দেখেছেন চারপাশ। তারপর তাঁকে দেয়া হলো স্থাপনার ওপরের দিকে কাজ। ওখানে আছে বসবাস উপযোগী ঘর। তবে আজকাল আর প্রায় আসাই হয় না সাগরতলে।

হনহন করে হেঁটে অফিসে ঢুকলেন হ্যানত্যান। আগামী পুরো তিরিশটা দিন এটাই হবে তাঁর বাড়ি।

অধীর হয়ে ডেস্কের পেছনে বসে অপেক্ষা করছেন চাইনিয পিপল্‌স্ লিবারেশন নেভির কমাণ্ডার ফু মানচু। ডক্টরকে দেখে মেঝে থেকে তুলে নিলেন ডাফেল ব্যাগ।

'আপনি আগেই তৈরি?' হাসলেন ডক্টর হ্যানত্যান।

'পুরো একমাস চুপ করে বসে থাকার পর আপনিও বাড়ি ফিরতে চাইবেন,' বললেন ফু মানচু, 'সঙ্গী বলতে তো শুধু এইসব মেশিন।'

মৃদু হাসলেন হ্যানত্যান। 'আমার কিন্তু ভালই লাগে। স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক জুড়তে হবে না, আজ আমি ডিনার রাঁধব না।'

মাথা নাড়লেন মানচু। ভাবছেন, নির্বিকার চেহারার পলকহীন রোবটের চেয়ে ঝগড়াটে বউও ঢের ভাল।

'আমাদের স্ট্যাটাস কী?' কাজের কথায় এলেন ডক্টর হ্যানত্যান।

'উত্তোলন কমে গেছে,' বললেন কমাণ্ডার। 'গত মাসের চেয়েও কম। আপনি তো জানেন, দু'মাস আগের চেয়েও কম "ওর" পাওয়া গেছে গত মাসে।'

'ফুরিয়ে আসছে খনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যানত্যান।

মাথা দোলালেন কমাণ্ডার মানচু। 'জানি এই ধাতু কত দামি। আপনারা বলেছেন, কী হবে সোনালি শিখা পেলে। কিন্তু এমন কোনও উপায় পাওয়া যায়নি যে আরও তোলা যাবে। মন্ত্রণালয় থেকে কেউ না কেউ অভিযোগ তুলবে, খামোকা কোটি কোটি ডলার খরচ করছি আমরা।'

কথাটা মানতে পারলেন না ডক্টর হ্যানত্যান। টাকার অভাব নেই চিন মন্ত্রণালয়ের। তার ওপর, তাদের পাশে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে রোবট নির্মাতা চাইনিয বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটন। না, টাকা সমস্যা নয়। তবে কমপিউটার কন্সোলে চোখ যেতেই চমকে গেলেন। ভাবতে পারেননি এত কমে গেছে সোনালি শিখার উত্তোলন। 'সারা মাসে এক শ' কিলো? ব্যস?'

'ফুরিয়ে গেছে শিরা,' বললেন কমাণ্ডার মানচু। 'আমি নিজে চাই না বসদের এ কথা বলতে।'

খড়মড় করে উঠল ইন্টারকম। ওই কণ্ঠ মানবীয় এবং পুরুষের। 'সিএল-ওয়ান রিপোর্ট দিচ্ছি। তৈরি ডিপ-বেসিন ইঞ্জেক্টর। চার্জ করা হয়েছে হার্মোনিক রিযোনেটরগুলো। ইমপ্যাক্ট রেঞ্জ, যেড মাইনাস ওয়ান হাণ্ড্রেড ফোর্টি।'

স্টেশনের অনেক নিচে পরবর্তী খননের জন্যে তৈরি একদল রোবট। আওয়াজ থেকে ডক্টর হ্যানত্যান বুঝলেন, ইঞ্জেক্টর তাক হয়েছে ফাটলের খুব গভীর অংশে। কমাণ্ডার মানচুর চোখে তাকালেন তিনি।

'ভূগর্ভ ভেদ করা সোনার থেকে জানা গেছে, সরাসরি নিচে আছে সামান্য সোনালি শিখা,' বললেন মানচু। 'খনি চালু রাখতে হলে অত গভীরে না খুঁড়ে উপায় নেই। অথবা, বন্ধ করে দিতে হয় মাইনিং।'

অনিশ্চিত অনুভূতি হলো ডক্টর হ্যানত্যানের। অনেক গভীরে খনন করতে গেলে বহু গুণ বাড়বে বিপদের ঝুঁকি।

'আমি নির্দেশ দেব?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার মানচু। 'না সম্মানটা আপনি নেবেন?'

হাত নাড়লেন হ্যানত্যান। 'অর্ডারটা আপনিই দিন।'

ইন্টারকমের বাটন টিপে নির্দিষ্ট কমাণ্ড দিলেন মানচু। 'কাজ শুরু করো। আগের নির্দেশ বাতিল হলো। যত দ্রুত সম্ভব তুলবে ওর। যেন পড়ে না থাকে এক ফোঁটা সোনালি

শিখা। পরবর্তী নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত চলবে কাজ।'

'জী,' জবাবে বলল সিএল-ওয়ান।

ক'সেকেণ্ড পর দূর থেকে এল গুনগুন শব্দ। খনিতে কাজ শুরু হলে সহ্য করতেই হয় স্টেশনের ভেতর এই আওয়াজ। তবে ডক্টর হ্যানত্যান জানেন, দু-এক দিনের ভেতর কানে সহ্য হয়ে যাবে শব্দটা। কাজ বলতে থাকবে না কিছুই। অবশ্য জরুরি মেশিন নষ্ট হলে তখন মেরামত করবেন, বুঝে নেবেন হালচাল, অথবা বদলে দেবেন ব্যাটারি।

'স্টেশন আপনার দায়িত্বে থাকল, স্যর,' বললেন কমাণ্ডার মানচু। ডক্টরের হাতে তুলে দিলেন ছোট একটা ট্যাবলেট কমপিউটার।

'ওপরে ওঠার সময় উপভোগ করুন চমৎকার দৃশ্য,' বললেন হ্যানত্যান, 'আমি যখন নামলাম, রোদে ঝলমল করছিল চারপাশ।'

সূর্যের কথা ভেবে খুশিতে হেসে ফেললেন কমাণ্ডার মানচু। ডাফেল ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে চলে গেলেন দরজার কাছে। ওখান থেকে বললেন, 'এক মাস পর আবারও দেখা হবে, স্যর।'

একাকী হয়ে গেলেন ডক্টর হ্যানত্যান। সময় কাটাবার মত কিছুর জন্যে তাকালেন চারপাশে। ডেস্কে পড়ে আছে অসংখ্য রিপোর্ট ও পেপারওঅর্ক। বিড়বিড় করলেন, 'পারলে এবার বিলিয়নেয়ার হুয়াং এমন রোবট তৈরি করুন, যাতে চুকে যায় এসব ফালতু কাজ!'

হাতে দীর্ঘ সময়, আপাতত কাগজপত্র নিয়ে না বসলেও চলবে। ডেস্কে ট্যাবলেট কমপিউটার রেখে দেয়ালের পাশে রাখা অ্যাকুয়েরিয়ামের কাছে গেলেন তিনি। কাঁচের বাক্সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েক রকমের গোল্ড ফিশ। ফ্যানটেইল, বাবল্ আই ও লায়নহেড। কমাণ্ডার মানচু বলেছেন, বিটা মাছ নাকি অন্য মাছের সঙ্গে বাঁচতে পারে না। তাই তাকের ওপর আরেকটা ছোট অ্যাকুয়েরিয়ামে রয়েছে ওই মাছটা।

কাঁচের এদিক থেকে বিটা ফিশের দিকে তাকালেন হ্যানত্যান। হন্তদন্ত হয়ে নানাদিকে যাচ্ছে ওটা। খনিতে খনন শুরু হতেই অস্থির হয়ে উঠেছে মাছগুলো। শান্ত করতে কৌটা থেকে নিয়ে গুঁড়ো খাবার পানিতে ছড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। খাবারের গন্ধে ব্যস্ত হয়ে পানি সমতলে উঠে এল ওগুলো।

মৃদু হাসলেন ডক্টর। কী অদ্ভুত পৃথিবীর এ জীবন! সাগরতলে বাড়ির ভেতরে কাঁচের ঘরে বন্দি হয়েছে এসব মাছ। বাতাস খুন করবে তাদেরকে, আবার এত গভীর পানির ভেতরে বাতাস না পেলে তিনি নিজেই খুন হবেন। মাছ বা তাঁর কিছুই করার নেই। বড়জোর চেয়ে থাকা যেতে পারে কাঁচের জানালার ওদিকে। গতবারের মত সময় কাটলে আগামী মাসে তাঁর ওজন বাড়বে কমপক্ষে দশ পাউণ্ড। করার কিছুই নেই।

দুই অ্যাকুয়েরিয়ামে আরও খাবার ফেললেন ডক্টর। কিন্তু তখনই হঠাৎ থমকে গেল প্রতিটা মাছ। মনে হলো কাঁচের রঙিন পুতুল। আগে এমন হতে দেখেননি ডক্টর হ্যানত্যান।

অ্যাকুয়েরিয়ামের নিচের দিকে চলল প্রতিটি মাছ। নাড়ছে না পাখনা বা ফুলকা। যেন ড্রাগ দেয়া হয়েছে।

কাঁচের গায়ে টোকা দিলেন ডক্টর। তাতে চমকে গিয়ে নানাদিকে ছুটল মাছগুলো। কাঁচের দেয়ালে বাড়ি খেল ক'টা, যেন নেট দেয়া জানালায় ঢুকতে চাওয়া মৌমাছি। অ্যাকুয়েরিয়ামের নিচে নুড়িপাথর খুঁড়তে লাগল একটা বাবল্ আই মাছ।

বিস্মিত হয়ে তাকালেন ডক্টর হ্যানত্যান। থরথর করে নড়ছে অ্যাকুয়েরিয়ামের পানি। কাঁপতে শুরু করেছে ঘরের চারপাশের দেয়াল। ভয় পেয়ে ক'পা পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর। আরও বাড়ছে খনি খননের আওয়াজ। কিন্তু এত শব্দ হওয়ার কথা নয়! লাফ দিচ্ছে তাকে রাখা বই ও সাজিয়ে রাখা প্রবালের টুকরো। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে

ভাঙল দুই অ্যাকুয়েরিয়াম।

ইন্টারকমের বাটন টিপলেন ডক্টর হ্যানত্যান। কড়া গলায় ডাকলেন খননের দায়িত্বে থাকা রোবটকে। 'সিএল-ওয়ান! দেরি না করে এখনই কাজ বন্ধ করো!'

জবাবে শান্ত কণ্ঠে বলল ওটা, 'দিন অথোরাইযেশন।'

'আমি ডক্টর হ্যানত্যান।'

'কমাণ্ড কোড?' বলল রোবট। 'নতুন কাজ দিতে হলে চাই অথোরাইযেশন।'

ডক্টরের মনে পড়ল, এতদিন কমাণ্ডারের কণ্ঠ শুনেছে সিএল-ওয়ান। এখন কর্তৃত্ব ফলাতে হলে চালু করতে হবে কমপিউটার, তারপর মানচুর কণ্ঠ মুছে সেখানে রেকর্ড করতে হবে নিজের কণ্ঠ।

ব্যস্ত হাতে ট্যাবলেট কমপিউটারের স্ক্রিনে টোকা দিলেন তিনি। টাইপ করতে লাগলেন কমাণ্ড ফাইলে। কিন্তু তখনই শুনলেন, নিচ থেকে এল প্রকাণ্ড সব পাথরের ঠোকাঠুকির ভারী গুড়গুড় আওয়াজ। যেন তুমুল বেগে উঠে আসছে বিকট শব্দের জেট বিমান। আরও বাড়ছে আওয়াজ। থরথর করে কাঁপছে স্টেশন।

মেঝে লাফ দিতেই পা পিছলে পড়লেন হ্যানত্যান। তাঁর মনে হলো ঘনিয়ে এসেছে মহাপ্রলয়। ধাতুর সিল ফাটিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল প্রবল জলরাশি। ফায়ার হোসের ছুঁড়ে দেয়া পানির বহু গুণ জোরে এসে প্রফেসরকে তুলে দেয়ালে আছড়ে ফেলল প্লাবন। দ্রুতগতি গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের মত করুণ হাল হলো ডক্টরের দেহের। ক'সেকেণ্ডে ভরে উঠল প্রতিটি মডিউল। পানির নিচে শ্বাস আটকে মরতে হয়নি, প্রচণ্ড এক আঘাতে মুহূর্তেই মারা গেছেন ভদ্রলোক।

এদিকে খনি অফিসের বাইরে স্টেশন থেকে সরে গেছে সাবমারসিবল। তখনই শুরু হয়েছে কম্পন। ডুবোজাহাজের পুরু দেয়াল ভেদ করেও প্রচণ্ড আওয়াজ শুনছেন কমাণ্ডার

মানচু। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় সামনের জানালা দিয়ে দেখলেন, ওপর থেকে নামছে বিশাল এক পাথরের চাঁই! একইসময়ে সাগরতল থেকে বিস্ফোরণের মত ছিটকে উঠল কাদা, বালি ও পাথর।

'যাও!' পাইলটকে নির্দেশ দিলেন কমাণ্ডার। 'সরে যাও এখান থেকে!'

জড়তাহীন যান্ত্রিক দক্ষতায় কাজ শুরু করল পাইলট, তাতে নেই কোনও ব্যস্ততা।

ওপর থেকে পড়া অ্যাভালাঞ্চ হুড়মুড় করে নামল স্টেশনের ছাতে। পুরো স্থাপনা উপড়ে নিয়ে চলল সাগরতল লক্ষ্য করে। সাবমারসিবলের ওপর তুমুল বৃষ্টির মত ঝরছে নানান জঞ্জাল।

এই বোকা রোবট বুঝবেও না এটা কতবড় বিপদ, ঝুঁকে সাবমারসিবলের থ্রটলে হাত দিলেন কমাণ্ডার মানচু। পুরো সামনে ঠেলতে চাইলেন স্টিক, কিন্তু ওটা শক্ত হাতে ধরে রেখেছে মহিলা রোবট।

'দায়িত্ব ছাড়ো আমার কাছে!' ধমক দিলেন মানচু।

থ্রটল থেকে হাত সরিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে সিটে বসে রইল রোবট। পুরো সামনে থ্রটল ঠেলে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের ভাল্‌ভ্ খুললেন মানচু। পূর্ণ গতি তুলে উঠছে ডুবোজাহাজ।

'ওঠ্! ওঠ্!' বিড়বিড় করছেন মানচু।

এগোতে এগোতে উঠছে সাবমারসিবল। শিলাবৃষ্টির মত পাথরের ঘন এক পর্দা এসে লাগল ওটার গায়ে। ছোটগুলো মুঠোর সমান হলেও বড়গুলো তুবড়ে দিচ্ছে ছাত। ক্ষতিগ্রস্ত হলো প্রপেলার হাউসিং।

ডুবোজাহাজটাকে বিপদ থেকে সরাতে চাইছেন মানচু। কিন্তু বেঁকে গেছে প্রপেলার হাউসিং, সরাসরি পথে চলল না সাবমারসিবল। গতি বাড়লেও ঘুরে গিয়ে ঢুকল বিপজ্জনক এলাকায়।

'না!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন কমাণ্ডার মানচু।

দ্বিতীয় পাথর-বৃষ্টি সরাসরি লাগল সাবমেরিনের নাকে-মুখে। ঠাস্ করে ফাটল ক্যানোপি। গাড়ির সমান বড় এক পাথরের আঘাতে চ্যাপ্টা হলো ডুবোজাহাজের পেট। বালি, মাটি ও ভারী পাথরের জঞ্জালের ওজনে সোজা সরীসৃপের চোয়ালের গভীর মেঝেতে আছড়ে পড়ল সাবমারসিবল।

তিন

যে-কেউ ভাবতে পারে, এটা চমৎকার সবুজ এক পার্ক। আর এ মুহূর্তে দাবার মত রণকৌশলের জটিল কোনও খেলায় মগ্ন দুই লোক। চারপাশে প্রাচীন গাছ, ঘন ঝোপঝাড় ও কালো জলের গভীর পুকুর। কিন্তু বাস্তবে এটা চিন সরকারের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী লোকের বাড়ি। হরেক ধাঁচের স্কাল্পচার করা বাগানে গোপনে ওঁৎ পেতেছে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা। ফুলে ভরা লতাগাছে ঢাকা চারদিকের বারো ফুটি দেয়াল, ওপরে রেযর ওআয়ার। একটু পর পর নির্দিষ্ট জায়গায় সেন্সর। সর্বক্ষণ চারদিকে চোখ রাখছে একদল সশস্ত্র প্রহরী। বিনা অনুমতিতে এ বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করলে বিনা দ্বিধায় গুলি করে খুন করা হবে যে-কাউকে।

উঁচু দেয়ালের বাইরে বিশাল বেইজিঙে কোটি কোটি মানুষের ভিড় ও হৈ-হল্লা। বাড়ির চৌহদ্দির ভেতর শুধু স্বর্গের নীরবতা ও প্রশান্তি।

এ বাড়িতে বহুবার এসেছে বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটন।

তবে আগে কখনও খুচরা আলাপ করেনি বা এত সময় কাটায়নি গুরু ও পরামর্শদাতার সঙ্গে। আপাতত আলাপ করছে না তারা দু'জন, সব মনোযোগ উনিশ বাই উনিশ চৌকো ছকে আঁকা বাদামি বোর্ডে। নানাদিকে সাদা ও কালো বেশ কিছু পাথরের গুটি।

এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন খেলা নিয়ে মেতে আছে দু'জনে। ওই খেলা দাবার চেয়েও পুরনো এবং জটিল। চিনদেশে বলা হয় ওয়েইকিউই, জাপানে ইগো আর কোরিয়ায় বাদুক। পশ্চিমারা সহজ নাম দিয়েছে: গো।

একটা ভাল চাল দিতে পারবে ভেবে পাশের কাপ থেকে সাদা গুটি নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখল লো হুয়াং লিটন, সন্তুষ্ট। প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল স্বর্গের মত বাগান। নিচু গলায় বলল, 'আসার সময় ভেবেছি: আছি হৈ-চৈ ভরা ব্যস্ত শহরে, কিন্তু এখন মোটেই অমন মনে হচ্ছে না।'

লো হুয়াং লিটনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। গড়পড়তা চাইনিয পুরুষের চেয়ে দীর্ঘ। দড়ির মত পেঁচানো হাত-পায়ের পেশি। যে-কেউ বলবে, ঝাঁটার কাঠি। জন্মেছে হংকং-এ। বাবা চাইনিয, মা জাপানি। নামের শেষে পশ্চিমা নাম জুড়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ব্যবসা করতে গেলে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান কোম্পানিগুলোর মালিকপক্ষের বুকের ভেতর।

লো হুয়াং লিটন জন্মাবার আগেই তার বাবা গুছিয়ে নিয়েছিল ছোট এক ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি। অন্য হংকংবাসী ব্যবসায়ীদের মত নাক উঁচু করে ঘুরত না সে, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিল মূল ভূখণ্ডের চিন সরকারের সঙ্গে। ফলে পরে অন্যরা যখন স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেছে, সেসময়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে সে। চিন সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে লো হুয়াঙের বাবা সাধারণ মিলিয়নেয়ার থেকে এক লাফে হয়ে

গেল মস্তবড় বিলিয়নেয়ার। পরের এক দশকে হুয়াঙের বাবা গড়ে তুলল চিনের সবচেয়ে বড় কংগ্লোমারেট ব্যবসা: আইটিআই। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি, ইনকর্পোরেটেড।

বাবা মারা যাওয়ার পর শেষ দশক ধরে নিজেই ব্যবসা করছে লো হুয়াং লিটন। বেইজিঙের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো রেখেইছে, আরও বড় করেছে ব্যবসা। অনেকে বলে, লো হুয়াং লিটন সরকারের পঞ্চম পিলার। টাকা, ক্ষমতা ও সম্মানের এমন এক শিখরে পৌঁচেছে, ভবিষ্যতে কঠিন হবে যে কারও জন্যে তাকে ছোঁয়া। অথচ, বোর্ডের ওদিকে বসে থাকা বয়স্ক লোকটার প্রতিটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে সে।

'নীরব এবং প্রশান্তিময় আবাস জরুরি। হৈ-চৈ বা বাজে আওয়াজ সবসময় বিক্ষিপ্ত করে মানুষের মন।' লো হুয়াঙের মনে হলো শুনল প্রিয় গুরুর রচিত কবিতা। বয়স্ক ভদ্রলোকের মাথাভরা টাক। কানের কাছে দু'গোছা পাকা, সাদা চুল। কুঁচকে গেছে মুখের ত্বক। ঝুলছে ডান গাল।

গত ছয় দশক ধরে চাইনিয কম্যুনিস্ট পার্টির বড় নেতা হিসেবে ক্ষমতার চূড়ায় আছেন যেইন নিং। প্রথমে ছিলেন সাধারণ সৈনিক, পরে হয়েছেন রাজনীতিবিদ। সবসময় ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাকারী। গুজব রয়েছে: তাঁর নির্দেশেই আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্রদেরকে ট্যাঙ্কের নিচে পিষে মেরে ফেলা হয়েছিল তিয়ানানমেন স্কয়ারে। এরপর যেইন নিঙের নির্দেশনাতেই মাত্র একটি রাজনৈতিক পার্টি নীতি বজায় রেখে চিন পা বাড়াল পুঁজিবাদের খোলা দুনিয়ায়।

পার্টির ভেতর একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তাঁর বেসরকারী পদবী: লাও-শি। এর অর্থ, বড় পদে আসীন চূড়ান্ত দক্ষ বৃদ্ধ। তবে লো হুয়াং লিটনের কাছে তা নয়। মনে মনে বলে সে: জ্ঞানী প্রভু।

বোর্ডে হুয়াঙের সাদা একটা গুটির পাশে তাঁর কালো গুটি

রাখলেন লাও-শি। আটকে দিয়েছেন স্যাঙাতের গুটির পথ। নরম সুরে বললেন, 'কী হলো যে এত মন খারাপ?'

কথা বলার সঠিক সময় এসেছে, বুঝল লো হুয়াং লিটন। 'খুব খারাপ কিছু হয়েছে। শেষ করা হয়েছে মাইনিং সাইটের সার্ভে। আমাদের ভয়টা ঠিক। ওই অ্যাভালাঞ্চে ধ্বংস হয়েছে বাইরের সব মডিউল। সরীসৃপের চোয়ালের মেঝে ভরে গেছে কোটি কোটি পাথর আর জঞ্জালে। নষ্ট হয়নি রিঅ্যাক্টর। কিন্তু বিশাল টাকা খরচ না করলে নতুন করে আবারও চালু করা যাবে না ওই প্রজেক্ট।'

'কত টাকা লাগবে?'

মনে মনে অঙ্কটা আরেকবার কষল হুয়াং। 'জঞ্জাল সরাতে এক শ' বিলিয়ন ইউয়ান। স্টেশন মেরামত আর নতুন করে কাজ শুরু করতে... অন্তত আরও পাঁচ শ' বিলিয়ন ইউয়ান। এতে লাগবে বছরের পর বছর। এত সময় লাগত না, কিন্তু সবই করতে হবে গোপনে।'

'ওই গোপনীয়তা অত্যন্ত জরুরি,' বললেন লাও-শি।

'সেক্ষেত্রে খনি থেকে সোনালি শিখা তুলতে লাগবে কমপক্ষে তিন বছর।'

'তিন বছর,' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। পিছিয়ে বসে ডুবে গেলেন চিন্তার জগতে।

'অন্তত তিন বছর,' আবারও বলল লো হুয়াং।

বাস্তবে ফিরলেন লাও-শি। 'দুর্ঘটনার আগে প্রতিমাসে কী পরিমাণ সোনালি শিখা তোলা হচ্ছিল?'

'বড়জোর আধ টন। আরও কমছিল উত্তোলন।'

'উত্তোলন বাড়াবার কোনও উপায় আছে?'

'না বললেই চলে।'

অসন্তুষ্ট হয়ে নাক দিয়ে মৃদু আওয়াজ করলেন লাও-শি। 'তা হলে সাগরের নিচে গর্ত খুঁড়ে অত টাকা আর সময় ব্যয় করলাম কেন আমরা? এর কী কারণ?'

চাপা শ্বাস ফেলল লো হুয়াং লিটন। ভেবেছিল তার পক্ষেই থাকবেন বৃদ্ধ। খনি থেকে সোনালি শিখা তোলার সময় থেকেই এতদিন প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন লাও-শি। প্রথম থেকেই জানেন, চৈনিক যুদ্ধ-কৌশলে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ওই অ্যালয়।

'বিলিয়ন বিলিয়ন ইউয়ান আর প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে বা হবে, কিন্তু ওই "ওর" এমনই জিনিস, আমাদের হাতে না এলেই নয়,' বলল লো হুয়াং। 'আপনি তো জানেন, প্রভু, সোনালি শিখা পৃথিবীর আর কোনও ধাতুর মত নয়। আগে কখনও কেউ দেখেনি এ জিনিস। টাইটেনিয়ামের পাঁচ গুণ শক্ত। পৃথিবীর অন্য কোনও ধাতু থেকে একেবারে আলাদা। তৈরি সম্ভব নয় কোনও ল্যাবোরেটরিতে। ওটার তুলনা নেই। আমরা যদি একবার ওই জিনিস দিয়ে তৈরি করতে পারি যুদ্ধ বিমান, জাহাজ বা মিসাইল, ধরে নেয়া যায় যতই চেষ্টা করুক শত্রুপক্ষ, ধ্বংস করতে পারবে না ওগুলোকে। আরও হাজার হাজার যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগবে সোনালি শিখা, বাদ দিলাম সেসবের কথা। ওই খনি ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও নেই সোনালি শিখা। আপনি তো জানেন, লাও-শি। খরচ এখানে বিষয় নয়। নতুন করে আবারও খনি চালু না করার উপযুক্ত কোনও কারণ নেই।'

কড়া চোখে হুয়াংকে দেখছেন লাও-শি।

বিলিয়নেয়ার ভাবছে, বোধহয় বেশি বলে ফেলেছে সে।

'কী করা উচিত আমাকে শেখাতে এসো না,' বললেন বৃদ্ধ।

মাথা নিচু করে নিল লো হুয়াং। 'আমি বেশি কথা বলে থাকলে দয়া করে মাফ করবেন, লাও-শি।'

চোখের শেকল থেকে বিলিয়নেয়ারকে ছেড়ে আবারও খেলায় মন দিলেন বৃদ্ধ। ঠিক জায়গায় রাখলেন আরেকটা কালো গুটি। 'তোমার কথা আংশিক সঠিক। ওই উপাদান

সত্যিই খুলে দেবে চিনের ভবিষ্যতের পথ। তামার চেয়ে বেশি কাজে লেগেছে ব্রোঞ্জ। ওটা ছিল তখন সেরা। আর পরে ওটার চেয়ে বেশি লোহা। মানুষের ইতিহাসে দেখবে সহজ একটা গল্প— যাদের তলোয়ার বেশি ধারালো, শক্ত আর মজবুত, সে জাতি কেড়ে নিয়েছে অন্যসব জাতির সম্পদ। এ কথা ঠিক, যে দেশের হাতে থাকবে সোনালি শিখা, তারাই হবে পৃথিবীর সেরা জাতি। কিন্তু হিসেবে একটা ভুল করে ফেলেছ তুমি। ফুরিয়ে যাওয়া খনিতে নতুন করে কাজ শুরু করা হবে বড় ভুল।'

ঘাড় কাত করে গুরুকে দেখল লো হুয়াং। 'কিন্তু আর কোথাও তো নেই ওটার ডিপোযিট!'

'এখনও পাওয়া যায়নি,' জবাবে বললেন লাও-শি।

'সম্মানের সঙ্গে বলছি, লাও-শি, বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সোনালি শিখা খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি আমি। কোথাও পাওয়া যায়নি এক তিল। না আফ্রিকা, না দক্ষিণ আমেরিকা, না মধ্যপ্রাচ্য। আমাদের নিজেদের দেশে বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সব দ্বীপে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমরা। কোথাও নেই সোনালি শিখা। দশ হাজার কোর স্যাম্পল তুলেছি সাগর থেকে। সেখানেও নেই। আছে শুধু ওই খনিতে!'

'কথা ঠিক,' বললেন যেইন নিং। 'তবে ক'দিন আগে জানলাম, থাকতে পারে অন্য উৎস। যা ভেবেছি, তার বহু কাছেই আছে ওই খনি।' খেলার বোর্ড দেখালেন তিনি। 'এবার তোমার দান।'

বোর্ডের দিকে তাকাল লো হুয়াং লিটন। কঠিন হলো খেলায় মন দেয়া। সোনালি শিখার বিষয়ে নতুন তথ্য পেয়ে চমকে গেছে সে। বোর্ডে মনোযোগ দিয়ে দেখল, করুণ হাল তার। সাদা গুরুত্বপূর্ণ সব গুটিকে ঘিরে ফেলেছে কালো একদল গুটি। সাদা গুটি অন্যদিকে সরাতে গেলে আরও

জোরালো অবস্থানে যাবেন লাও-শি। এখন হেরে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে বড় কোনও ভুল করেন বৃদ্ধ। 'এবারের চাল দেব না,' জানাল বিলিয়নেয়ার।

'বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত,' মাথা দোলালেন যেইন নিং।

'দয়া করে কি বলবেন, কোথায় আছে অন্য খনিটা?'

লো হুয়াং লিটনের দিকে চেয়ে সামান্য দ্বিধা করলেন বৃদ্ধ, দু'আঙুলে ধরেছেন কালো এক গুটি। 'ওই খনি আছে হনশু দ্বীপে কোথাও।'

একটু পর বলল বিলিয়নেয়ার, 'জাপান? ওদের হোম আইল্যাণ্ডে?'

'হতে পারে সাগরে,' বললেন লাও-শি। 'তবে সম্ভাবনা বেশি দ্বীপেই আছে। আর আমার ভুল না হলে সোনালি শিখা আছে মাটির সামান্য নিচে।'

কথা বলা হয়েছে আবেগহীন কণ্ঠে, কিন্তু শ্বাস আটকে গেল লো হুয়াঙের। 'কী করে জানলেন, গুরু? আরও বড় কথা, সোনালি শিখা কীভাবে পাব আমরা? যদি খুঁজতে গিয়ে জানাজানি হয়, কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা নেবে, আর কখনও ওখান থেকে তুলতে পারব না। হয়তো জাপানিরা সোনালি শিখার খনি বিক্রি করবে আমেরিকান সরকারের কাছে। সেক্ষেত্রে ওই ধাতুর ওপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ব্যাপারটা হবে ডিপোযিট খুঁজতে গিয়ে শত্রুর হাতে সব তুলে দেয়া।'

'কথা ঠিক,' বললেন যেইন নিং। 'এ কারণেই ওই তথ্য পাওয়ার পরেও খোঁজখবর নিইনি আমরা।'

'তার মানে চালমাত অবস্থা,' বলল লো হুয়াং।

'সত্যিই কি তাই?' হাত বাড়িয়ে কাপ থেকে মুঠো ভরা কালো গুটি নিলেন লাও-শি। নরম সুরে বললেন, 'বলো তো, আসলে কী উদ্দেশ্য এই খেলার?'

হতাশা পেয়ে বসেছে লো হুয়াং লিটনকে। বুঝে গেল,

বহুবারের মত আজও ওকে অদ্ভুত কোনও কৌশল শেখাতে চান জ্ঞানী বৃদ্ধ। তবুও খুশি হতে পারল না সে। 'এই খেলার প্রধান উদ্দেশ্য শত্রুকে ঘিরে ফেলা। যাতে করে সে আর স্বাধীন থাকতে না পারে। অর্থাৎ, তাকে জলে, স্থলে, আকাশে, সাগরে শেষ করে দেয়া হবে।'

'ঠিক,' মাথা নাড়লেন লাও-শি। 'বলো তো, এই খেলার সেরা খেলোয়াড় কোন্ দেশের?'

'চিনের?' জানতে চাইল বিলিয়নেয়ার। 'আমরাই তো বোধহয় আবিষ্কার করেছি এই খেলা।'

ঠিক জায়গায় একটা কালো গুটি রাখলেন বৃদ্ধ। 'তুমি কথা বলছ অহঙ্কার থেকে। এটা জ্ঞানীর আচরণ নয়।'

'আমরা যদি না হই, তো জাপানিরা।'

আবারও মাথা নাড়লেন যেইন নিং।

চুপ করে থাকল লো হুয়াং লিটন। দান ছেড়ে দিল।

এবার বোর্ডে আরেকটা কালো গুটি রাখলেন জ্ঞানী বৃদ্ধ।

ভুরু কুঁচকে ফেলল বিলিয়নেয়ার। বাজেভাবে হারছে সে। আবারও দান ছাড়ল। হতাশা ও বিরক্তি চেপে নরম সুরে বলল, 'কোরিয়ায় নামকরা অনেক খেলোয়াড় আছে।'

'বর্তমানে সেরা খেলোয়াড় আমেরিকা,' বললেন লাও-শি। 'আসলে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষের চেয়ে অনেক চাতুর্যের সঙ্গে খেলছে আমেরিকানরা। কোনওকালে এত দক্ষতা নিয়ে খেলেনি অন্য কোনও দেশ।'

ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে চেয়ে বলল হুয়াং লিটন, 'সত্যিই কি তাই, গুরু? আমি আজও দক্ষ কোনও আমেরিকানকে দেখিনি।'

'কারণ, ভুলভাবে দেখছ এই বোর্ড,' বললেন যেইন নিং। 'আবারও খেলায় মন দাও। ভাবো এটা মানচিত্র।'

দ্বিধা নিয়ে নতুন করে বোর্ড দেখছে লো হুয়াং লিটন। কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো, এই বোর্ডের সঙ্গে অনেক মিল

বিশ্বের মানচিত্রের। পশ্চিমা মানচিত্রের মত মাঝখানে নেই নর্থ আমেরিকা, তার বদলে মাঝে এশিয়ার মহাচিন।

হুয়াঙের সাদা গুটি মাঝের চিন। একদিকের কালো গুটি ইউরোপ আর নর্থ আমেরিকা।

কিছু বলার আগেই আবারও মুখ খুললেন লাও-শি, 'ইউরোপে তারা রেখেছে সেনাবাহিনী।' আরেকটা কালো গুটি রাখলেন বৃদ্ধ। 'তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আটলান্টিক, ভূমধ্য সাগর আর ভারত মহাসাগর। ঘাঁটি করেছে মধ্যপ্রাচ্যে। আগে যেসব জায়গায় ছিল কমিউনিস্ট রাশার সেনাবাহিনী, সেখানে এখন তাদের সেনাবাহিনী। প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কোনও জায়গা থেকে তারা আকাশে তুলতে পারবে আমেরিকান জঙ্গিবিমান।'

এখন খেলা নিয়ে ভাবছেন না যেইন নিং। জটিল বিদ্যা দিচ্ছেন প্রিয় স্যাঙাৎকে। একের পর এক আমেরিকান অ্যাসেটের নাম বলে ঠিক জায়গায় রাখছেন কালো গুটি। 'হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া, নিউ যিল্যাণ্ড।' রাখলেন আরও তিনটে কালো গুটি। 'এবার কোরিয়া, ফিলিপাইন আর ফর্মোযা— যেটা তারা বলে তাইওয়ান— তারপর আছে জাপান।'

বোর্ডের শেষ কালো গুটি রাখার পর দেখা গেল লো হুয়াঙের সাদা গুটির চিনকে ঘিরে ফেলেছেন জ্ঞানী বৃদ্ধ।

মুখ তুলে স্যাঙাৎকে দেখলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোনও আবেগ বা দুর্বলতা নেই। 'নিজেদের দ্বীপের মত মহাদেশ থেকে পুরো পৃথিবী ঘিরেছে তারা। অথচ এই পৃথিবীটা হওয়ার কথা ছিল আমাদের।'

আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছে লো হুয়াং লিটনের। বিব্রত বোধ করছে। 'জী, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা কী করব?'

বোর্ডের দিকে আঙুল তাক করলেন যেইন নিং। 'ঠিক কোন্ গুটি আগে সরিয়ে ফেলা জরুরি বলে বোধ করছ?'

নতুন করে খেলায় মন দিল বিলিয়নেয়ার। শেষ চালটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওটার কারণেই বৃত্তের ভেতর আটকা পড়েছে সাদা গুটির তৈরি চিন। বোর্ড থেকে একটা গুটি সরিয়ে বলল লো হুয়াং লিটন, 'সেটা এটা। জাপান।'

'তা হলে তা-ই হোক,' বললেন প্রাচীন শিক্ষক।

যেইন নিং কী ইঙ্গিত করেছেন, সেটা বুঝে চমকে গেছে বিলিয়নেয়ার। ধক-ধক করছে হৃৎপিণ্ড। 'গুরু, আপনি কি চান সেনাবাহিনী ব্যবহার করতে?'

'না,' বললেন যেইন নিং। 'কিন্তু একবার যদি কালো গুটি থেকে সাদা গুটি হয়ে যায় জাপান— অর্থাৎ আমেরিকার বন্ধুত্ব ত্যাগ করে হয়ে ওঠে চিনের বন্ধু— এক পলকে পাল্টে যাবে বোর্ডের পুরো চিত্র। তখন অনায়াসেই চারপাশ থেকে সরাতে পারব আমেরিকান কর্তৃত্ব শুধু তাই নয়, কোনও বাধা ছাড়াই পৃথিবীর একমাত্র খনি থেকে তুলব সোনালি শিখা।'

'আমরা কি কাজটা করতে পারব, গুরু?' জানতে চাইল লো হুয়াং লিটন। 'যুদ্ধকালীন অপরাধ আর বিতর্কিত এলাকা নিয়ে জাপানের সঙ্গে আমাদের শত শত বছরের শত্রুতা।'

'আমরা কাজ শুরু করেছি,' বললেন যেইন নিং। 'আর এ কাজে বড় ভূমিকা রাখতে পারো তুমি।'

'আমি অর্ধেক জাপানি বলে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'তবে আরও কারণ আছে। তোমার কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা আবিষ্কার করেছে নতুন সব টেকনোলজি।'

গলা খুলে কাশছেন না চিনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা। আসলে কী চান, আঁচ করতে পারল না লো হুয়াং লিটন। তবে বুঝল, পরে বিস্তারিতভাবে সবই খুলে বলবেন লাও-শি। এখন জানাতে হবে, তাঁর সঙ্গে আছে সে। 'নিজ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করব না। আপনি আমাকে যে-কোনও নির্দেশ দিতে পারেন, গুরু।'

‘ভাল, মঙ্গল হোক তোমার,’ সন্তুষ্ট হলেন যেইন নিং। ‘নানাদিক থেকে চাই সাহায্য। সেসবের ভেতর রয়েছে দরকারি মেশিন। সেগুলো হতে হবে মানুষের মত। রোবট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বছরের পর বছর আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান দেয়া হয়েছে তোমাকে। এবার জানাবে, কতটা এগোল প্রজেক্ট। ...তুমি কি তৈরি করতে পারবে মানুষের মত রোবট? ওই জিনিস হতে হবে এমন, যাতে মানুষ বুঝতে না পারে ওটা যন্ত্রমানব।’

আন্তরিক হাসল লো হুয়াং। বুঝে গেছে, আবারও হাতে পাবে ব্ল্যাঙ্ক চেক। কয়েক বছর ধরে জটিল এই পরিকল্পনা করেছেন যেইন নিং। ‘আমরা প্রায় শিখে গেছি কীভাবে তৈরি করতে হবে মানুষের মত রোবট।’

‘গুড,’ মাথা দোলালেন লাও-শি। বোর্ড থেকে তুলে দুটো কাপে রাখলেন সাদা ও কালো গুটি। ‘যাওয়ার পথে পাবে আমার সেক্রেটারির কাছ থেকে প্যাকেজ। ভেতরে থাকবে নির্দেশনা। তোমার প্রথম মিটিং নাগাসাকিতে। বন্ধুত্ব দেখাতে ওখানে খুলবে ফ্যাক্টরি। ওই চুক্তি ফ্রেণ্ডশিপ প্যাভিলিয়নে হওয়ার পর শুরু হবে বিজয়ের সোনালি পথে আমাদের হেঁটে যাওয়া। আর, ওই ফ্যাক্টরি হবে শুধু তোমার। ওখান থেকেই সারবে জরুরি কাজ।’

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল লো হুয়াং। ‘কিন্তু, কোনও কারণে আমাদের কাজে বাধা দেয়া হলে?’

‘কিছুই জানবে না কেউ,’ বললেন নিং। ‘মনে রেখো, যে খেলা আমরা খেলব, সেখানে বোকামির স্থান নেই। হয় শেষ করব শত্রু, নয়তো মরব। বাধা এলে নিশ্চিত করবে, যেন ব্যর্থ হয় বিপক্ষ।’

চার

শীতে কাবু মানুষের দেশ গ্রিনল্যাণ্ড। সেখানেই রয়েছে দুর্গম, জনশূন্য সফেদ বরফের সমতল মাঠ ন্যাভিক আইস শিট। যেদিকে চোখ যায় কোথাও নেই তিলমাত্র সবুজের ছোঁয়া। ধূসর আলোয় ঘোলাটে কুয়াশা ঘিরে রেখেছে এ এলাকা। ভর দুপুরেও দূর দিগন্তের কোলে ঝুলছে দুর্বল, লালচে সূর্য।

ধীর পায়ে বরফের মাঠে হেঁটে চলেছে দু'জন, পরনে তাঁবুর মত ভারী, উজ্জ্বল লাল স্নোসুট। একেবারেই মানাচ্ছে না এই সাদার দেশে।

'বুঝলাম না এত উত্তরে কেন দেখতে হবে,' আপত্তির সুরে বলল মেয়েটা। ফারের হুডের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে একগোছা সোনালি চুল। ইংরেজিতে নর্ডিক টান। 'আগের টেস্টে জেনেছি কী হবে রিডিং।'

মাথার হুড খুলে সানগ্লাস সরাল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চৌকশ এজেন্ট মাসুদ রানা। কেউ দেখলে ভাববে, ওর বয়স কমপক্ষে বত্রিশ, অথচ বাস্তবে আটাশ। গত আড়াই মাস বরফে ছাওয়া দুর্গম অ্যান্টার্কটিকা ও আর্কটিক ঘুরে জরুরি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এখন গাল ভরা কালো চাপ দাড়ি। মাথার চুল নেমে এসেছে ঘাড়ে। বরফের মাঠে থেমে দাঁড়াতেই ওর মনে পড়ল, আজ থেকে তিন মাস আগে নিজের অফিসে ওকে ডেকে নেন বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ও বসার পর ঠেলে দেন সরু

একটা ফাইল। নীরবে ওটার ভেতরের লেখা পড়েছে রানা, তারপর চোখ তুলে চেয়েছে বসের চোখে।

জন্মদিনে রানার উপহার দেয়া রনসন লাইটার দিয়ে চুরুট জ্বেলে ছাতের দিকে ধোঁয়া ছেড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। ক'মুহূর্ত পর বলেছেন, 'পড়লে তো। কী মনে হচ্ছে?'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বক্তব্য আতঙ্কজনক।'

মাথা দোলালেন বিসিআই চিফ। 'ঠিক।' আবারও ডুবে গেলেন গভীর চিন্তায়।

অপেক্ষায় থাকল রানা। ভাবছে, একের পর এক বাঁধ তৈরি করে সবুজ শস্য ভরা এ দেশটাকে মমতার সঙ্গে মিলে মরুভূমি বানিয়ে দিচ্ছে ভারত সরকার। এদিকে থৈ-থৈ করে বঙ্গোপসাগরের পানি উঠে এলে? হবে ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবন! তখন বিপদ হলেই টাকা বিদেশে পাচার করে উধাও হবে সম্পদশালী একদল নির্লজ্জ রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু... কোথায় ঠাঁই পাবে সাধারণ মানুষ? বাধ্য হয়ে পেরোবে সীমান্ত। তখন নাবালিকা ফেলানীর প্রতি যে নিষ্ঠুর অন্যায় করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই কোটি কোটি নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করে তারকাঁটায় ঝোলাবে বিএসএফ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। একাত্তরের হামলাকারী পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর খুনি সেনাবাহিনীর গণহত্যাকে তখন মনে হবে নিতান্তই মামুলি। সেক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিবেকবান মানুষ মাথা নেড়ে বলবে: না, দাদা, এ কাজটা কিন্তু মোটেই সঠিক হয়নি। অথচ, সে-দেশের উচ্চ আদালতের গণ্যমান্য বিচারকরা রক্তমাখা লাল মখমল রুমালে বিবেক মুছে জানাবেন: না, নানান কারণ বিবেচনায় এনে দেখা যাচ্ছে, কোনও বিচার করা যাবে না কারও।

আর তারপর রক্ষা পাবে না ভারতও। ডুবে যাবে গোটা ভারতবর্ষ। পালে পালে মরবে মানুষ...

রানার দিকে তাকালেন বিসিআই চিফ। ‘হ্যামিলটনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গবেষণার ওই কাজে তোমাকে চাইছে।’

চুপ করে থাকল রানা।

‘যেহেতু ওপরে উঠছে প্রতিটি মহাসাগর, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ।’

‘জী, স্যর,’ বলল রানা। সামনে রাখা ফাইলের তথ্য গলা শুকিয়ে দিয়েছে ওর। জানতে চাইল, ‘অ্যাডমিরাল ঠিক কী বলেছেন, কী কারণে হঠাৎ এত দ্রুত উঠে আসছে সাগর?’

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। ‘অমন হওয়ার কোনও কারণ নেই। অথচ হচ্ছে। আগামী বছর তলিয়ে যাবে বাংলাদেশ। তাই মনে হচ্ছে, তোমার খোঁজ নিতে যাওয়াই ভাল।’

‘জী, স্যর।’

হাতের ইশারা করেছেন বিসিআই চিফ। এবার যেতে পারো।

বাস্তবে ফিরল রানা। হিম-মাঠে দাঁড়িয়ে তাকাল মেয়েটার চোখে। ‘শিয়োর হতে হবে ভুল করছি কি না, নইলে মোটেও বিশ্বাস করবে না কেউ।’

মাথায় হুড পরে নাকের ওপর সানগ্লাস বসাল মেয়েটা। ওর চোখ বরফের মত নীলচে। লাল ঠোঁটে ক্রিম। চুল সোনালি না বলে খড়ের মত বলাই ভাল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভুরু কুঁচকে ফেলেছে সে। ‘একই গ্লেসিয়ারের সাতটা জায়গা থেকে রিডিং নিয়েও আরও প্রমাণ লাগবে?’

মেয়েটার ডাকনাম আলভিলডা। পুরো নাম এতই জটিল, রানার মনে হয়েছে, ওটার ভেতর আছে “এ” থেকে শুরু করে “যেড” পর্যন্ত। তাই ভুলেও যায়নি উচ্চারণ করতে। নুমার নিয়োগ করা নরওয়েইজিয়ান জিয়োলজিস্ট সে, আপাতত তার সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা খুব প্রয়োজন রানার।

‘ভাল হতো সাতটা রিডিং থেকে সব বুঝতে পারলে,’

বলল রানা। 'গত আড়াই মাসে গেছি বিশটা গ্লেসিয়ারে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। ডেটার মাঝে কোনও ফাঁক থাকা চলবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলভিলডা। 'ও, তাই হেলিকপ্টারে ওই স্টেশনে পৌঁছে তারপর পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা? ভাল। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, যেজন্যে আমরা এসেছি, সেটা তো এখন প্রমাণিত।'

'সমস্যা ওখানেই,' বলল রানা, 'প্রমাণিত, কিন্তু কেউ জানে না কেন কী হচ্ছে। কারণটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' নতুন কোনও তথ্য দিতে গেল না ও। পরে নিল সানগ্লাস। 'খুঁজে নিতে হবে স্টেশন, ঝড় আসছে। ডেটা পাওয়ার পর রাতের জন্যে তৈরি করতে হবে ইগলু।'

বড় করে শ্বাস ফেলল আলভিলডা। নতুন করে বেয়ারিং চেক করল রানা। আবারও এগোল ওরা।

কিছুক্ষণ হেঁটে দেখল, ধবল মাঠে চকচক করছে কালো সোলার প্যানেল। মহাশূন্যে প্রচুর বিদ্যুৎ পেতে এ প্যানেল তৈরি করেছে নাসা। তাদের কাছ থেকেই পেয়েছে নুমা। প্রতি বর্গফুটের জন্যে ব্যয় হয়েছে এক মিলিয়ন ডলার। এক একর ভরা সাধারণ সোলার সেলের চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে ওগুলোর একেকটা।

সোলার প্যানেলের কাছে পৌঁছে বিদ্যুৎ লাইন অনুসরণ করে সাদা এক গম্বুজের কাছে পৌঁছুল রানা ও আলভিলডা। গম্বুজটা আছে সমতল মাঠের মাঝে সামান্য নিচু এলাকায়। দরজার পাশে কালো, বড় অক্ষরে স্টেনসিল করা: নুমা।

'ন্যাশনাল আণ্ডারওআটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি,' উচ্চারণ করল আলভিলডা, 'বুঝি না প্রতিটা যন্ত্রপাতির নাম সংক্ষেপ করে কেন আমেরিকানরা!'

'যাতে চুরি হলেও প্রমাণ করতে পারে ওটা ওদেরই,' হাসল রানা।

‘সেজন্যে এই ফালতু বরফের চাঁইয়ের ওপরেও নাম লিখে রাখতে হবে?’

‘তাই তো দেখা যাচ্ছে,’ বলল রানা। ‘হঠাৎ ওদের দশ মিলিয়ন ডলারের ইকুইপমেন্ট বন্ধ হলে... বুঝতেই পারছ, ওদের ভাল লাগে না।’ অটোমেটেড মডিউলগুলোর ওপর থেকে তুষার সরাতে লাগল রানা। চুরি হয়নি, তবে খারাপ কিছু হয়েছে ওগুলোর। থাকার কথা সোজা, অথচ কাত হয়ে আছে বেকায়দাভাবে। ‘মনে হচ্ছে বরফ পড়ে ভেঙে গেছে প্রথম মডিউলের অ্যান্টেনা। তাই ডেটা পাঠাচ্ছে না।’

জ্যাকেটের অসংখ্য পকেটের একটা থেকে রানা বের করল প্যাড কমপিউটার। আকারে সেল ফোনের সমান। কাজ করতে পারে বরফের এলাকায়। সেন্ট্রাল মডিউলের ডেটা পোর্টের সঙ্গে প্যাড কমপিউটারের কেবল সংযুক্ত করল রানা। ‘সিপিইউ ঠিক আছে, তবে কয়েক মিনিট লাগবে ডেটা ডাউনলোড হতে।’

অপেক্ষায় থাকল রানা।

এদিকে স্টেশনের সামনের দিকে গেল আলভিলডা। ওখান থেকে বলল, ‘এখনও চালু আছে ড্রিল।’

এ স্টেশন হিট প্রোব ব্যবহার করে ড্রিল করছে গ্লেসিয়ারের বহু নিচে। এরপর গভীরতা, তাপ ও পানির গতি মেপে বের করবে, কবে গলবে এই বরফের চাঁই।

নতুন থিয়োরি অনুযায়ী গবেষকরা ভাবছেন: দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে যাওয়ার তথ্য ভুল, বাস্তবে ভেতরে ভেতরে ফোঁপরা হচ্ছে গ্লেসিয়ার। কাজেই বাড়ছে সাগরের উচ্চতা। তবে এসব নিয়ে ভাবছে না রানা। ওর কাজ আলাদা। প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশ ডুবে গেলে ঠেকাতে পারবে না কেউ, কিন্তু একদল বদলোকের জন্যে এই বিপর্যয় ঘনিয়ে এলে, তা ঠেকাতে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না ও। কমপিউটারের ডাউনলোড বারের দিকে চেয়ে আছে রানা। গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল, ‘হিট

প্রোব এখন কত গভীরে?'

'এগারো শ' ফুট,' জানাল আলভিলডা। 'মনে হচ্ছে...'

তখনই ওদের পায়ের নিচে ঝড়ে পড়া জাহাজের মত দুলে উঠল গোটা বরফের প্রকাণ্ড চাঁই। বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড এক কড়াৎ আওয়াজ চাপা দিল মেয়েটার কণ্ঠ। বসে পড়ে তাল সামলে নিল রানা। বিশ ডিগ্রি কাত হয়ে পিছলে ডানে সরেছে মডিউল। চমকে গিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। চারপাশের বরফ দেখল সন্দেহের চোখে। মনিটরিং স্টেশনের ওদিকে চিল চিৎকার জুড়েছে নরওয়েজিয়ান মহিলা জিয়োলজিস্ট।

মডিউল পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল রানা।

মনিটরিং স্টেশনের নিচে হাঁ মেলেছে চওড়া এক কালো গর্ত। গভীরতা কমপক্ষে দু' শ' ফুট। নর্ডিক সায়েন্টিস্ট আর মনিটরিং ইউনিট ঝুলছে এদিকের ক'টা নোঙরে ভর করে। দৌড় থামিয়ে সাবধানে এগোল রানা। পায়ের নিচে পিছলে যাচ্ছে তুষার।

'ফাটল!' চেঁচিয়ে উঠে সতর্ক করল আলভিলডা।

বাড়িতে চোখদুটো রেখে আসেনি রানা। বেল্ট থেকে আইস পিক নিয়ে গায়ের জোরে ইঁটের মত শক্ত বরফে গাঁথল। চোখা টাংস্টেনের ফলা কাজ করবে নোঙরের মত। শক্ত হাতে পিক ধরে, অন্যহাতে স্ট্র্যাপ ধরল রানা, শুয়ে পড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে চলল ঝুলন্ত আলভিলডার দিকে। আরও কয়েক ইঞ্চি যাওয়ার পর হাতের মুঠোয় পেল স্নোসুটের হুড। টেনে নিজের দিকে তুলতে চাইল মেয়েটাকে।

নোঙর থেকে হাত সরিয়ে খপ্ করে রানার বাহু ধরল আলভিলডা, দ্রুতগতি মাকড়সার মত বেয়ে উঠে এল বিসিআই এজেন্টের পিঠে। ওকে পেরিয়ে শক্ত জমি পেতেই উঠে দিল প্রাণপণ দৌড়। মরলে মরুক মাসুদ রানা, মরণ ফাটলের আশপাশে থাকবে না সে!

আলভিলডার মত একই অনুভূতি রানার মনে, তবে ডেটা

ফেলে যেতে আপত্তি আছে ওর। ডেটা পোর্ট থেকে কর্ডের মাধ্যমে ঝুলছে প্যাড কমপিউটার। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে আইস পিক তুলে ওটার দিকে এগোল রানা।

দুটো নোঙর উপড়ে যেতেই দুলে উঠল স্টেশন। উদ্যত চাবুকের মত তুষারে আছড়ে পড়ল শক্ত স্ট্র্যাপ। উড়ন্ত নোঙর থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করেছে রানা। আবারও বরফে গাঁথল আইস পিক। শুয়ে হাত বাড়াল ফাটলের কিনারায়। আঙুলের ডগা স্পর্শ করল ঝুলন্ত কমপিউটার, তবে ভারী গ্লাভ পরা হাতে তুলতে পারবে না জিনিসটাকে।

দু'পাটি দাঁতে কামড়ে ডানহাতের গ্লাভ খুলল রানা। ওটা ছুঁড়ে ফেলল পেছনে। ভীষণ ঠাণ্ডা হাতে লাগতেই প্রায় কুঁকড়ে গেল ও। যন্ত্রণা পাত্তা না দিয়ে খালি হাতটা গুঁজল তুষারের ভেতর। খুবলে তুলে তৈরি করল ছোট্ট সাদা বল। হাতের তাপে গলিয়ে নিল তুষারটুকু। এবার আইস পিক ছেড়ে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকল ফাটলের মধ্যে। ভেজা আঙুলে স্পর্শ করল কমপিউটারের স্ক্রিন। হাত সরাল না। শূন্যের পনেরো ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায় মাত্র এক সেকেণ্ডে জমাট বেঁধেছে হাতের পানি। তাতে আটকে গেছে প্যাড কমপিউটারের স্ক্রিন। পেছাতে শুরু করে ডেটা পোর্ট থেকে ডিভাইসটা খুলে নিল রানা। ধরেছে শক্তহাতে। কিন্তু ওর পেটের নিচে কড়-কড় আওয়াজে ফাটছে ধবল প্রান্তর। উঠে দাঁড়িয়ে নিরাপদ জায়গা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। এক সেকেণ্ড পর ফাটলের মধ্যে সাঁই করে নেমে গেল গোটা স্টেশন। শক্ত মাটিতে ধুপ্ করে পড়েছে রানা। ক'সেকেণ্ড পর শুনল বজ্রপাতের শব্দ তুলে বহু নিচে আছড়ে পড়েছে মিলিয়ন ডলারের স্টেশন।

রানার পাশে এসে থামল আলভিলডা, কুড়িয়ে এনেছে গ্লাভ। নরম সুরে বলল, 'তুমি কি বদ্ধপাগল, রানা? জীবনের ঝুঁকি কেউ নেয় এভাবে?'

'চাইনি, সুন্দরী সঙ্গিনী নিচে পড়ে যাক,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাকে, কিন্তু ওই কমপিউটার?' মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'ওটার মূল্য এতই বেশি?'

'হয়তো তা-ই,' বলল রানা। 'ওটায় হয়তো আছে খুব জরুরি ডেটা। এমন কিছু, যেজন্যে রক্ষা পাবে আমার দেশ।'

'নিজের দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই,' বিড়বিড় করল আলভিলডা। 'তোমার মত মানুষ যে-কোনও দেশের গর্ব।'

আঙুল ও তালুর ত্বক যতটা পারা যায় কম হারিয়ে প্যাড কমপিউটারটা ছুটিয়ে নিল রানা। হার্ড ডিস্কে চলে এসেছে কয়েক গিগাবাইট ডেটা। স্ক্রিনে ট্যাপ করল রানা। প্রথমেই এল ডেটার প্রথম পৃষ্ঠা। ক'সেকেণ্ড চোখ বুলিয়েই ও বুঝে গেল, যেজন্যে এত কষ্ট করা, পেয়ে গেছে সেই জরুরি তথ্য।

'কী আছে ওসবে?' জানতে চাইল আলভিলডা।

'গত বছর যেভাবে গলেছে, তার চেয়ে বেশি গলছে না গ্লেসিয়ার।'

'অর্থাৎ পরিবর্তন নেই,' বলল মেয়েটা। সোজা হয়ে দু'হাত রাখল কোমরে। 'এই গ্লেসিয়ার অন্যগুলোর মতই। ফোঁপরা হচ্ছে না। এটা তো ভাল খবর!'

'তা-ই ভাবছ?' শুকনো গলায় বলল রানা। 'কিন্তু খারাপ দিক হচ্ছে: গ্লেসিয়ার ফোঁপরা না হলে অন্য কোথাও আছে মস্তবড় সমস্যা। নইলে এত দ্রুত সাগরের পানি বাড়ছে কেন? এর কোনও জবাব নেই আমাদের কারও কাছে।'

পাঁচ

যুক্তরাষ্ট্র।

কুচকুচে কালো আকাশ বুকে নিয়ে সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিস্নাত সকাল। হু-হু করে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। মাঝে মাঝে কড়াৎ আওয়াজে পড়ছে একটা-দুটো বাজ।

রাজধানী ওয়াশিংটনের কংগ্রেশনাল বিল্ডিঙের নতুন ব্রিফিং এরিয়ার আনুষ্ঠানিক নামঃ স্যামুয়েল বি. গুডউইন মিডিয়া রুম। কিন্তু ওখানে যারা কাজ করে, ওটাকে বলেঃ থিয়েটার। এর একটা কারণ, কয়েক স্তরে রয়েছে সারি সারি আরামদায়ক চেয়ার। থিয়েটার বলার অন্য কারণ, নিয়মিত এখানে চলে অসংখ্য রাজনৈতিক নাটক।

এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে ভীষণ গম্ভীর চেহারায় যে যাঁর সিটে বসে আছেন ক'জন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান।

কী আশ্চর্য বেয়াক্কেলে লোক মাসুদ রানা, এখনও আসার নাম নেই তার!

ক্ষমতাশালী মানুষগুলোর চোখে-মুখে বিরক্তি। একটু পর পর দেখছেন ঘড়ি। ঠিক দশটায় সবাইকে হাজির থাকতে অনুরোধ করে নিজেই আসেনি লোকটা। এখন বাজে এগারোটা। ভেতো বাঙালি কোনও দিনও মানুষ হবে না!

নিচু গলায় নিজেদের ভেতর আলাপ করছেন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা। দু'একটা আপত্তিকর মন্তব্য শুনে গা জ্বলে যাচ্ছে বিসিআই বা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের। বসে আছে চতুর্থ সারির সিটে। ক'দিন আগে এ দেশে এসেছে ছুটি কাটাতে।

আমেরিকার উদ্দেশে গ্রিনল্যাণ্ড ত্যাগের আগে রানা ফোনে বলেছিল, 'ভাল হয় তুই মিটিঙে এলে। হয়তো পাবি জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট।'

'তা হলে আর অফিসে বসে মাছি মারতে হবে না,' খুশি হয়ে বলেছে সোহেল। 'তুই আর সোহানা দেশে নেই, সেই দুঃখ ভুলতে দিনরাত আমাকে বকে চলেছে বুড়োটা। প্রথম সুযোগে ছুটি নিয়ে ভেগে এসেছি এখানে।' প্রসঙ্গ পাল্টে রানার কাছে জানতে চেয়েছে, 'কী ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট রে, দোস্ত?'

জবাবে রানা বলেছে, 'এখনও জানি না। তবে বিষয়টা হবে খুব জটিল এবং বিপজ্জনক।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সোহেল। বিষয় যে জটিল, তাতে ভুল নেই। মঞ্চে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সের প্রখ্যাত চার বিজ্ঞানী। পাঁচজনের শার্টের বুকে নাসার ব্যাজ। তিনজনের সামনের বোর্ডে লেখা পদবী দেখে সোহেল বুঝেছে, তাঁরা হোয়াইট হাউসের অ্যাডভাইযরি স্টাফ। এ ছাড়া, দু'জন এসেছেন এনওএএ থেকে। পৃথিবীর আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ওই এজেন্সির। সোহেলের পাশের সিটেই রয়েছে নুমা বা দ্য ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির কয়েকজন। তাদের মধ্যে দু'জনকে খুব ভাল করেই চেনে সোহেল।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বাঙালি এবং ওর বন্ধু। আসিফ রেজা ও তানিয়া রেজার কাজ নুমায় পৃথিবীর সাগর মনিটর করা। তাল গাছের মত উঁচু আসিফ দক্ষ জিয়োলজিস্ট। গভীর সাগরে গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে ডাক পড়ে তার। তবে এ মুহূর্তে তাকে প্রায় বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে সোহেলের। শান্ত দানবের চোখের চারপাশে কালো দাগ। বোধহয় ঘুমাতে পারেনি গত কয়েক রাত।

স্বামীর পাশে তানিয়া, দক্ষ মেরিন বায়োলজিস্ট। স্বামী গভীর রাতে জেগে কাজ করলে পাশে থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে।

তানিয়ার ওদিকের সিটে কমোডর জোসেফ কার্ক। নিজ যোগ্যতায় হয়েছেন নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ডানহাত। তবে কয়েকটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে বেপরোয়া সাহস, বুদ্ধি ও যোগ্যতা দেখিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছে রানা। এমনি-এমনি ওকে করা হয়নি নুমার অনারারি ডিরেক্টর।

দুশ্চিন্তা নিয়ে আরেকবার ঘড়ি দেখলেন কার্ক।

নিচু গলায় বলল তানিয়া, 'রানা তো দেরি করার মানুষ নয়। জরুরি কোনও কাজে আটকে গেল?'

'জরুরি কিছুই হবে,' বলল আসিফ। 'গত ছয় মাসে গোটা দুনিয়ার সাগরের পানি উঠেছে পুরো আট পয়েন্ট তিন ইঞ্চি।'

আসিফের কথাটা শুনতে পেয়েছেন কার্ক। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'সাগরের উচ্চতা আট পয়েন্ট তিন ইঞ্চি বেড়েছে মানে, যোগ হয়েছে একুশ কোয়াড্রিলিয়ন গ্যালন। তার মানে, গ্রেট লেকের সব পানির তিন গুণ। এত জল বেড়েছে মাত্র ছয় মাসে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কেউ খেয়াল করেনি বাড়ছে সাগরের পানি।'

'এভাবে বাড়লে আগামী বছর কয়েক ফুট নিচে তলিয়ে যাবে বাংলাদেশ, ফ্লোরিডা ছাড়াও বহু দেশ ও দ্বীপ,' বলল আসিফ রেজা।

'অথচ পৃথিবীর তাপ বাড়েনি,' বলল তানিয়া। চুপ হয়ে গেল ও।

পডিয়ামে দাঁড়ালেন এক সিনিয়র সিনেটর। বোধহয় আলাপ করেছেন অন্যদের সঙ্গে, এখন জানিয়ে দেবেন বাতিল করা হচ্ছে মিটিং। বক্তব্য শুরু করতে বোয়াল মাছের মত মস্ত এক হাঁ মেললেন ভদ্রলোক, কিন্তু তখনই দড়াম করে খুলে

গেল প্রধান দরজা। দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢুকল কালো চুলের এক যুবক। এলোমেলো দাড়ি তার কাকের বাসা। তার দিকে চেয়ে আছেন সিনেটর। কিছু বলার আগেই মুখ খুলল মাসুদ রানা, 'সাগরের উচ্চতা গ্লোবাল ওঅর্মিঙের জন্যে বাড়ছে না।'

ওর কথায় মঞ্চে ও প্রথম সারির সিটের সবার ভেতর শুরু হলো গুঞ্জন।

'সরি!' বললেন পডিয়ামের সিনেটর। 'হাতেম তাঈয়ের মত দাড়ির জন্যে আপনাকে চিনতে পারিনি, মিস্টার রানা।'

'সময় ছিল না ভদ্রস্থ হওয়ার,' বলল রানা। 'গত আড়াই মাস ছিলাম দক্ষিণ ও উত্তর মেরুর গ্লেসিয়ারে। ঢাকা শহরের গুলিস্তানকেও জ্যামের দিক থেকে হারিয়ে দিয়েছে আপনাদের আই-৯৫ হাইওয়ে। এদিকে মোবাইল ফোনের ব্যাটারির চার্জ শেষ। আসতে দেরি হয়েছে বলে দুঃখিত।'

'তারমানে বলছেন, সাগরের পানি গ্লোবাল ওঅর্মিঙের জন্যে বাড়ছে না?' জানতে চাইলেন দ্য ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যাণ্ড অ্যাটমসফেয়ারিক বোর্ডের চেয়ারম্যান। 'তা হলে? কীজন্যে...'

'সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তবে এটা জানি, আগের মতই আছে গ্লেসিয়ার,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল রানা।

'কিন্তু আমাদের তৈরি অতিরিক্ত তাপের জন্যে এমনটা হচ্ছে না?' জানতে চাইলেন ফ্লোরিডার সিনেটর।

'এ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না,' বলল রানা।

'তা হলে সাগর উঠে আসছে কেন?'

'তা এখনও জানতে পারিনি আমরা।'

'আপনি তো জরুরি ডেটা সংগ্রহ করেছেন?' জানতে চাইলেন দ্য ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যাণ্ড অ্যাটমসফেয়ারিক বোর্ডের চেয়ারম্যান।

'তা করেছি,' বলল রানা।

'তা হলে দয়া করে সেসব ডেটা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের

সবার অফিসে,' বললেন দলনেতা সিনেটর।

'বেশ, পাঠিয়ে দেয়া হবে,' বলল ক্লান্ত রানা।

'আজ দেরি হয়ে গেছে, শেষ করা যাক মিটিং,' বললেন সিনেটর। 'সব ডেটা দেখার পর আবারও দু'সপ্তাহ পর মিটিঙে বসব আমরা। যদি এর মধ্যে জানা না যায়, কী জন্যে উঠে আসছে সাগর, বাধ্য হয়েই জানাতে হবে সাধারণ মানুষকে। এর ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর। আতঙ্কিত হয়ে উঠবে সবাই।'

মাথা দোলাচ্ছেন প্রায় সবাই।

রানা খুশি, দীর্ঘ সময় এখন বকবক শুনতে হবে না।

সিট ছেড়ে দরজার দিকে চলেছেন অনেকে।

রানার কাছে এসে দাঁড়াল সোহেল, আসিফ ও তানিয়া। মোটা এক সিনেটরের সঙ্গে কথা বলছেন জোসেফ কার্ক।

'তোর আনা ডেটা থেকে বেরোবে, কেন বাড়ছে সাগরের উচ্চতা?' জানতে চাইল সোহেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'ব্যাপারটা রহস্যজনক। সেজন্যেই খুব জরুরি এর জবাব খুঁজে বের করা।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন জোসেফ কার্ক।

'চলুন, যাওয়া যাক নুমা হেডকোয়ার্টারে,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন কার্ক।

দরজার দিকে চলল ওরা। আলাপে ঠিক হলো, বিকেল পাঁচটায় বসবে রানা, সোহেল, আসিফ ও তানিয়া। সন্দেহজনক ডেটা পেলে তা জানিয়ে দেবে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বা জোসেফ কার্ককে।

ছয়

শুক্রবার। বিকেল পাঁচটা।

আগামী দু'দিন পুরো ছুটি। তাই ওয়াশিংটন ডি.সি. হয়ে উঠেছে ভুতুড়ে শহর।

এইমাত্র নুমা হেডকোয়ার্টারে কনফারেন্স রুমের বাতি জ্বেলে যে যার সিটে বসেছে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, আসিফ রেজা ও তার স্ত্রী তানিয়া রেজা।

গত ক'রাত দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারেনি রানা ও আসিফ। তাই চেহারা বিধ্বস্ত।

'রাত জাগতে হলে লাগবে কফি,' বলল রানা।

ক্যাপিটল হিল থেকে নুমা অফিসে ফিরে সামান্য বিশ্রাম নেয়ার পর, বিকেল হতে না হতেই আবারও শুরু হচ্ছে মিটিং। ফাইল ভরা নোট বের করছে আসিফ ও তানিয়া। চেয়ার ছেড়ে কফিমেকারের কাছে গেল সোহেল।

'সত্যিই গলছে না গ্লেসিয়ার?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া। 'এমন কী দক্ষিণ মেরুতেও না?'

'ওখানে এখন শীত,' বলল রানা, 'তবুও আলাপ করেছি ম্যাকমার্ডো স্টেশন চিফের সঙ্গে। শূন্যের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা।'

'তা হলে কেউ বলতে পারবে না, কেন বাড়ছে সাগরের পানি,' হতাশ হয়ে বলল তানিয়া।

'অন্য কারণে হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু সেটা কী,

তা খুঁজে বের করতে হবে।'

'হয়তো বুঝলি, কিন্তু ঠেকাতে পারলি না, হতে পারে না?' মন্তব্য করল সোহেল। 'আর তারপর নিজ থেকেই সব সামলে নিল পৃথিবীর প্রকৃতি। আগে এমন হয়েছে বহুবার।'

'হলে ভাল, তবে সে আশায় বসে থাকলে চলবে? চেষ্টা করতে হবে না?' বলল রানা।

সবার জন্যে কফি নিয়ে এল সোহেল।

শুরু হলো ডেটা নিয়ে আলাপ। একপর্যায়ে তানিয়া ও আসিফ জানাতে লাগল, কীভাবে সাগরের নিচে তলিয়ে যেতে পারে মহাদেশ।

'ভলকানিক অ্যাক্টিভিটির জন্যে সাগরের পানি বাড়তে পারে,' বলল তানিয়া, 'উদ্গীরণ হলে প্রচুর পানি বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরি থেকে।'

'রানা যখন গ্রিনল্যাণ্ডে ছিল, আমরা দু'জন ওই সম্ভাবনা চেক করেছি,' বলল আসিফ। 'গত এক বছরে কমেছে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ।'

'বৃষ্টি বেশি হচ্ছে, তাই বাড়ছে সাগরের পানি,' সহজ পথ ধরল সোহেল। 'বাইবেলে আছে, নুহ নবীর আমলে চল্লিশ রাত-দিন বৃষ্টি পড়ে তলিয়ে গিয়েছিল প্রায় সব জমিন।'

'কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে, প্রচুর বৃষ্টি হলেও তলিয়ে যাবে না পৃথিবী,' বলল রানা।

চওড়া হাসি দিল সোহেল। 'কত জোরে বৃষ্টি পড়ছে, তার ওপর নির্ভর করে।'

'সারা পৃথিবী জুড়ে তো বৃষ্টি পড়ছে না,' গম্ভীর চেহারায় বলল তানিয়া। 'আপাতত খরা চলছে ভারত উপমহাদেশে। গ্রীষ্মের গরমে ভাজা হচ্ছে ইউরোপের লোক। তা ছাড়া, বৃষ্টি পড়া মানেই, বাষ্পায়িত হবে পানি। প্রকৃতি এভাবেই সব ব্যালেন্স করে।'

'আমাদের প্রিয় সোহেল ভায়া চাইছে খড়কুটো ধরে ভেসে

থাকতে,' মন্তব্য করল আসিফ।

'তবে আমাদের হিসাবে ভুল হলে?' বলল তানিয়া। 'জোয়ার, স্রোত আর বাতাসের জন্যে খুব কঠিন সাগর-সমতল মেপে নেয়া। এমন কী স্থলভূমির মহাকর্ষীয় টানেও নানারকমের হতে পারে সাগর-সমতল।'

'নানা মেথড ব্যবহার করে তিনবার পরীক্ষা করেছি,' জানিয়ে দিল রানা। 'ভুল নেই ডেটায়। অথচ সাগর উঠে প্লাবিত করছে নিচু এলাকা।'

'হয়তো পানি আসছে মহাশূন্য থেকে,' বলল সোহেল।

কঠোর চোখে ওকে দেখল আসিফ ও তানিয়া।

করুণ দৃষ্টিতে প্রিয় বন্ধুকে দেখছে রানা। 'তুই কি সিরিয়াস হবি?'

'আমি খুব সিরিয়াস,' ভুরু কুঁচকে ফেলল সোহেল। 'ধূমকেতুর মধ্যে থাকে নোংরা বরফ। বিজ্ঞানীদের অনেকে ভাবেন, পৃথিবীর সাগরের পানি এসেছে শত শত ধূমকেতু থেকেই। এটা ঘটেছে প্রথম দুই বিলিয়ন বছর ধরে।'

সোহেলের থিয়োরি ঠিক। ছাতের দিকে তাকাল রানা। 'গত আড়াই মাস আকাশে কোনও ধূমকেতু দেখিনি।'

'কে তোকে বলেছে যে ওগুলোকে হ্যালির ধূমকেতুর মত বড় হতে হবে?' বলল সোহেল। 'হয়তো এতই ছোট, দেখাই যায় না। অথবা বড় কোনও ধূমকেতু ভেঙে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার কোটি কণা। ক'দিন আগে পড়লাম, আইসন নামের ধূমকেতু ভেঙে মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ওটার লেজও হাওয়া। নাসা ওখানে পেয়েছে কোটি কোটি কণা। হয়তো পৃথিবী চলেছে মহাশূন্যের তেমনই কোনও ধূমকেতুর কণার মাঝ দিয়ে। কিছুই টের পাচ্ছি না আমরা। অথচ, পৃথিবীর সাগর ও জমিতে পড়ছে হাজার হাজার কোটি গ্যালন পানি। ...কী বুঝলি?'

'হতে পারে,' স্বীকার করল রানা। 'তবে ধূমকেতুর কোটি

কোটি কণার মাঝ দিয়ে পৃথিবী গেলে, তা ধরা পড়ত নাসার বিজ্ঞানীদের কাছে। তা ছাড়া, সাগর-সমতল উঠে আসতে হলে চাই শত শত ধূমকেতু।'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'আমার থলের সব বের করে দিয়েছি। এবার তোরা খুঁজে বের কর কী ঘটেছে।'

চুপ করে থাকল রানা, আসিফ ও তানিয়া। পরের তিন ঘণ্টা মাথা ঘামিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। অতিরিক্ত মগজ খাটিয়ে লালচে হয়ে গেছে সবার চোখ।

'মিটিং আপাতত শেষ?' জানতে চাইল তানিয়া।

'কফি ব্রেক।' কফিমেকারের সামনে গেল রানা। ওখান থেকে বলল, 'আমরা কিন্তু এগোতে পেরেছি। এক এক করে বাদ পড়ছে সম্ভাবনাগুলো। তার মানে, খুব কাছেই কোথাও আছে উত্তর।'

'হুঁ, তুই যখন বলছিস,' মন খারাপ করে বলল সোহেল।

কফিতে ক্রিম বা চিনি নিল না রানা। চেয়ে আছে টেবিলের দিকে। খেয়াল করেছে, তানিয়া আর সোহেল নানা বিষয়ে আলাপ করলেও প্রায় চুপ থেকেছে আসিফ। কী যেন ভাবছে সে। এমনিতেই পারতপক্ষে কথা বলে না শান্ত দানব।

কফিতে চুমুক দিয়ে রানা দেখল, প্যাডে খস্-খস্ করে কী সব হিসাব কষছে আসিফ। কোনও দিকে হুঁশ নেই। গিয়ে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা।

পৃষ্ঠা ভরে গেছে ক্যালকুলেশনে। মাঝে এক প্যারা ভরা মন্তব্য। পাশে আঁকা পাখির ঠোঁটে কী যেন।

'কী ভাবছিস, আসিফ?' মুখ খুলল রানা। 'বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছিস?'

'হ্যাঁ, সম্ভব...' আনমনে বলল জিয়োলজিস্ট। 'কিন্তু... ঠিক জানি না...'

'কাগজটা দে তো?' হাত বাড়িয়ে প্যাডের পৃষ্ঠা নিল রানা। ওখানে একটা কাক। ঠোঁটে পাথর। কাছেই কলসি। ওটা আধ

ভরা। পাশেই ক্যালকুলেশন। নিচে একটা নাম।

'ইয়োশিরো শিমেযু,' জোরে জোরে পড়ল রানা। 'কী রে, কার্টুনিস্ট হয়ে উঠেছিস?'

মাথা নাড়ল আসিফ রেজা।

'তো বলে ফ্যাল কী হয়েছে,' তাড়া দিল রানা। খানিকটা অপরাধবোধ কাজ করছে মনে। কিছু নিখুঁত না হলে মুখ খোলে না আসিফ। তার আগে পরীক্ষা করে শত দিক থেকে।

'একটা কথা ভাবছি,' বলল আসিফ। 'তবে বললে তোরা হাসাহাসি করবি।'

'জানি, আমাদের প্রিয় সোহেলের ধূমকেতুর চেয়ে খারাপ হবে না তোর থিয়োরি,' মন্তব্য করল রানা।

'আরে, এসব কী!' আপত্তি তুলল সোহেল। 'তুই-ই তো বললি মনের জানালা খুলে দিতে। তাই তো আকাশের মত বিশাল এই উদার মনের ঘরের জানালা-দরজা, সিন্দুক, আলমারি, শেষে অ্যাটাচ্ড্ বাথরুমটা পর্যন্ত খুলে দিয়েছি।'

'আপাতত তোর জং-ধরা গরম মগজটাকে একটু বিশ্রাম দে,' বলে আসিফের দিকে তাকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'পাখি নিয়ে কী ভাবছিস তুই?'

বড় করে দম নিল আসিফ। 'ঈসপের গল্পের কথা মনে আছে তোদের? ওই যে, কলসি থেকে পানি তুলেছিল একটা কাক?'

রানা বুঝে গেল, কী বলছে ব্রিলিয়ান্ট জিয়োলজিস্ট।

'কলসির ভেতর পানি দেখল তৃষ্ণার্ত কাক,' বলল আসিফ, 'কিন্তু চঞ্চু দিয়ে তুলতে পারবে না। তখন একটা একটা করে পাথর এনে কলসিতে ফেলল কাক। পাথরের কারণে ওপরে উঠল পানি। শেষে প্রাণভরে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল চালাক পাখি।' আনমনে মাথা দোলাল জিয়োলজিস্ট। 'এখন কথা হচ্ছে, দুই মেরুর বরফ না গলে থাকলে, ধূমকেতুর কণা যদি না থাকে, তো ধরে নিতে হবে, ওপর থেকে পানি যোগ হচ্ছে না সাগরে।

সেক্ষেত্রে আগে থেকেই যে পানি রয়ে গেছে, সেটাই উঁচু হয়ে উঠছে পৃথিবীর সব মহাসাগরে।'

চুপ করে আছে রানা, তানিয়া আর সোহেল।

সবাইকে দেখে নিল আসিফ। 'মনে করা যাক, পানিতে ভরে নেয়া হয়েছে বাথটাব। এরপর কেউ নেমে পড়ল ওখানে। উপচে পড়বে না পানি?'

'উপচে পড়বে,' বলল রানা।

'দারুণ বলেছিস, চালিয়ে যা,' উৎসাহ দিল সোহেল।

মুচকি হাসল তানিয়া। 'এ ধরনের আইডিয়া গজালে বাড়ি ফিরে দেখব, তর্কে হেরে যাচ্ছি ওর সঙ্গে।'

'কিন্তু সাগরে আসছে কোথা থেকে পানি?' মূল কথা থেকে সরল না রানা।

'সাগরেই ছিল,' বলল আসিফ, 'মনে পড়ছে ক'বছর আগে ইয়েলোস্টোন লেক উপচে পড়ল। অথচ, ওদিকে বৃষ্টি হয়নি। বন্যা তো দূরের কথা। পরে দেখা গেল, লেকের তলে ভূমিকম্পের জন্যে ঢিবির মত হয়ে উঠেছে মাটি-পাথর। পরের কয়েক বছরে আবার নেমে গেল তলদেশ। লেকের পানি আগের সমানই থাকল। ছোট জায়গায় ওটা ধরা পড়েছিল। কিন্তু মহাসাগরে কোথায় কী হচ্ছে, জেনে নেয়া কঠিন।'

'কিন্তু, তা হলে কেউ না কেউ টের পেত, উঠে এসেছে সাগরতল,' বলল সোহেল।

'আগে খেয়াল তো করতে হবে,' বলল আসিফ। 'নুমা বা এ ধরনের এজেন্সি নিয়মিত সাগর স্ক্যান করে।' দূরের দেয়ালে ঝুলন্ত টপোগ্রাফিক ম্যাপ দেখাল। 'সাগরের অগভীর এলাকা, বন্দর বা জাহাজ চলাচল রুটে নিয়মিত চলে স্ক্যান। কিন্তু গভীর সাগরে স্ক্যান করা হয় অন্যভাবে। হয়তো রিডিং নিল উত্তর আমেরিকার অরল্যাণ্ডের সাগরে, তারপর আবারও স্ক্যান হলো স্যান্টা মনিকায়। তাতে ধরে নেয়া হয়, মাঝের সাগরতল আগের মতই আছে। সত্যি সাগরের নিচে পাহাড় গজিয়ে

উঠলে, জানার কথা নয় কারও।'

'তা ছাড়া, বেশিরভাগ গভীর সাগরের ডেটা এক যুগের চেয়েও বেশি পুরনো,' বলল তানিয়া, 'এর ভেতর নিচে কী ঘটেছে, আমরা কেউ জানি না।'

'হাওয়াই দ্বীপের মত দ্বীপ গজিয়ে উঠতে শুরু করলে লাখ লাখ কোটি গ্যালন পানির চাপ পড়বে মহাসাগরে,' বলল আসিফ। 'অথচ, ওই দ্বীপ হয়তো এখনও জেগেই ওঠেনি।'

'ওটা হয়তো আগ্নেয়গিরি,' বলল তানিয়া। 'আঠারো শ' তিরাশি সালে বিস্ফোরিত হয়ে তলিয়ে গেল ক্রাকাতোয়া, তারপর উনিশ শ' ত্রিশ সালে ওখানেই উঠল আরেকটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। নাম হলো আনাক ক্রাকাতোয়া।'

'এসব দ্রুত বেড়ে ওঠে,' সায় দিল আসিফ। 'আনাক ক্রাকাতোয়া পর্বতের উচ্চতা এখন অন্তত এক হাজার ফুট। অবিশ্বাস্য বেগে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশের সাগরে।'

'হাওয়াই দ্বীপের একটু দূরে গজিয়ে উঠছে এমপেরর সিমাউন্ট,' বলল তানিয়া। 'ওরা নাম দিয়েছে লোইহি। গত বছর সার্ভে করেছি আমরা। উনিশ শ' ছিয়ানব্বুই সালের পর থেকে খুব দ্রুত উঠে আসছে।'

'ওগুলো তৈরির জন্যে লেগেছে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর, আর আমরা দেখছি গত ছয় মাসে উঠেছে সাগর-সমতল,' বলল সোহেল।

'কথা ঠিক,' বলল আসিফ। 'আমরা দ্বীপ বা সিমাউন্ট খুঁজব না। চোখ রাখব পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটের কিনারায়। সেসব জায়গায় হয়তো উঠছে ঢিবি। প্রথমে মনে হবে তৈরি হচ্ছে নতুন পর্বত। এমনই আছে প্রশান্ত মহাসাগর বা অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের কাছে। এসব ঢিবি সরিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি গ্যালন পানি। এ ক্ষেত্রেও বোধহয় তেমনই হচ্ছে। উঠে আসছে সাগর-সমতল।'

'কিন্তু প্রমাণ কোথায়?' বলল রানা, 'পাহাড় বা দ্বীপ উঠলে

সাইসমিক অ্যাকটিভিটির জন্যে তা আমরা জানতে পারতাম।'

'অবশ্যই, ঠিকই বলেছিস,' মাথা দোলাল আসিফ।

'তা হলে?' ভুরু নাচাল রানা।

'এটা ঠিক, অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি,' স্বীকার করল জিয়োলজিস্ট। 'আন্তর্জাতিক কোনও সাইসমিক নেটওঅর্কে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু একজন বলেছিলেন, অস্বাভাবিক কম্পন ধরা পড়েছে তাঁর যন্ত্রে।'

'ইয়োশিরো শিমেযু,' আসিফের নোট দেখে নিয়ে বলল রানা।

মাথা দোলাল জিয়োলজিস্ট। 'জাপানি বিজ্ঞানী। তিনি আবিষ্কার করেছেন সাইসমিক ওয়েভ ধরার অন্যরকম যন্ত্র। এসব কম্পনের নাম দিয়েছেন যি-ওয়েভ। গত এগারো মাসে হাজার হাজার কম্পন পেয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের কাছে। কিন্তু হইচই করেননি। অন্য বিজ্ঞানীরা পাত্তাও দেননি তাঁকে। তাঁর যন্ত্র সত্যিই যি-ওয়েভ ধরতে পেরেছে কি না, তা নিয়েও মাথা ঘামাননি কেউ।'

'তো তাঁর কথা জানলি কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'টেলিগ্রামে যোগাযোগ আছে,' বলল আসিফ।

কপালে চোখ তুলল সোহেল। 'টেলিগ্রাম? কী রে, বাবা, আমরা কি ফিরে গেলাম আঠারো শ' সালে?'

কফিমেকারের কাছে গিয়ে মৃদু হাসছে তানিয়া।

'শুনলে অবাক হবি,' বলল আসিফ। 'ইয়োশিরো শিমেযু খুব অপছন্দ করেন বর্তমান টেকনোলজি। তাঁর আছে একটা কাল্ট। প্রচার করেন, দুনিয়া ভরা ইলেকট্রনিক্সের কারণে ধ্বংস হচ্ছে ঐতিহ্যময় জাপান। তাঁর দলের কেউ ব্যবহার করে না ফোন। ই-মেইল, টেক্সট্ বা ভিডিয়ো কনফারেন্স তাঁর কাছে হারাম। কিছু দিন আগে হাতে চালানো ছাপা মেশিন দিয়ে ছাপিয়ে বই বের করেছেন।' তানিয়ার এনে দেয়া কফিতে চুমুক দিল আসিফ। 'ইয়োশিরো শিমেযু বলছেন, জাপান

সরকার আর টেকনোলজিস্টরা প্রাণে মেরে ফেলতে চাইছে তাঁকে। এদিকে অপরপক্ষ বলছেন: "ওই লোক মাথা খাচ্ছে তরুণ-তরুণীদের। ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রাখছে তাদেরকে।"'

'আসলে কী হচ্ছে, সে ব্যাপারে কিছু জানিস?' জানতে চাইল রানা।

'আগে নামকরা জিয়োলজিস্ট ছিলেন,' বলল আসিফ। 'তারপর হঠাৎ গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। যাক গে, এগারো মাস আগে যি-ওয়েভ শুরু হলে আর্টিকেল লেখেন জাপানি পত্রিকায়। ছয় মাস আগে আরও বেড়ে গেছে যি-ওয়েভ। তারপর গত একমাসে আরও বেড়েছে ওটা।'

সাগর-সমতল উঁচু হওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কয়েক ধাপে যি-ওয়েভ বেড়ে যাওয়ার, বুঝে গেছে রানা, সোহেল ও তানিয়া।

কফির মগের দিকে তাকাল রানা।

চুপ হয়ে গেছে সবাই।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'তো এটাই আমাদের সূত্র?'

'বলতে পারিস খুব সরু একমাত্র সূত্র,' বলল সোহেল।

'কথা বলব অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে,' বলল রানা, 'তিনি আপত্তি না তুললে, দু'ঘণ্টা পর নুমার জেট বিমানে করে রওনা হব আমরা জাপানের উদ্দেশে।'

'ব্যাপারটা কিন্তু বুনো হাঁসের পেছনে ছোটার মত,' বলল তানিয়া। মাথা দোলাল আসিফ।

'ঠিকই বলেছে তানিয়া,' বলল সোহেল। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আগ্রহী না হলে, তখন কী করবি তুই?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ভাড়া নেব চার্টার প্লেন। বস্ বলে দিয়েছেন, জরুরি এই অ্যাসাইনমেন্টে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের যে-কোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতে পারি। নুমার জেট বিমান হোক বা চার্টার্ড বিমান, আমরা যাচ্ছি জাপানে।'

সাত

জাপানের টোকিও শহরের নোংরা অংশের সরু এক গলি ধরে হেঁটে চলেছে লো হুয়াং লিটন। তাকে ঘিরে রেখেছে তিনজন সশস্ত্র বডিগার্ড। বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হলেও হংকং-এর দরিদ্র এলাকায় জীবন শুরু বিলিয়নেয়ারের, তাই একবারও নাক কুঁচকে গেল না আবর্জনার দুর্গন্ধে।

ঢুকে পড়ল ডানের পার্লারে। ভাল করেই জানে, ভেতরের ঘরে অপেক্ষা করছে বিশেষ এক লোক।

বাইরের ঘরে বিলিয়নেয়ার এবং তার তিন বডিগার্ডকে দক্ষ হাতে সার্চ করল চারজন জাপানি লোক। সরিয়ে নেয়া হলো ফোন ও জুতো। বডিগার্ডদের বলা হলো বাইরের ঘরেই রয়ে যেতে।

পেছনের ঘরে গিয়ে ঢুকল লো হুয়াং লিটন।

ঘরের মাঝে পা মুড়িয়ে বসে আছে চিতাবাঘের মত চিকন দেহের এক লোক, সারাশরীরে রঙিন উল্কি। সাধারণ মানুষ তাকে চেনে 'ওরে' নামে। অর্থাৎ: ভূত বা প্রেতাত্মা। যতজনকে খুন করেছে বলে ধারণা করা হয়, তার অর্ধেক সত্যি হলেও সে সংখ্যা আতঙ্কজনক। রাতে বাচ্চারা ঘুমাতে না চাইলে ভয় দেখায় জাপানি মায়েরা: 'ওরে আসছে! ওরে ভয়ঙ্কর! ওরে এলে রক্ষা নেই! চট্ করে ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা!'

লালচে আলোয় তাকে দেখল লো হুয়াং লিটন। গতবার যখন দেখেছে, তার চেয়েও চিকন হয়েছে প্রেতাত্মা।

'আবারও এখানে আসবে, ভাবিনি,' বলল ওরে।

'তোমার জন্যে কাজ নিয়ে এসেছি।'

'এবার কাকে কিডন্যাপ করতে হবে?'

'না,' মাথা নাড়ল লিটন। 'এবারের কাজে রক্ত ঝরবে।'

খুব স্বাভাবিক থাকল ভূতের চেহারা। শান্ত স্বরে বলল, 'অবাক করলে। ব্যবসায়ীরা কেনা-বিক্রির কাজ করে। তাদেরকে কখনও ঝরাতে হয় না কারও রক্ত।'

কথা ঠিক, ভাবল লো হুয়াং লিটন। তবে আপাতত যে কাজে নেমেছে, সেটা শেষ করতে হলে ঝরাতে হবে অনেকের রক্ত। যেমন ঝরবে মানুষের প্রাণ, তেমনি হুড়মুড় করে আসবে কোটি কোটি ডলার।

'এক লোক, তাকে কিনে নিতে পারব না, প্রথম সুযোগেই সমস্যা করবে,' বলল লিটন, 'তাকে আর তার লোকদের সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে। আমার হয়ে কাজটা করলে তুমি নিজেও হয়ে উঠবে বড়লোক।'

'টাকার অভাব নেই আমার,' বলল ওরে।

'তো মানা করে দিতে, আসতাম না,' রাগ দেখাল লো হুয়াং।

'সে উপায় ছিল না। ভুলে যাইনি, তুমি আমার খালাতো ভাই।'

মাথা দোলাল হুয়াং। কথা ঠিক। বাকচাতুরীর সাহায্য নিল সে, 'এবারে আমরা হব হয়তো আপন ভাইয়ের মতই। আমার কাজ শেষ হলে, কেউ আর স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে। টাকাও যেমন পাবে, তেমনি লুকিয়ে থাকতে হবে না পুলিশের ভয়ে।'

'তাই নাকি?' বাঁকা হাসল ওরে।

'মিথ্যা বলছি না।'

কঙ্কালের মত শীর্ণ দু'হাত হাঁটুর ওপর রাখল ওরে। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস করি।

তবে কাজ নিলে ফি নেব আগের মতই। নগদ টাকায়।'

'আপত্তি নেই,' বলল লো হুয়াং লিটন। 'পাবে সব নতুন নোট। বাঁচতে দেবে না শত্রুদের কাউকে। কোথাও রাখবে না কোনও প্রমাণ।'

'ওটাই আমার বৈশিষ্ট্য। নামটা বলো।'

'নামগুলো,' শুধরে দিল লো হুয়াং।

'তা হলে তো আরও ভাল। টাকার অঙ্ক বাড়বে।'

ওরের হাতে সংক্ষিপ্ত লিস্ট দিল হুয়াং। ওখানে লেখা আছে পাঁচজনের নাম।

'কারা এরা?'

'প্রথমজন ইয়োশিরো শিমেযু,' বলল হুয়াং, 'অন্যরা আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। চাই না কেউ বেঁচে থাকুক।'

'কারণটা কী?'

'এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেব না,' জোর গলায় বলল লো হুয়াং লিটন। যদিও ওরে ওকে খুন করবে সে ভয়ে ধুকপুক করছে বুক।

'তা হলে কাজটা নেব না,' জানিয়ে দিল ওরে।

'জানতেই হবে?' মরিয়া হয়ে বলল লো হুয়াং।

'হ্যাঁ। কেন তাদেরকে খুন করতে হবে?'

'ইয়োশিরো শিমেযু নষ্ট করছে আমার ব্যবসা,' বলল লো হুয়াং। কোনও ব্যাখ্যা দিল না। 'অন্য চারজন বাংলাদেশি। ওরাও ক্ষতিকর আমার ব্যবসার জন্যে।'

'কারা এরা?'

'ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'কীভাবে মরুক চাও?'

'সবাইকে পুড়িয়ে মারাই ভাল। প্রমাণ থাকবে না।'

মাথা দুলিয়ে তালিকা মেঝেতে রাখল ওরে। 'প্রমাণ নষ্ট হলেও আগুন ব্যবহারে বাড়বে তোমার খরচ। পাঁচজনের জন্যে আলাদা ফি। আগুন তৈরিতে দেবে বাড়তি টাকা। অ্যাডভান্স

ছাড়া কাজে হাত দেব না।'

'আগেই দেব অর্ধেক,' বলল লো হুয়াং।

চুপ থাকল প্রেতাত্মা।

নার্ভাস বোধ করছে বিলিয়নেয়ার। আজকাল বেশি সময় কাটাচ্ছে সে সুস্থ মানসিকতার পৃথিবীতে, নিজেকে ধমক দিল। এখন শক্ত হতে হবে তাকে।

'বেশ, তা-ই হোক,' বলল ওরে।

শিস বাজাল লো হুয়াং। তার তিন বডিগার্ডের পিছু নিয়ে এল পিশাচের মত শয়তান খুনির চার স্যাঙাৎ। লিটনের প্রধান বডিগার্ড নিচু এক টেবিলে রাখল ব্রিফকেস। খোলা হলো ডালা। ভেতরে কানায় কানায় ভরা বড় নোটের ইউরোর বাণ্ডিল।

'সবাই মরলে পাবে বাকিটা,' বলল লো হুয়াং লিটন।

'কাজ কবে শেষ হলে খুশি হও?' জানতে চাইল ওরে।

'চার বাঙালি আজই পৌঁছুবে টোকিওতে। শিমেযুর সঙ্গে তাদের দেখা হলেই, একসঙ্গে পুড়িয়ে মেরে ফেলাই ভাল।'

আট

টোকিও শহরের দিকে নামতে শুরু করেছে নুমার জেট বিমান। এয়ার পকেটে পড়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। সিটে উঠে বসে দেখল চারপাশ। দু'পাশের সিটে সোহেল, আসিফ ও তানিয়া। দীর্ঘ এ যাত্রায় একটুও ঘুমিয়ে নেয়নি ওরা। রানার ধারণা: বেশি পণ্ডিতির জন্যে সামনে দুঃখ আছে ওদের তিনজনের

কপালে।

নিজে রানা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে বিমানে। ইঞ্জিনের হালকা আওয়াজ যেন স্লিপিং পিল। তা ছাড়া, গত আড়াই মাস বৃষ্টি, ঝড় ও তুষারপাতের মাঝে তাঁবুতে ঘুমাবার পর জেট বিমানের স্লিপার সিট মনে হয়েছে রাজার বিছানা।

'বিমানে পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে তুই চ্যাম্পিয়ন বদ্ধ-পাগল,' ঘড়ি দেখল সোহেল। 'পুরো দশ ঘণ্টা পার করেছিস এক ঘুমে। এটা একটা রেকর্ড।'

'এটা কিছুই না,' বলল রানা, 'এর দ্বিগুণ রেকর্ড আছে আমার।' এতদিন পর মসৃণ গালে হাত বুলিয়ে নিজেকে কেমন যেন অচেনা লাগল ওর।

কেবিনে ঢুকল সুন্দরী অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট। সবার হাতে দিল ইউক্যালিপটাস পাতার সুবাস ভরা ভেজা, গরম তোয়ালে। ওটা দিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছে পুরো সচেতন হয়ে উঠল রানা। জানালা দিয়ে তাকাল নিচে। সাগর থেকে বইছে হাওয়া, তাতে ভর করে উপসাগর পেরোল ওদের বিমান। শহরের ওপরে পৌঁছে ঘুরে চলল মানুষের তৈরি নকল দ্বীপের হ্যানেডা এয়ারপোর্ট লক্ষ্য করে।

হতাশ করল না রাতের টোকিও, ঝিকমিক করছে কোটি কোটি রঙিন বাতি। ঠিক মাঝে আকাশ ছুঁয়ে ঝলমল করছে লালচে স্তম্ভ— টোকিও টাওয়ার।

মাঝারি হোঁচট খাওয়ার পর রানওয়েতে নেমে ক্রমেই হ্রাস পেল বিমানের গতি। ট্যাক্সিং করে গেট লক্ষ্য করে চলল পাইলট।

একটু পর ফুরফুরে মনে বিমান থেকে নামল রানা।

দীর্ঘ বিমান যাত্রায় ওরা পেরিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক ডেট লাইন, ফলে হারিয়ে গেছে পুরো একটা দিন। জাপানে এখন রাত দশটা।

কাস্টম বুথ থেকে বেরিয়ে ব্যাগেজ চেইনের সামনে থামল

ওরা। রানা ও তানিয়ার মনের প্রশ্নটা করল সোহেল, 'টেকনোলজিওয়ালাদের শত্রু তোর আদিম বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, আসিফ?'

'না,' বলল জিয়োলজিস্ট, 'করিনি। তবে হোটেলে উঠেই টেলিগ্রাম পাঠাব। তাতে যদি সাড়া না দেন, তখন অন্য উপায় খুঁজতে হবে।'

'তোমার ভাবতে হবে বলে মনে হয় না,' টার্মিনালের দিকে তর্জনী তুলল তানিয়া।

টার্মিনালের অটোমেটিক গেটের কাছে সাদা প্যান্ট ও ক্লাসিক গেইশা প্যাটার্নের রঙিন সিল্ক টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে এক মেয়ে। কাঁধ থেকে ঝুলছে ব্যাকপ্যাক। হাতের বোর্ডে লেখা: বাঙালি জিয়োলজিস্ট আসিফ রেজা।

'তোমাকেই খুঁজছে ওই মেয়ে,' বলল তানিয়া।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মাথা দোলাল আসিফ।

'তো গিয়ে কথা বল্,' বলল রানা, 'তোর পিছু নেব আমরা।'

আসিফের ভারী সুটকেস অনায়াসেই বামহাতে তুলল সোহেল। রানার সঙ্গে বিপজ্জনক এক অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েছিল কনুইয়ের ওপর থেকে। পরে বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী কুয়াশা ওকে তৈরি করে দিয়েছে দুর্দান্ত কাজের একটা রোবটিক হাত।

তরুণীর সামনে গিয়ে বাউ করল আসিফ। 'আমিই আসিফ রেজা। জিয়োলজিস্ট।'

'আপনিই দেখা করতে এসেছেন মাস্টার ইয়োশিরো শিমেযুর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আর এরা আমার কলিগ।'

'আমার নাম হিনা,' বলল তরুণী, 'মাস্টার শিমেযুর ছাত্রী। তিনি লেকের মধ্যে দুর্গে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন। চমৎকার জায়গা। দয়া করে আমার পিছু নিন।'

ঘুরে টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। পিছু নিল রানা, সোহেল, আসিফ ও তানিয়া। ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছে ওরা। টার্মিনালের বাইরে গিজগিজ করছে গাড়ি, শাটল বাস ও ট্যাক্সি। তাড়াহুড়ো করছে সামনের জায়গা দখল করতে। কিন্তু পাঁচজনের দলটির দিকে এগিয়ে এল না কোনও যানবাহন।

হিনার পাশে হাঁটছে আসিফ ও তানিয়া। পেছনে লেজের মত ঝুলে আছে রানা ও সোহেল। দমে গিয়ে রানাকে বলল বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, 'বুঝলি, ওই ছেমড়ি বোধহয় ভেবেছে হাঁটিয়ে নেবে মাইলের পর মাইল দূরের লেকের তীরে। আমি তা হলে শালা শেষ!'

'না, মনে হয় ঘোড়ার গাড়ি এনেছে,' ভরসা দিল রানা।

'হতে পারে,' মাথা দোলাল সোহেল। 'টেকনোলজি যখন পছন্দ করে না...'

'আমরা অতটা অপছন্দ করি না টেকনোলজি,' নানান আওয়াজের ওপর দিয়ে কথা শুনেছে তরুণী। 'আমাদের আপত্তি শুধু ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্রের ব্যাপারে। সাধারণ সব যন্ত্র ঠিকই আছে, তবে সমস্যা করছে মানুষের মনোভাব পাল্টে দেয়া যন্ত্র। যেমন কমপিউটার, ফোন বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি। ওগুলো প্রতি দিন বারবার বদলে নিচ্ছে প্রোগ্রাম। প্রকাশ করে দিচ্ছে, আপনারা এখন ঠিক কোথায় আছেন, বা কী করছেন। নানানদিক থেকে ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি ডেকে আনছে এসব ইলেকট্রনিক্স জঞ্জাল। তাতে তৈরি হচ্ছে আরও বড় সব সমস্যা।'

'যেমন?' জানার আগ্রহ প্রকাশ করল সোহেল।

'জাপানের কথাই ভাবুন। তরুণ-তরুণীরা ডুবে আছে কমপিউটার, ভিডিয়ো স্ক্রিন বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ভেতর। তাদের কাছে বহু দূরের বিষয় বাস্তবতা। মানুষ হয়েও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে না কেউ। যাচ্ছে রেস্তোরাঁ, বার,

হোটেলে— ডুবে আছে নিজের ভেতর। খাচ্ছে-দাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে। দুনিয়ার হুঁশ নেই। হাজার হাজার মানুষের ভেতরেও একা দ্বীপের মত। চোখ সবসময় কোনও স্ক্রিনে, কানে ইয়ারবাড। এ দেশের মানুষ হয়ে যাচ্ছে রোবটের মত। এখন বিয়ে করতে চায় না যুবক-যুবতীরা। অনেক কমে গেছে বাচ্চা নেয়া। এভাবে চললে আগামী এক বা দুই প্রজন্মের ভেতর জাপানের জনসংখ্যা হবে অর্ধেক। এসবই হচ্ছে পশ্চিমা দুনিয়াতেও। আর এ ক্ষতি করেছে আধুনিক টেকনোলজি।'

মানুষের ভিড়ে ভরা টোকিও দেখে সত্যিই বিশ্বাস হবে না, মাত্র ত্রিশ বছরে অর্ধেক ফাঁকা হয়ে যাবে চারপাশ।

একটা পার্কিং লটে ঢুকে থামল হিনা। 'আমরা রওনা হওয়ার আগে আমার কাছে দেবেন সেল ফোন, আইপড, ক্যামেরা বা কমপিউটার। অন্য আর কোনও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র থাকলে, সেসবও দেবেন।'

ব্যাকপ্যাক নামিয়ে একে একে সবার ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে লাগল হিনা। রানা খেয়াল করল, ওই ব্যাগের ভেতরে রয়েছে কোনও ধাতুর তৈরি ফয়েল।

সবার কাছ থেকে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র নেয়ার পর দেখা গেল তৈরি হয়েছে ছোটখাটো স্তূপ। মনে মনে স্বীকার করল রানা, আজকাল প্রত্যেকে ওরা বয়ে বেড়াচ্ছে এসব। অথচ, কয়েক বছর আগেও এসবের কোনও দরকার ছিল না কারও।

'এত কিছু, বাপ্স্!' বিড়বিড় করল সোহেল।

ভারী ব্যাগের মুখ বেঁধে পার্কিং লটের আরেকদিকে এল হিনা। রানা ভেবেছিল, ওদেরকে নেয়ার জন্যে সাদা কোনও ভ্যান গাড়ি এনেছে মেয়েটা, কিন্তু দেখা গেল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ষাট দশকের দুটো ক্লাসিক জাপানি গাড়ি।

প্রথমটা সাদা সেডান। দেখতে অনেকটা ওই সময়ের বিএমডাব্লিউ গাড়ির মত। খুব দ্রুত চলার জন্যে তৈরি চাকা। ভেতরে ভিন্টেজ স্পয়লার। চকচক করছে পলিশ করা ক্রোম।

দ্বিতীয় গাড়িটা উনিশ শ' উনসত্তর সালের রুপালি রঙের ডাটসান ২৪০যেড। নিচু ও লম্বা হুড। নিচু ছাত ও উইণ্ডশিল্ড পেরিয়ে অনেকটা সামনে আয়না। ফেণ্ডার দেখলে যে-কারও মনে হবে, যেন খুব দ্রুত চলছে গাড়িটা। দারুণ যত্নে তৈরি দু'পাশের কিনারা। ভেন্ট দেখতে মাছের ফুলকার মত। যে-কেউ ভাববে, গাড়িটা আসলে ডাঙায় চলা ক্ষুধার্ত হাঙর।

রানার কাছ থেকে গাড়ি বিষয়ে বহু কিছুই শিখেছে সোহেল। নিজেও হয়ে উঠেছে দক্ষ এক্সপার্ট। প্রশংসা না করে পারল না, 'দুর্দান্ত গাড়ি তো!'

'স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে কিনে নিজেই মেরামত করেছি,' গর্ব ভরে বলল হিনা।

'তাই?' চমকপ্রদ তথ্য পেয়ে অবাক হয়েছে সোহেল। বলে ফেলল, 'তা হলে পরে সুযোগ পেলে আমরা দু'জন মিলে হয়তো মেরামত করব কোনও পুরনো গাড়ি।'

মুখে কিছু না বলে মৃদু মাথা দোলাল হিনা। 'এই দুই গাড়িতে করে লেকের তীরে যাব।' সেডানের পাশে গেল সে। ট্রাঙ্ক খুলে ওখানে রাখল রানাদের কাছ থেকে জব্দ করা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র ভরা ব্যাগ। রানা খেয়াল করল, ট্রাঙ্কের ভেতরেও আরেক স্তরের ধাতুর লাইনিং।

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি,' হিনাকে বলল সোহেল।

ধুপ্ করে ট্রাঙ্ক বন্ধ করে হিনা বলল, 'না, আমার সঙ্গে যাবেন বাঙালি জিয়োলজিস্ট আসিফ রেজা।'

এ কথায় মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রেমিকপুরুষ সোহেল।

'আর বাঙালি জিয়োলজিস্ট আসিফ রেজার সঙ্গে অবশ্যই যাবে তার স্ত্রী,' জানিয়ে দিল তানিয়া।

'তাতে কোনও আপত্তি নেই,' বলল হিনা। 'অন্য দু'জন দ্বিতীয় গাড়িটাতে করে পিছু নেবেন। বেশি পেছনে পড়ে যাবেন না। আমরা দ্রুত গতি তুলে যাব। হয়তো এরই ভেতর নজর রাখছে কেউ।'

রানা ও সোহেলের দিকে চাবি ছুঁড়ে দিল তরুণী।

খপ্ করে চাবি ক্যাচ ধরল সোহেল। রানাকে বিজয়ীর হাসি দিয়ে বলল, 'আমিই গাড়ি চালাচ্ছি।'

ক্লাসিক স্পোর্টস্ কারের দিকে চলেছে। রানা গিয়ে খুলল ডানদিকের দরজা। একইসময়ে গাড়ির বামের দরজা খুলে নিজের ভুলটা বুঝে মুখ গম্ভীর করে ফেলল সোহেল। কঠোর চোখে তাকাল রানার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে সমাসীন হয়েছে রানা।

'যাশ্‌শালা!' বিড়বিড় করল সোহেল। আমেরিকায় ক'দিন গাড়ি চালিয়ে মনে ছিল না, জাপানি গাড়ির স্টিয়ারিং থাকে ডানদিকে।

'জাপানে রাইট হ্যাণ্ড ড্রাইভ গাড়ি চলে, দোস্ত,' আগুনে ঘি ঢালল রানা। 'পরেরবার মনে রাখবি। তা হলে দেখবি তোর বান্ধবীর সঙ্গে বসে গাড়ি মেরামত সহজ হবে।'

'জেট ল্যাগে মাথা কাজ করছে না, আর সেই সুযোগে আমাকে ঠকিয়ে দিয়েছিস,' আপত্তির সুরে বলল সোহেল।

'এজন্যেই বলেছিলাম প্লেনে একটু ঘুমিয়ে নে,' জিভ দিয়ে চুকচুক করে আওয়াজ তুলল রানা। 'ওই ঘুম তোকে প্রায় তুলে আনত আদিম মানুষের কাছাকাছি। এবার চাবিটা দে দেখি!'

'শ্লালা, বাটপার!' চাবি দিয়ে গোমড়া মুখে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে পড়ল সোহেল।

ইঞ্জিন চালু হতেই একযস্ট পাইপ থেকে বেরোল নিখুঁত আওয়াজ। ডাটসান ২৪০যেড-এর দুই দরজা বন্ধ হতে না হতেই রওনা হয়ে গেল সাদা সেডান। দ্রুত গতি তুলছে হিনা। গিয়ারশ্যাফ্ট ধরে ব্যাক গিয়ার ফেলে পিছিয়ে গেল রানা, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে তীরবেগে চলল সেডানের পেছনে। একমিনিট পেরোবার আগেই দুই গাড়ি উড়ে চলল রাত্রিকালীন টোকিওর সড়কে।

কিছুক্ষণ পর গতি কমাতে হলো জ্যামের কারণে। তবে শহর পেছনে পড়ার পর আবারও তুমুল গতি তুলল হিনা। পেছনে আঠার মত লেগে রইল রানা ওর ডাটসান ২৪০যেড নিয়ে। ঘণ্টায় এক শ' মাইল বেগে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমের হাইওয়ে ধরে।

'সত্যিই কেউ চোখ রেখেছে ভাবছিস?' জানতে চাইল সোহেল।

'কাউকে দেখিনি,' বলল রানা। 'তবে বেশিরভাগ মানুষ চাইছে আরও আধুনিক হোক জাপান, আর এরা চাইছে তার উল্টোটা।' হাত বাড়িয়ে ম্যানুয়াল অ্যানালগ বাটন টিপে এম/এফ রেডিয়ো চালু করল রানা। ঠিক জায়গায় নিল নিডল। 'মনে আছে, ছোটবেলায় এই জিনিস দেখে লোভ হতো? কিন্তু বড়রা ধরতে দিতেন না। সে সময়ের আধুনিক টেকনোলজি।'

মৃদু হাসল সোহেল। 'মনে আছে। অ্যানালগ রেডিয়ো। এই গাড়িটাও অন্য যুগের টেকনোলজি। কার্বুরেটর আছে। ম্যানুয়ালি ক্যামশাফ্ট্ দিয়ে বন্ধ বা খুলতে হবে ভাল্ভ্। কমপিউটার ডায়াগনস্টিক আর ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট তখনও আঁকা হয়নি ড্রয়িং বোর্ডে। সত্যিকারের মেশিন। যে চালাবে, চলবে তার ইশারায়। নিজে থেকে ভাববে না।'

লেন বদলে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিল রানা। সাঁই করে পেছনে পড়ল নতুন অডি আর লেক্সাস গাড়ি। 'এই জিনিসের মজাই আলাদা। মনে হয় কিছু করছি।'

একঘণ্টা হাইওয়ে ধরে যাওয়ার পর ওরা ঢুকল অন্ধকার, টিলাময় এলাকায়। চলল অপেক্ষাকৃত সরু সেকেণ্ডারি রোড ধরে। পেরিয়ে গেল আরও একঘণ্টা। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে হিনার পেছনে চলেছে রানা। আরও অনেকক্ষণ পর পৌঁছুল উঁচু এক মালভূমিতে। এরপর পথ হলো সোজা। দূরে দেখা গেল চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে হ্রদ।

কাছে গিয়ে গতি কমিয়ে মাটির কাঁচা রাস্তায় নামল হিনা।

এগিয়ে চলল।

'আশপাশে বাড়ি নেই,' মন্তব্য করল সোহেল। 'দুর্গ তো দূরের কথা!'

চুপ করে থাকল রানা। মেয়েটার পিছু নিয়ে পৌঁছে গেল লেকের তীরে। ওরা দেখল এক শ' ফুট দূরে পানির ভেতর ছোট একটা দ্বীপ। সরু সেতু গেছে ওদিকে। খুব সাবধানে সেতুর ওপর গাড়ি তুলল হিনা। রানা ও সোহেল বুঝল, ওই সেতু প্রস্থে বড়জোর মেয়েটার গাড়ির সমান। হেডলাইট গিয়ে পড়ল দ্বীপে। সামনে রয়েছে পুরু পাথরের দেয়াল। মাঝে ড্র-ব্রিজ। ধীরে ধীরে নামছে ওটা।

'দ্বীপই দুর্গ বা কেল্লা,' বলল সোহেল।

প্রাচীন দেয়ালে জায়গায় জায়গায় পাথরের ব্যাটলমেন্ট। ভেতরের দিকে বিশাল প্যাগোডা আকৃতির দুর্গ।

'যখন তখন দেখব ড্রাগন,' ঠাট্টার সুরে বলল সোহেল।

রানার মনোযোগ কাঠের সেতুর ওপর। ওটা এতই সরু ও নড়বড়ে, একটু এদিক-ওদিক হলে গাড়ি নিয়ে লেকে পড়বে ওরা। 'সেডান যখন গেছে, আমরাও পারব।'

নেমে এসেছে ড্র-ব্রিজ। ওটার ওপর উঠল হিনার গাড়ি। ঢুকে পড়ল দুর্গের ভেতর।

'এবার আমাদের পালা,' শ্বাস আটকে বলল সোহেল।

সাবধানে এগোল রানা। ধুপ্ আওয়াজে কাঠের তক্তায় উঠল গাড়ি। ঠিকভাবে চলেছে বুঝতে মাথা বের করে সামনের চাকার ওপর চোখ রাখল রানা। সেতুর এক ইঞ্চি ভেতরে রয়ে গেছে চাকার বাইরের দিক।

'এদিকে অনেক জায়গা,' জানাল সোহেল।

'কতটা?'

'অন্তত তিন ইঞ্চি।' রানাকে দেখে নিল সোহেল।

'শুনে সন্তুষ্ট হইলাম, বৎস।' বামে দুই ইঞ্চি সরল রানা। শামুকের গতি তুলে চলেছে ড্র-ব্রিজের দিকে। নিচে কড়মড়

আওয়াজে গুঙিয়ে উঠছে তক্তা। ড্র-ব্রিজ প্রস্থে আরও কয়েক ইঞ্চি চওড়া। সেতুর চেয়ে মজবুত। নিচে লোহার পাত। ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে দুর্গের গ্যারাজে ঢুকল রানা। আগে ওখানে রাখা হতো ঘোড়া।

গ্যারাজের চারদিকে ডযনখানেক গাড়ি। সব পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর সালে তৈরি। একটা মিনি কুপার গাড়ির পাশে থামল রানা। কিছুটা দূরে আইকনিক ইউনিয়ন জ্যাক। ছাতে ভোরের লালচে সূর্য আঁকা।

'ভাল সংগ্রহ,' মন্তব্য করল সোহেল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল ওরা। এসে রানার হাত থেকে চাবি নিল ধূসর আলখেল্লা পরা এক তরুণ। একই পোশাকের এক তরুণী নিল হিনার গাড়ির চাবি। রানা দেখল, দুই তরুণ-তরুণীর কোমরের খাপে ড্যাগার। চারদেয়ালে ঝুলছে প্রাচীন সব অস্ত্র। তলোয়ার, বর্শা, কুঠার, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি। গ্যারাজ ভরা পুরনো আমলের গাড়ির সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না অস্ত্রগুলো। তবে খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, গাড়ি বা অস্ত্র প্রতিটি অ্যান্টিক— দুর্মূল্য।

কোথা থেকে যেন বাজপড়া এক কণ্ঠ বলে উঠল, 'স্বাগতম আমার দুর্গে!'

চোখ তুলে তাকাল রানা। গ্যারাজের ওপরের বারান্দা থেকে এসেছে কণ্ঠস্বর। লোকটার পরনে কালো আলখেল্লা। কাঁধে কাঠের বোর্ড। কোমরে ঝুলছে লাল-সাদা দীর্ঘ খাপ। ভেতরে বোধহয় কারুকাজ করা সামুরাই তলোয়ার। লম্বা চুল খোঁপা করেছেন ভদ্রলোক। গালে বাঁদরের মত হালকা দাড়ি। গোঁফ নেই। 'আমিই ইয়োশিরো শিমেযু,' বললেন তিনি। 'দুঃখিত, দুর্গে ঢোকার আগে সার্চ করা হবে আপনাদেরকে। তবে আমরা খুশি, এসেছেন অতিথি হতে। আতিথেয়তায় ত্রুটি করব না আমরা।'

রানাদেরকে ঘিরে ফেলেছে শিমেযুর ক'জন স্যাঙাৎ।

ওদিকে ধুম্ আওয়াজে আটকে গেল ড্র-ব্রিজ। ব্র্যাকেটে লোহার দণ্ড বসিয়ে দিল দু'জন তরুণ।

'ফোন বা ই-মেইল নেই...' বিড়বিড় করল সোহেল।

'বেরোবারও উপায় নেই,' নিচু গলায় ওকে বলল রানা। 'তরুণ-তরুণীদেরকে জিম্মি করেছে, সাধে বলে না অন্যরা।'

নয়

রানা ভেবেছিল, দক্ষ হাতে সার্চ করবে ওদেরকে। কিন্তু গায়ে হাত না দিয়ে আগাপাছতলা বুলিয়ে নেয়া হলো দীর্ঘ তারওয়ালা ভারী এক ডিভাইস দিয়ে। যন্ত্রটায় কোনও সুইচ নেই। সর্বক্ষণ জ্বলছে লাল বাতি।

'ইলেকট্রোম্যাগনেট?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক,' মাথা দোলালেন শিমেযু। 'ব্যাটারি পাওয়ার্ড। অপারেট করা হয় ম্যানুয়ালি। যথেষ্ট শক্তিশালী। আপনাদের কাছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস থাকলে ওটা থেকে মুছে যাবে সব প্রোগ্রামিং।'

রানার ঘড়ি খুলে দেখে নিয়ে ফেরত দেয়া হলো। ওটা কবজিতে পরে জিজ্ঞেস করল ও, 'কেন ভাবছেন এখানে এসে কিছু রেকর্ড করব আমরা?'

'কারণ আপনারা বাঙালি হলেও এসেছেন আমেরিকান সংস্থা নুমা থেকে; আর হাতে হাত রেখে চলে আমেরিকান আর জাপান সরকার,' বললেন শিমেযু। 'ক'বছর হলো, কয়েকটা সরকারী এজেন্সি পেছনে লেগেছে। পিছু নেয়া হয় আমার

ছাত্র-ছাত্রীদের। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।'

'আমরা সরকারী কাজে আসিনি,' জোর দিয়েই বলল রানা। 'আসিফ জিয়োলজিস্ট, ও আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে, কেন এসেছি।'

এক পা সামনে বাড়ল আসিফ। 'আমরা আসলে জানতে চাই যি-ওয়েভ সম্পর্কে। আগে কখনও ওই ধরনের ভূমিকম্পের কথা বলেনি কেউ।'

'আপনার টেলিগ্রামে এটা লিখেছেন,' বললেন শিমেযু। 'কিন্তু এতদিন পর হঠাৎ কেন আগ্রহী হলেন? আর সবাই তো এককথায় আমাকে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের ধারণাঃ আধুনিক যন্ত্র দিয়ে যি-ওয়েভ ধরা না গেলে, আমি কীভাবে সব জানছি? কথাটা বুঝতে পেরেছেন?'

'যি-ওয়েভের সঙ্গে জড়িত অন্য একটি ব্যাপার, এ কারণেই আমরা আগ্রহী,' বলল আসিফ। 'প্রায় একবছর ধরেই হঠাৎ করে বাড়ছে সাগরের পানি।'

'এগারো মাস আগে থেকে পাচ্ছি যি-ওয়েভ,' বললেন শিমেযু।

সরাসরি কাজের কথায় এল তানিয়া, 'আপনি কীভাবে ধরেছেন ওই ওয়েভ? মানে... আপনি তো আর আধুনিক টেকনোলজি...'

কড়া চোখে ওকে দেখলেন শিমেযু। 'ও, তা হলে এটাই আপনাদের মস্ত প্রশ্ন? তো শুনে নিন, কমপিউটার আবিষ্কারের বহু আগেও ভূমিকম্প বা আরও অনেক কিছুর খবর জেনেছে মানুষ। যেমন, জন্তু-জানোয়াররা কিন্তু পৃথিবীর ভূকম্পন টের পায় অনেক আগেই। হয়তো জানেন, আজ থেকে বিশ শতক আগেই সাইসমোগ্রাফ তৈরি করেছিলেন চাইনিয গবেষক ঝ্যাং হেং।'

'মনে আছে ওটার কথা,' বলল আসিফ। 'দারুণ যন্ত্র। যতটা মনে পড়ে, বড় এক ব্রাসের ড্রামে নির্দিষ্ট সব জায়গায়

ছিল কারুকাজ করা আটটা গিরগিটি। প্রতিটির মুখে থাকত একটা করে আলগা বল। প্রাসাদে ভূমিকম্প হলে গিরগিটির মুখ থেকে খসে পড়ত বল। বোঝা যেত কোন্‌দিক থেকে আঘাত হেনেছে ভূমিকম্প।'

'প্রায় ঠিকই বলেছেন,' বললেন শিমেযু। 'পরে ওটার নকল দেখাব। গিরগিটি ছিল আসলে চাইনিয ড্রাগন। আর ওটার মুখ থেকে বল পড়লে গপ্‌ করে গিলে ফেলত ব্রোঞ্জের এক ব্যাঙ। এ অংশটুকু ভুলে গেছেন।'

'জানতাম এখানে ড্রাগনের দেখা পাব,' হালকা সুরে বলল সোহেল।

ওকে একবার দেখে নিয়ে শিমেযুর দিকে তাকাল রানা। 'দেখাবেন আপনার যন্ত্রটা?'

বারান্দা থেকে নেমে ওদেরকে নিয়ে ফয়ে পার হয়ে দীর্ঘ এক করিডোর ধরে হেঁটে চললেন শিমেযু। রানা খেয়াল করেছে, একবারের জন্যেও গুরুর কাছ থেকে সরছে না হিনা। মেয়েটাকে কর্মচারী নয়, বডিগার্ড বলেই মনে হলো ওর।

বড় উঠান পেরিয়ে লেকের তীরে প্যারাপেটে পৌঁছুল ওরা। চাঁদের আলোয় রুপালি কাঁচের মত চকচক করছে লেক। বাইরের দেয়াল ও দুর্গের মাঝে শুকনো পরিখা।

রানার কাঁধে টোকা দিল সোহেল। 'ওই দ্যাখ্‌!'

শুকনো পরিখায় চোখ বোলাল রানা। খাদের মাঝে খাটো সব পায়ে ভর করে হেঁটে বেড়াচ্ছে ক'টা কমোডো ড্রাগন।

মৃদু হাসল সোহেল। 'ওগুলো কীভাবে খায়, দেখতে পেলে বেশ হতো।'

'পরে দেখাব,' বললেন শিমেযু।

পরিখার ওপর দিয়ে গেছে ছোট্ট সেতু। ওটা পেরিয়ে দুর্গের বড় এক ঘরে ঢুকল ওরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জাপানি জিনিসপত্র। কোনওটা প্রাচীন, আবার কোনওটা গত শতাব্দীর প্রথমদিকের জাপানি শিল্প।

ঘরের একদিকের দেয়াল স্বচ্ছ কাঁচের। পুরো ছাতও তাই। একপাশে তামার বড় যন্ত্র। ওটা থেকে অন্যদিকের কাঁচের দেয়াল ভেদ করে পাইপ গেছে বাঁশের প্যানেলের পেছনে। ঘরের মাঝে লাল ভেলভেটের কয়েকটা কাউচ। অতিথিদেরকে ওখানে বসতে ইশারা করলেন শিমেযু। বসল ওরা। পাশেই পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আগুন। চট্‌পট্‌ আওয়াজে ফাটছে চ্যালা কাঠ। চারদিকে পলিশ করা কাঠের টেবিলে অ্যান্টিক গ্লোব ও অদ্ভুত সব মেকানিকাল ইকুইপমেন্ট। স্প্রিং, লিভার ও গিয়ার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যন্ত্রগুলো।

অদ্ভুত দর্শন এক যন্ত্র আদিম কোনও অস্ত্র। কিছু অস্ত্র চিনল রানা। অন্যগুলো অচেনা। আরও রয়েছে ভাল্‌ভ্‌ ও ছোট ট্যাঙ্কওয়ালা এক জিনিস। রানার মনে হলো, ওটা প্রাচীন কোনও ডাইভিং ইকুইপমেন্ট।

ঘরের কোণে হস্তচালিত পুরনো গ্যাটলিং গান।

'মনে হচ্ছে হাজির হয়েছি অ্যান্টিকের দোকানে,' বলল তানিয়া।

একদিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে বড় একটা কেবিনেট দেখালেন শিমেযু। 'এটাই আমার ডিটেক্টর।' অস্বচ্ছ কাঁচের দরজা খুলে সরে দাঁড়ালেন। ভেতরে পোকার মত বিদঘুটে এক জিনিস। সারাশরীরে সরু হাজারখানেক তার। দেখলে মনে হবে মাকড়সার জাল। কোনও কোনও তারের ওপর বসে আছে নানা আকৃতি এবং আকারের চকচকে স্ফটিক।

'আপনারা হয়তো জানেন, ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে রাখলে কাঁপে কোয়ার্ট্য্‌ স্ফটিক। আর এসব প্রতিটি তার সোনার। সত্যিকারের নিখুঁত ইলেকট্রিকাল কণ্ডাক্টর। ভূমিকম্প হলে বেরিয়ে আসে মেকানিকাল এনার্জি। তার ভেতর কিছু হয়ে উঠবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। পৃথিবীর গভীর থেকে এনার্জি বেরোলে, এসব তারের মাধ্যমে ইলেকট্রিকাল চার্জ ঢুকবে

স্ফটিকের ভেতর। ফলে তৈরি হবে সুরেলা কম্পন। সে কারণেই আমরা ধরতে পারি যি-ওয়েভের সিগনাল। পৃথিবীর আর কেউ এ ডিযাইন ব্যবহার করছে না, নইলে ঠিকই ধরা পড়ত যি-ওয়েভ।'

ভারী কেবিনেটের কাছে দেয়ালে ঝুলন্ত বিশ্বের মানচিত্রের সামনে থেমে জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'জিনিসটা আসলে কী?' পুরো ঘরে প্রাচীন অ্যান্টিক জিনিসপত্র। মানচিত্রের চারদিকে চকচকে রুপোর পাতা। কাগজের একপাশে আধুনিক লাল কালিতে আঁকা অসংখ্য লাইন।

'প্রতিটা যি-ওয়েভ আছে ওখানে,' বললেন শিমেযু।

সোহেলের পাশে পৌঁছে গেল আসিফ। মনোযোগ দিয়ে দেখল মানচিত্র। একটু দূরে রানা ও তানিয়া। ভুরু কুঁচকে গেছে আসিফের। চোখ খুঁজছে কোনও খুঁত।

ফাটল ধরা একটা চাঁদা নিলেন শিমেযু। ওটাকে পয়েন্টার হিসেবে ধরে দেখালেন দীর্ঘ সব লাইন। 'প্রতিটা ওয়েভ এলে তার শক্তি আর গতিপ্রকৃতি মেপে নিয়েছি। একেকটা ভূমিকম্পে তৈরি হয়েছে একটা করে রেখা বা লাইন। অন্য কেউ জানে না, তবে আমি এগুলোকে বলি: ভূতের কম্পন। তবে দুঃখজনক, জানতে পারিনি ভূমিকম্প আসে কোথা থেকে। জানা নেই শুরুটা হয়েছে কোথায়। তবে এটা জানি, এসেছে এদিকে।'

'কোথায় শুরু তা বের করতে পারেননি?' জানতে চাইল তানিয়া।

'জানতে হলে চাই দ্বিতীয় স্টেশন,' জোর দিয়ে বললেন শিমেযু। 'ব্যাপারটা মাঝখান থেকে রেডিয়ো সিগনাল রিসিভ করার মত। একটা রিসিভার বড়জোর বলে দেবে ওয়েভ চলেছে কোন্‌দিকে। কিন্তু দুটো রিসিভার হলে দুটোর মাধ্যমে ধরা পড়বে কোথা থেকে শুরু ওই কম্পন।'

'তা হলে আরেকটা স্টেশন বসাতে পারতেন।'

'পরে তাই করেছি,' বললেন বিজ্ঞানী। 'কিন্তু এরপর গত একটা সপ্তাহে ধরা পড়েনি কোনও কম্পন।'

'এটা কেমন হলো?' আনমনে বলল তানিয়া। 'গেলেন পাহাড়ে ক্যাম্প করতে, হঠাৎ দেখলেন বিগফুট, কিন্তু তখনই মনে পড়ল, ফুরিয়ে গেছে ক্যামেরার ফিল্ম।'

'কখনও কখনও এমনই হয়,' বলল আসিফ। আবারও দেখল ম্যাপ। 'এসব লাইনের পাশের নম্বর কী বোঝাচ্ছে?'

'তারিখ আর তরঙ্গের মাত্রা,' বললেন শিমেযু।

বাংলা বা ইংরেজির মত নয় জাপানের তারিখ, মাস ও বছর। প্রথমে লেখা হয় বছর, তারপর মাস, শেষে তারিখ। সংখ্যাগুলো দেখে নিয়ে মানচিত্রে মনোযোগ দিল রানা। শিমেযুর যি-ওয়েভ প্রতি নব্বুই দিন পর পর বেড়েছে দ্বিগুণ।

ঠিক কবে কখন ওয়েভ শুরু হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন শিমেযু। আর তখনই অস্বচ্ছ কাঁচের দরজার ওদিকে মেশিনে জ্বলে উঠল নীল বাতি। দৌড়ে ওখানে গেলেন শিমেযু। মৃদু আওয়াজ শুরু করেছে ভেতরের একটা বাক্স। তিরতির করে কাঁপছে সোনালি কয়েকটা তার। খির-খির শব্দে দ্বিমাত্রার রেখাওয়ালা এক কাগজ বেরোতে লাগল পুরনো এক মেশিন থেকে।

'নতুন ওয়েভ,' উত্তেজিত হয়ে বললেন শিমেযু, 'সেকেণ্ডারি গ্রুপ, এবার জানব কোথায় আছে এপিসেণ্টার।'

বড় এক ডেস্কের সামনে গেলেন তিনি, খপ করে তুলে নিলেন নিকেল করা পুরনো মাইক্রোফোন। এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হতো প্রাচীন, ছোট রেডিয়ো স্টেশন বুথে। কয়েকটা বাটন টিপে বলে উঠলেন শিমেযু, 'ইটো, আমি শিমেযু। শুনছ আমার কথা?' টক সুইচ থেকে বুড়ো আঙুল সরিয়ে অপেক্ষা করছেন। কয়েক সেকেণ্ড পর টক সুইচ টিপে আবারও বললেন, 'ইটো, আমি শিমেযু। শুনতে পাচ্ছ? ধরতে পেরেছ যি-ওয়েভ?'

কয়েক সেকেণ্ড পর উত্তেজিত কণ্ঠ এল দ্বিতীয় স্টেশন থেকে, 'জী, মাস্টার শিমেযু। ধরতে পেরেছি ওয়েভ।'

'কোন্ দিক থেকে আসছে?'

'একমিনিট অপেক্ষা করুন। সরে যাচ্ছে সিগনাল।'

অতিথিদের দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী। 'এজন্যেই অপেক্ষা করছি। আপনাদের কপাল ভাল। ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন।'

অপেক্ষা করছে ওরা সবাই।

স্পিকারে ভেসে এল নারীকণ্ঠ: 'আমার হিসেব অনুযায়ী এটা থ্রি লেভেলের ওয়েভ। বেয়ারিং টু-ফোর-ফোর ডিগ্রি।'

'স্ট্যাণ্ড বাই,' বললেন শিমেযু। দৌড়ে গেলেন নিজের মেশিনের সামনে। খুব সাবধানে ঘোরাতে লাগলেন ব্রাসের বড় এক লিভার। সঙ্গে ঘুরছে পয়টার গাম্বাল। বেয়ারিঙের মার্কার দেখে নিয়ে গলা উঁচিয়ে বললেন, 'টু-সিক্স-যিরো।'

গেলেন মানচিত্রের সামনে। হাতে বড় আকারের জ্যামিতিক চাঁদা। মানচিত্রের ঠিক জায়গায় ধরলেন ওটা। এ দুর্গ থেকে সোজা দুই শ' ষাট ডিগ্রি ধরে মানচিত্রে জাপানের ওপর দিয়ে চলতে চলতে পৌঁছে গেলেন নাগাসাকি শহরে। ওখানে না থেমে গেলেন সাগরে। এবার খুঁজে পেলেন ইটোর স্টেশন। ওটা ছোট এক দ্বীপে। ওই স্টেশনের ওয়েভ মেপে পেলেন, দু' শ' পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি থেকে এসেছে রহস্যজনক তরঙ্গ।

এসব রেখা দেখাচ্ছে পুব চিন সাগর। তবে আশপাশে কোথাও নেই টেকটোনিক প্লেট। রানা দেখল, ওখানে আছে পাথরের কঠিন মহাদেশীয় শেলফ। জায়গাটা শাংহাই থেকে বড়জোর এক শ' মাইল দূরে। বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল রানা। বিস্ময় নিয়ে মানচিত্রের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। গেলেন মাইক্রোফোনের কাছে। 'নম্বর ঠিক আছে তো? ভুল হলো না তো? আবারও জানাও।'

আবারও লাইনে এল ইটো। 'একমিনিট...'

ওদিক থেকে এল কর্কশ আওয়াজ।

'কী হচ্ছে...' বলতে বলতে থেমে গেল তানিয়া।

'গুলি করা হচ্ছে,' বলল রানা।

'ইটো, শুনছ?' গলা উঁচু করে ডাকলেন বিজ্ঞানী, 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

এল জোরালো স্ট্যাটিকের আওয়াজ, তারপর বলে উঠল মেয়েটা, 'টিলা বেয়ে উঠে আসছে একদল লোক! তাদের হাতে...'

গুলির আওয়াজে চাপা পড়ল তার কণ্ঠ। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। তারপর এল বিস্ফোরণের আওয়াজ।

'ইটো?' শক্ত হাতে মাইক্রোফোন ধরেছেন শিমেযু। 'ইটো!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। থরথর করে কাঁপছে হাত।

ভদ্রলোক অভিনয় করছেন না, পরিষ্কার বুঝল রানা।

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছেন শিমেযু। হঠাৎ করেই দুর্গের কোথাও থেকে বেজে উঠল গম্ভীর আওয়াজে ভারী একটা ঘণ্টা। ব্যরবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিষাদ ভরা শব্দ।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'ওটা আমাদের সতর্কতামূলক ঘণ্টি,' বললেন শিমেযু।

ওদের পেছনে ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল ছাতের কাঁচ। একইসময়ে জানালার কাঁচ চুরমার করে মেঝেতে এসে পড়ল সবজেটে, গোল কী যেন!

গড়াতে শুরু করে এগিয়ে এল রানাদের দিকে!

দশ

ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভাঙতেই ভারী ডেস্ক টপকে ইয়োশিরো শিমেযুকে নিয়ে দূরের মেঝেতে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। চোখের কোণে দেখেছে কাভার নিতে অন্যদিকে ঝাঁপ দিয়েছে আসিফ ও তানিয়া। সোহেলের পায়ের কাছেই ছিল গ্রেনেড।

দক্ষ উইকেট কিপারের মত বোমা তুলেই পরক্ষণে ফিরতি পথে ছুঁড়ে দিয়েছে সোহেল। জানালার কাঁচে গর্ত তৈরি করে কিছুটা গিয়েই বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড। আগুনে বোমা, নানাদিকে ছিটকে দিয়েছে জেলি করা গ্যাসোলিন। কাছাকাছি কেউ থাকলে বেঘোরে পুড়ে মরত। বিস্ফোরিত গ্রেনেড জ্বলে উঠেছে আস্ত সূর্যের মত। মুহূর্তে ঘরের প্রতিটি জানালা চুরমার করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে জ্বলন্ত গ্যাসোলিন ও কাঁচের টুকরো। ঝনঝন আওয়াজ থামতে না থামতেই ওরা শুনল লেকে মোটরবোটের কর্কশ গর্জন। পরের মুহূর্তে শুরু হলো দুর্গের ভেতর পশলা পশলা গুলির আওয়াজ।

জাপানি বিজ্ঞানীকে মেঝেতে উঠে বসতে সাহায্য করল রানা। 'শত্রুরা হামলা করেছে আপনার দুর্গে।'

'কিন্তু কেন?' অবাক হয়ে বললেন শিমেযু। 'এ কাজ করবে কে?'

'আমিও তা-ই জানতে চাই,' বলল রানা।

'আমার শিষ্যরা রক্ষা করবে দুর্গ,' গর্বের সঙ্গে বললেন

বিজ্ঞানী।

গুলির শব্দ বহু কিছু বুঝিয়ে দিল রানাকে। শুকনো গলায় বলল ও, 'তলোয়ার বা ড্যাগার দিয়ে? কীভাবে?'

'এটা কাজে আসতে পারে,' পুরনো গ্যাটলিং গানের পাশ থেকে বলল সোহেল, 'আপনার কাছে অ্যামিউনিশন আছে?'

'গুলি আছে কয়েক বাক্স,' বললেন শিমেযু।

ব্রেক খুলে ফ্রেমের ভেতর কাঁধ রাখল সোহেল। চাকা ঘুরিয়ে জানালার কাছে নিয়ে গেল পুরনো অস্ত্রটা।

'আর কোনও অস্ত্র?' জানতে চাইল রানা।

'টাওয়ারে একটা কামান আছে,' বললেন বিজ্ঞানী।

'স্পিডবোটের বিরুদ্ধে কাজে আসবে না,' বলল রানা। চোখ বোলাল দেয়ালে ঝুলন্ত অস্ত্রগুলোর ওপর। তাকে আছে ক্রসবো আর তূণ ভরা লোহার চোখা ফলাওয়ালা তীর। বিজ্ঞানীকে বলল রানা, 'আপনি সোহেলকে গুলি এনে দিন। নিচু রাখবেন মাথা।'

নিজেও কুঁজো হয়ে দেয়ালের কাছে গেল রানা, সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল ঘরের বাতি। তাক থেকে নিল ক্রসবো ও তীর ভরা তূণ। আবছা আলোয় আসিফ ও তানিয়াকে দেখল। আসিফের হাতে একটা বর্শা। তানিয়ার হাতে মোটা লাঠি। কী যেন পেঁচিয়ে রেখেছে হ্যাণ্ডেলের কাছে। নিচু গলায় বলল রানা, 'তোরা এখানে থাক্। আমরা সব নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে সোজা যাবি গ্যারাজে! কিন্তু বাধ্য না হলে ভুলেও নিচু করবি না ড্র-ব্রিজ।'

'আপনি কোথায় চলেছেন?' জানতে চাইল তানিয়া।

কাঁধে ঝুলন্ত তূণ থেকে তীর নিল রানা। 'টাওয়ারে। পাল্টা হামলা করব ওপর থেকে।'

রানা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই সোহেলের পাশে গেলেন বিজ্ঞানী শিমেযু, হাতে দুই বাক্স অ্যামিউনিশন। নিচু হয়ে বসে আছে সবাই। চারপাশের দেয়ালে বিঁধছে রাশ রাশ গুলি।

শিমেযুর কাছ থেকে নিয়ে গুলির বাক্স খুলে খুশি হয়ে উঠল সোহেল। অস্ত্র প্রাচীন হলেও বুলেট আধুনিক।

'এই জিনিস কোত্থেকে পেলেন?'

'আমাদের সঙ্গে আছেন বয়স্ক এক গানস্মিথ।'

'আশা করি ভাল জিনিসই তৈরি করেছেন।' বাক্স থেকে শেল নিয়ে হপারে রাখল সোহেল। ক্র্যাঙ্ক ধরে নিচু করে নিল গ্যাটলিং গানের নল। মসৃণভাবে ঘুরছে ক্র্যাঙ্ক, ঘুরিয়ে নিল ছয় ব্যারেল। চেম্বারে ঢুকেছে বুলেট। ব্যারেলগুলো খানিকটা ঘুরতেই রাতের আঁধার লক্ষ্য করে গেল এক রাশ বুলেট। ঠিকভাবে ঘুরছে অস্ত্রের নল। তবে চট্ করে বেশি অ্যামিউনিশন খরচ করা হবে অনুচিত।

'নল আরও নিচু করুন,' বললেন শিমেযু।

অস্ত্রের নল নিচে নামিয়ে নিল সোহেল। জানালা দিয়ে আবারও পাঠাল গুলি। তাতে নীলচে ধোঁয়ায় ভরে গেল পুরো ঘর।

ছুটতে ছুটতে প্যারাপিটের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেছে রানা, এমনসময় পেছনের ঘর থেকে শুনল গ্যাটলিং গানের গুলির আওয়াজ। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও। জানালা দিয়ে ভকভক করে বেরোচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। নিচের লেকে একটা স্পিডবোটের বো-র কাছে পানিতে নাক গুঁজছে সারি সারি বুলেট।

বোট ঘুরিয়ে আঁধারে পালিয়ে গেল ড্রাইভার। একইসময়ে আঁধার থেকে এল আরেক স্পিডবোট। ওটার বো-তে বসে আছে এক লোক। কাঁচওয়ালা ছাতের ঘর লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল সে। গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গী।

দুর্গের ঘরে এক পশলা গুলি ঢুকতেই থামল গ্যাটলিং গান। নিশ্চয়ই বাধ্য হয়ে কাভার নিয়েছে সোহেল। এদিকে সুযোগ পেয়ে উঠে দেয়ালের ওপর দিয়ে ক্রসবো তাক করে

ট্রিগার টিপে দিল রানা।

পুরনো অস্ত্রের দুই ডানা ঝটকা খেতেই সাঁই করে বেরোল তীর। তবে বয়স হয়েছে বলে মুচড়ে গেছে ওটার পেছনের পালক। লক্ষ্য থেকে সরে গেল তীর। লোকটার বুকে না লেগে বিঁধল উরুর মাংসে।

হাত থেকে গ্রেনেড ফেলে হাউমাউ করে উঠল লোকটা। নিচু হলো বোমা তুলে নিতে। কিন্তু তার উরু আর বোটের ফাইবারগ্লাস দুটোকেই গেঁথে ফেলেছে তীর। করুণ সুরে কী যেন বলতে শুরু করেও থেমে গেল লোকটা। তখনই বিস্ফোরিত হলো বোট। চারদিকে ছিটকে গেল কমলা আগুনের হলকা।

কিন্তু অন্য বোটের লোক দেখে ফেলেছে রানাকে। ওর দিকে এল গুলি। পুরু দেয়ালের এদিকে বসে পড়ল রানা। মাথার ওপর দিয়ে পেছনের দেয়ালে লেগে নানাদিকে যাচ্ছে বুলেট। 'একটা বোট গেল, আরও তিনটা,' বিড়বিড় করল রানা।

বাধ্য হয়ে মেঝেতে শুয়ে কাভার নিয়েছে সোহেল। হঠাৎ শুনল বাইরে বিস্ফোরণের আওয়াজ। ক্রল করে জানালার পাশে পৌঁছে উঁকি দিল বাইরে।

তুমুল বেগে আসছে-যাচ্ছে কয়েকটা স্পিডবোট। সুযোগ পেলেই গুলি করছে দুর্গ লক্ষ্য করে।

লক্ষ্যভেদ করতে গ্যাটলিং গানের কাছে ফিরল সোহেল। কিন্তু পুরনো অস্ত্র এতই ভারী, দ্রুতগামী বোট অনুসরণ করা কঠিন। কয়েক পশলা গুলি পাঠিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে আরেকদিকে অস্ত্রটা সরাল ও। নতুন করে গুলি পাঠাল শত্রু বোট লক্ষ্য করে। গুলি ফুরাতেই দ্বিতীয় অ্যামিউনিশনের বাক্সের দিকে হাত বাড়াল, আর তখনই দেখল শেষ শত্রু স্পিডবোট।

'ওরা কি চলে যাচ্ছে?' জানতে চাইলেন শিমেযু।

'না, যাচ্ছে দ্বীপের অন্যদিকে,' জানাল সোহেল।

ক'সেকেণ্ড পর আবারও এল গুলির আওয়াজ। এবারে হামলা হয়েছে দুর্গের আরেক দিকে।

'ভাল হয় পুলিশে ফোন করলে,' বলল সোহেল।

'কিন্তু আমাদের তো ফোন নেই,' বললেন শিমেযু।

'তা হলে রেডিয়ো ব্যবহার করুন।'

হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো এক শর্টওয়েভ রেডিয়োর কাছে গেলেন জাপানি বিজ্ঞানী। টোকা দিলেন মাইক্রোফোনে, তারপর সুইচ টিপে চ্যানেল বদলে রেডিয়ো করলেন জাপানিয ইমার্জেন্সি সার্ভিস এজেন্সিতে।

'সিক্স বলছি... কবুতর... থ্রি... এক্সরে... এক্সরে... ওয়ান,' তাঁর রেডিয়োর লাইসেন্স কোড বলছেন শিমেযু। 'আমাদের সাহায্য দরকার। দয়া করে পুলিশ ফোর্স পাঠান। সশস্ত্র লোক হামলা করেছে। আবারও বলছি, একদল সশস্ত্র লোক হামলা করেছে আমাদের ওপর...'

ওদিক থেকে জবাব দিল না কেউ।

স্ট্যাটিকের আওয়াজও নেই।

'যাহ্, ভেঙে পড়েছে অ্যান্টেনা,' বললেন শিমেযু। আঙুল তাক করলেন ভাঙা জানালার দিকে। 'ওটা ওদিকে।'

'যোগাযোগের চেষ্টা করুন,' বলল সোহেল। 'আমরা বেশিক্ষণ ওদেরকে ঠেকাতে পারব না।'

ওর কথা ঠিক তা প্রমাণ করতেই বাইরের দেয়ালের এদিকে খটাং শব্দে পড়ল একটা গ্র্যাপলিং হুক। গ্যাটলিং গানের নল ঘুরিয়ে অপেক্ষা করল সোহেল। নড়ছে চকচকে হুক। কয়েক সেকেণ্ড পর দেয়ালে উঠে এল এক লোক। কুঁজো হয়ে বসে পড়ল হুকের পাশে। উঠে এল দ্বিতীয় লোকটাও। নল সামান্য ওপরে তুলে সামনে ক্র্যাঙ্ক ঠেলল সোহেল। কিন্তু আধ ইঞ্চি নড়েই জ্যাম হয়ে গেল অস্ত্রটা।

ক্র্যাঙ্ক সামনে ও পেছনে নেয়ার চেষ্টায় কোনও লাভ হলো না। প্রাচীন অস্ত্রের জ্যাম কীভাবে সারাতে হয়, জানা নেই সোহেলের।

এদিকে দেয়ালে উঠেছে আরও দুই আততায়ী।

'এবার সরে যেতে হবে,' বলল সোহেল, 'যে-কোনও সময়ে তেড়ে আসবে ওরা।'

শুকনো পরিখা পেরিয়ে দুর্গের মূল ইমারতে ঢুকে পড়েছে রানা। একটু দূরে পেল সিঁড়ি। দৌড় শুরু করে একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে এল প্যাগোডার তিনতলায়। গাঢ় ছায়া থেকে বেরোতেই, ঝিলিক তুলে ওর মাথা লক্ষ্য করে নামল তলোয়ার। একেবারে শেষসময়ে বসে পড়ল রানা। খটাং শব্দে ওর পেছনের দেয়ালে লেগে কাঠের চাপড়া উপড়ে নিল ধারালো ফলা। পরের সেকেণ্ডে উঠেই সামনে বাড়ল রানা। শত্রুর ওপর চালাল ব্যাটারিং র‍্যামের মত করে ক্রসবোটা। নিজেও মুখোমুখি ধাক্কা খেল লোকটার সঙ্গে। চট্ করে চিনল, লোক নয়, হামলা করেছে হিনা। ল্যাং মেরে মেয়েটাকে মেঝেতে ফেলল রানা। শক্ত হাতে ধরেছে দুই কবজি।

'মিস্টার রানা...' বিস্মিত সুরে বলল হিনা।

'কোন্ পক্ষের লোক আসছে জেনে তারপর তলোয়ার চালাবে,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা।

'সরি,' লজ্জা পেল মেয়েটা। 'ভেবেছি আপনি শত্রুদের লোক।'

রানা ছেড়ে দিতেই উঠে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। মেঝে থেকে নিয়ে দু'হাতে ধরেছে তলোয়ার। এখন পরনে ঝুলন্ত ধাতব প্লেটের তৈরি বর্ম।

'লড়াইয়ের জন্যে পাল্টে নিয়েছ পোশাক,' মন্তব্য করল রানা।

'আমিই তৈরি করি দুর্গের সব অস্ত্র, মেরামতও করি,' বলল হিনা। 'আমার দায়িত্ব প্রভু শিমেযুকে রক্ষা করা।'

মেয়েটা পাশ কাটাতে গেল, কিন্তু ডানবাহু ধরে ফেলল রানা। 'শিমেযুর সঙ্গে আছে আমার বন্ধুরা। ওরাই সরিয়ে নেবে ওঁকে। তুমি আমাকে নিয়ে চলো টাওয়ারে। ওপর থেকে পাহারা না দিলে লেকের দিকের দেয়াল টপকে উঠবে শত্রুরা।'

'চলুন।' ঘুরেই রওনা হলো হিনা। ডানদিকের এক দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পিছু নিল রানা। অবাক হয়েছে ভারী বর্ম নিয়ে মেয়েটাকে অনায়াসে চলতে দেখে।

সিঁড়ি শেষে ওরা বেরিয়ে এল একটা প্ল্যাটফর্মে। ওটাই টাওয়ারের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। মেঝেতে বসে আছে ছোট একটা কামান। পাশেই ব্যাগ ভরা বারুদ আর লোহার ছোট গোলা দিয়ে তৈরি পিরামিড। গোলা ছুঁড়তে চাইলেও সুবিধা হবে না, বুঝে গেল রানা। ওটা অনেক বেশি ভারী। সরিয়ে তাক করা প্রায় অসম্ভব। কামান বাদ দিয়ে ক্রসবো হাতে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও।

এত ওপর থেকে পরিষ্কার দেখল দুর্গের আশপাশের বেশিরভাগ জমি। নিচের পরিস্থিতি সুবিধের নয়। 'ওরা দেয়াল টপকে ঢুকে পড়েছে,' বলল রানা। 'তিন দিকে তিনটা দল। সরাসরি দুর্গের দিকে আসছে একটা দল।'

তীর মেরে দলনেতার উরু গেঁথে ফেলল রানা। হোঁচট খেয়ে পড়ল লোকটা। ক্রসবো মেঝেতে রেখে ওটা রিলোড করল রানা। এদিকে সাধারণ এক তীরধনুক জোগাড় করেছে হিনা। তীর ছুঁড়ল সে। বুকে তীক্ষ্ণ ফলা গাঁথতেই মেঝেতে পড়ল দলের দ্বিতীয় লোকটা। মেয়েটার দ্বিতীয় তীর ফুটো করল এক শত্রুর বাহু। হাত থেকে পড়ে গেছে তার অস্ত্র, গাছের আড়ালে কাভার নিল সে। চতুর্থ লোকটা পিছিয়ে গেল দেয়ালের আরেক পাশে। হিনার তৃতীয় তীর লাগল দেয়ালে। খটাং শব্দে ছিটকে পড়ল বাগানে। আপাতত এগোবার সাহস

হারিয়ে ফেলেছে শত্রুরা।

'আমার জন্যেও কয়েকটা তীর রেখো,' ঠাট্টার সুরে বলল রানা।

হাসল না হিনা। 'শত্রু এখনও সংখ্যায় বেশি।'

ওর কথা ঠিক তা প্রমাণ করতেই যেন গর্জে উঠল অ্যাসল্ট রাইফেল। রানা ও হিনার মাথার ওপরের কাঠের তক্তায় লাগল একরাশ গুলি। নানাদিকে ছিটকে গেল কাঠের কুচি। ঠক্-ঠক্ করে লাগছে লোহার গোলার গায়ে। মেঝেতে শুয়ে কাভার নিল রানা ও হিনা। যেদিক থেকে গুলি এসেছে, তার উল্টো দিকে সরল ওরা।

রেলিঙের দিকে ক্রল করল রানা। 'আমরা আটকা পড়েছি ক্রস ফায়ারে।' কয়েক সেকেণ্ড পর খুব সাবধানে উঁকি দিল রেলিঙের ওদিকে। 'লেকের দেয়ালের ওদিকে কাভার নিয়েছে ওরা। হয়তো কাজে আসবে তোমার গুরুর কামান।'

কিছু করা বা বলার আগেই ওরা শুনল চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। ছাতের দূরে ভুস করে আকাশে উঠল লালচে আগুন আর কালো ধোঁয়া।

'মলোটভ ককটেল,' বলল হিনা।

'অয়েস্টার আর ক্যাভিয়ার ছাড়াই,' বলল রানা, 'অসভ্য লোক এরা।'

নিচে আগুনের কমলা জিভ লকলক করে চাটছে প্রাচীন কাঠের দুর্গের শুকনো দেয়াল। সাপের মত হিস্-হিস শব্দে টাওয়ারের দিকে উঠছে অসংখ্য শিখা। ভুস-ভুস করে চারপাশ ঢেকে দিল কালো ধোঁয়া। এবার পিছু নিয়ে আসবে লেলিহান আগুন।

'এখান থেকে সরে যেতে হবে,' বলল রানা।

'আপনি না বলেছিলেন ওপর থেকে হামলা করবেন?' জানতে চাইল হিনা।

'তখন এই টাওয়ার জ্বলন্ত চুলা ছিল না।' মেয়েটার হাত

ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা। কিন্তু শেষ ধাপ পেরিয়ে টের পেল, সামনের দরজা এখন বন্ধ। কাঁধ দিয়ে ঠেলল রানা, কিন্তু নড়ল না পুরু কাঠের কবাট।

দরজার ওপরে ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকাল হিনা। 'ভারী কিছু দিয়ে আটকে রেখেছে।'

পিছিয়ে গেল রানা, এবার দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে দরজার ওপর, এমনসময় তক্তা ফুটো করে ওদিক থেকে এল এক পশলা গুলি!

সিঁড়ির পাশে সেঁটে গেল রানা। কিন্তু বুকে দুটো গুলি নিয়ে পিছিয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল হিনা।

ছুটে গিয়ে ছোট জানালা দিয়ে ক্রসবো বের করল রানা। তাক করেই টিপে দিল ট্রিগার।

দরজার দশ ফুট দূরে বাচ্চা কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল কেউ। ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাঁচের কিছু। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো মলোটভ ককটেল। জানালা দিয়ে রানা দেখল, আগুন ধরেছে বাইরের ঘরে। পুড়ছে প্রাচীন আমলের সুন্দর ট্যাপেস্ট্রি আর পুরনো আসবাবপত্র।

আবারও গুলিবর্ষণ হবে ভেবে ক্রল করে হিনার পাশে গেল রানা। কাত হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। দু'হাতে চেপে ধরেছে বুক ও পেট। রানা খেয়াল করল, কোথাও নেই রক্ত। হিনার প্রাচীন ধাতব প্লেটিঙের নিচে কেভলার ভেস্ট!

'কেভলার ভেস্ট পরেও ওই লোহা-লক্কড় কেন?' জানতে চাইল রানা। 'নিচের টেকনোলজি তো মন্দ নয়।'

ব্যথা চেপে ফিক করে হেসে ফেলল হিনা। 'এখান থেকে বেরোতে হবে। কেভলার ভেস্ট তো আর ধোঁয়া থেকে বাঁচাবে না।'

'উঠে দাঁড়াতে পারবে?'

'বোধহয়,' উঠেই ব্যথায় প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল হিনা। কাশতে লাগল খকখক করে।

ফুসফুস জ্বলছে রানার। বাঁচতে চাইলে বেরোতে হবে এখান থেকে। আবারও সিঁড়ির দিকে তাকাল। তারপর বড় করে দম নিয়ে ছুট দিল ভারী ধোঁয়ার মাঝে।

এগারো

'জলদি আসুন,' তাড়া দিলেন জাপানি বিজ্ঞানী শিমেযু। 'চলুন!' খুব নার্ভাস হয়ে গেছেন তিনি।

দুর্গের অচেনা অংশে পৌঁছে বলল সোহেল, 'আমরা এদিক দিয়ে আসিনি।'

ওর পেছনে ছুটছে আসিফ ও তানিয়া।

'এটা শর্টকাট,' বললেন শিমেযু, 'লুকিয়ে পড়ব। চাইলেও আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।'

কাঠের এক দরজার সামনে থামলেন তিনি। কোমর হাতড়ে পুরনো আমলের তামার চাবি নিয়ে খুললেন তালা। বাইরে দরজা মেলতে যাওয়ায় বুঝলেন, ওদিকের মেঝেতে আছে ভারী কিছু। কবাটের সরু ফাঁক পেরিয়ে ওরা দেখল, এটা বৃত্তাকার বড় একটা ঘর। দরজার কাছে পড়ে আছে লাশ। মৃতদেহের পাশে বসলেন শিমেযু। বিড়বিড় করে বললেন, 'মাসাকাজু। প্রিয় অনুসারী। বাপ-মার অত্যাচারে আমার কাছে চলে এসেছিল।'

ঝুঁকে পাল্‌স্ দেখল সোহেল। নেই। কাছ থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করা হয়েছে মাসাকাজুকে। নিচু গলায় বলল ও, 'মারা গেছে। তার মানে, দুর্গে ঢুকে পড়েছে শত্রুরা।'

মাথা দোলালেন শিমেযু। 'প্রশ্ন হচ্ছে: তারা কতজন আর কোথায় আছে।'

রক্তের ফোঁটা গেছে দূরের দরজার কাছে।

'ওদিকে না যাওয়াই ভাল,' বলল তানিয়া।

বাইরে বাড়ল গুলির আওয়াজ। নাকে এল পোড়া কাঠের কড়া গন্ধ।

'যে-পথে এসেছি, সেদিকে ফিরতে পারব না,' বলল আসিফ।

বৃত্তাকার ঘরের তৃতীয় দরজাটা সরাসরি সামনে। ওদিক দিয়ে না বেরোলে পেঁচানো এক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে ছোট এক দরজার কাছে।

দৌড়ে গিয়ে তৃতীয় দরজার হ্যাণ্ডেলে মোচড় মেরে নিজের দিকে টান দিলেন শিমেযু।

'একমিনিট!' মানা করতে চাইল সোহেল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

টান দিয়ে দরজা খুলেছেন জাপানি বিজ্ঞানী। তাজা অক্সিজেন পেয়ে ওদিকের ঘর থেকে ছিটকে এল গনগনে আগুনের হলদে হলকা ও কুচকুচে কালো ধোঁয়া— ঘিরে ফেলল মানুষটাকে। শকওয়েভের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন তিনি বৃত্তাকার ঘরের মাঝে। ভাঙা পুতুলের মত পড়ে রইলেন। আগুনে পুড়ছে কাপড়চোপড়।

দৌড়ে তাঁর পাশে গেল সোহেল। খুলেছে নিজের কোট। ওটা দিয়ে চাপড়ে নেভাতে চাইল ধিকিধিকি আগুন। ওকে সাহায্য করতে চাইছে তানিয়া। সামনে বেড়ে ওদিকের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল আসিফ। তাতে ওদিকের ঘরে আটকা পড়ল আগুন ও ধোঁয়া।

'পুড়ে গেছে মুখটা,' বলল তানিয়া, 'দু'হাতের অবস্থাও খুব খারাপ। তবে মনে হয় বেশিরভাগ শিখা গেছে পোশাকের ওপর দিয়ে।'

একবার গুঙিয়ে উঠে নীরব হয়ে গেলেন শিমেযু।

'মেঝেতে পড়ার সময় জোরে ঠুকে গেছে মাথা,' বলল সোহেল, 'জ্ঞান নেই, মেডিকেল সাহায্য দরকার।' রোবটিক হাত ও ডানহাত ব্যবহার করে শিমেযুকে কাঁধে তুলল ও। দ্বিতীয়তলার দরজা দেখাল। 'ওখানে উঠলে হয়তো বেরোবার পথ পাব।'

'বাইরে শত্রুরা,' পুরু লাঠি শক্ত হাতে ধরল তানিয়া।

'বেরোবার চেষ্টা না করে উপায় নেই,' বলল সোহেল, 'আগুন ভরা দুর্গে আটকা পড়েছি অসহায় ইঁদুরের মত। আমাদের মধ্যে একমাত্র শিমেযু জানতেন কোথায় যাওয়া উচিত।' তাড়া দিল ও, 'আসিফ, তানিয়া, সামনে যা। আমি পেছনে থাকব বিজ্ঞানীকে নিয়ে।'

প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে উঠল আসিফ। ওর পেছনে তানিয়া। দরজা খোলার আগে ওরা দেখল, ওদিক থেকে আগুনের তাপ আসছে কি না। কবাট খুলে ঢুকে পড়ল পরের ঘরে। শিমেযুকে কাঁধে নিয়ে অনুসরণ করল সোহেল। দরজা পেরোবার সময় খুব সতর্ক থাকল, যাতে চোট না পান অচেতন মানুষটা।

ওদিকের দরজা খুলে হতবাক হয়েছে আসিফ ও তানিয়া। কমলা আগুনে দাউদাউ জ্বলছে পুরো চারতলা কারুকার্যময় প্যাগোডা দুর্গ।

'আশা করি মাসুদ ভাই টাওয়ারে এখন নেই,' শুকনো গলায় বলল তানিয়া।

'নিশ্চয়ই সরে গেছে,' বলল আসিফ।

'এগোতে শুরু কর, লেকের তীরে যাব,' তাড়া দিল সোহেল।

ছোট্ট সেতু পেরিয়ে বাইরের দেয়াল লক্ষ্য করে চলল ওরা। কিছুটা যেতেই পেছনে খুলে গেল দুর্গের এক দরজা। ওখান থেকে দৌড়ে এল দুই লোক।

'এদিকেই আসছে,' বলল আসিফ। 'যদি দেখে ফেলে,

খুন হব।’

‘না দেখে ওদের উপায় নেই,’ বলল সোহেল, ‘শিমেযুকে কাঁধে নে। লুকিয়ে পড় কোথাও। ওদেরকে ব্যস্ত রাখব আমি।’

বর্শা ফেলে দেয়ালে শরীর ঠেকিয়ে নিচু হলো আসিফ। সোহেলের কাছ থেকে নিজ কাঁধে নিল আহত বিজ্ঞানীকে। তানিয়ার পিছু নিয়ে লেকের দিকে নামতে লাগল আসিফ।

ওরা চোখের আড়াল হতেই বর্শাটা নিল সোহেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিশে গেল অন্ধকারে। আয়, শালারা!

ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে সেতুর দিকে ছুটে আসছে দুই আততায়ী। আগুন থেকে বাঁচতে হবে! তবে সোহেল, আসিফ, তানিয়া বা শিমেযুকে দেখলে দ্বিধা করবে না গুলি করতে। মরতে আপত্তি আছে সোহেলের। ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে অন্ধকারে। লোকদুটো নাকের কাছে পৌঁছে যেতেই উঠে দাঁড়াল ও, বর্শা ঘুরিয়ে লাঠির মত করে সাঁই করে মারল প্রথম লোকটার পেটে। মারাত্মক ব্যথায় দু'ভাজ হলো আততায়ী। এদিকে দ্বিতীয় লোকটা পিস্তল তুলেই তাক করল সোহেলের বুকে। কিন্তু বর্শার ডগা ঠাস্ করে নামল তার কবজির ওপর।

পাথরে পড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল পিস্তল। বিকট ‘বুম্!’ শব্দে গুলি বেরোলেও লাগল না কারও গায়ে। দ্বিতীয় লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলতে চাইল সোহেল। কিন্তু ওকে জড়িয়ে ধরল আততায়ী। সোজা পাশের নিচু দেয়াল টপকে শুকনো, গভীর পরিখায় গিয়ে পড়ল ওরা।

ওই খাদেই পেটে রাজ্যের খিদে নিয়ে অপেক্ষা করছে বেশ ক'টা কমোডো ড্রাগন!

বিজ্ঞানী শিমেযুর ছোট্ট কামান দু'হাতে তুলে সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা। কালো ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ, দেখছে না প্রায় কিছুই। মেঝেতে নেমে আরেকটু হলে হিনার শরীরে পা বেধে আছাড় খেত। পড়ে আছে মেয়েটা। দরজার নিচের ফাঁক

ও জানালা দিয়ে ঢুকছে তাজা হাওয়া, বেরিয়ে যাচ্ছে সিঁড়িঘরের দরজা দিয়ে। এ কারণেই এখনও বেঁচে আছে ওরা।

মেঝেতে কামান রেখে বসল রানা। ওর দিকে ক্রল করে এল হিনা। রানাকে সাহায্য করল কামান ঠিক দিকে তাক করতে। দ্রুত হাতে আট পাউণ্ডের নিরেট স্টিলের ভারী কামানে বারুদ ও গোলা ভরল ওরা। কামানে নেই লিন্সটক বা লাইটার। আগেই সিঁড়িতে এক টুকরো কাগজ পেয়েছে রানা, ওপর থেকে নেমে আসা আগুনে ওটা ধরিয়ে নিল। কাগজ দিয়ে জ্বেলে দিল ফিউয। পেরোল কয়েক সেকেণ্ড, ঘটল না কিছুই। তারপর চিড়বিড় শব্দে জ্বলল ফিউয, পরের সেকেণ্ডে দরজা ফাটিয়ে বেরিয়ে গেল আট পাউণ্ডের গোলা।

'কাজের জিনিস এই কামান,' বিড়বিড় করল রানা। এবড়োখেবড়ো কাঠের টুকরো সরিয়ে ক্রল করে বেরোল পরের ঘরে। টপকে গেল একগাদা আসবাবপত্র। ওগুলো দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল দরজা। 'কোন্ দিকে গ্যারাজ?'

'চলুন,' পথ দেখাল হিনা। পাঁজরের ব্যথা সহ্য করে হাঁটছে। পৌঁছে গেল গ্যারাজে। ওখানে ওরা পেল শিমেযুর সাতজন শিষ্যকে। তবে আশপাশে নেই শিমেযু, সোহেল, আসিফ বা তানিয়া।

'গুরু আর অন্যরা এখানে নেই?' জানতে চাইল হিনা।

মাথা নাড়ল এক শিষ্য।

'তা হলে আবারও ফিরব,' বলল হিনা। ঘুরে দাঁড়াতেই ওর বাহু ধরল রানা। গ্যারাজের ভেতর ভকভক করে ঢুকছে কালো ধোঁয়া।

'ওপরতলায় আর যেতে পারবে না,' বলল রানা, 'চিন্তা কোরো না। মাস্টার শিমেযুর সঙ্গে সোহেল আছে। ও সরিয়ে নেবে তাঁকে।'

হাত ছাড়িয়ে দলের অন্যদের দিকে ঘুরল হিনা।

'ওদের বলো গাড়িতে উঠতে,' বলল রানা। 'দুর্গ ধসে পড়ার আগেই বেরোতে হবে।'

আঞ্চলিক জাপানি ভাষায় নির্দেশ দিল হিনা। সে-ই দলের নেত্রী। এবার বলল, 'নামিয়ে দেব ড্র-ব্রিজ।' ছুটে দেয়ালের কাছে গেল সে। একপাশে সরাল একটা লিভার, তারপর নিচু করল ওটা।

নেমে গেল ড্র-ব্রিজ। ধুম্ করে আটকে গেল জায়গায়। আগুন ধরেছে গ্যারাজে, একটু পর জায়গাটা হবে নরক।

আট ফুট ওপর থেকে পরিখার বালিতে পড়ে আলাদা হয়েছে সোহেল ও আততায়ী। কারও দেরি হলো না উঠে দাঁড়াতে। প্রাণের ভয়ে ভুলে গেছে লড়াইয়ের কথা। দু'জনেরই চোখ খুঁজছে কমোডো ড্রাগন।

একদিক থেকে এল অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো সরীসৃপ। তৃতীয়টা অপেক্ষা করছে আগের জায়গায়। আর সবচেয়ে বড়টা ধীর পা ফেলে আসছে উল্টোদিক থেকে।

আগে যেসব কমোডো ড্রাগন দেখেছে, সেগুলোর চেয়ে এগুলোকে অনেক বেশি বিরক্ত ও আক্রমণাত্মক বলে মনে হলো সোহেলের। আগুন, ধোঁয়া, ছাই আর তার ওপর প্রায় ঘাড়ের ওপর বাজে দুটো প্রাণী নামতেই মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে তাদের।

ছোটদুটোর একটা সরাসরি এল সোহেলের দিকে। ওটাকে ভয় দেখাতে পুরো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, দেবতার স্টাইলে দু'হাত আকাশে তুলল সোহেল।

বিচ্ছিরি জন্তুটা হঠাৎ করে নড়েছে বলে চিন্তায় পড়েছে কমোডো ড্রাগন। বেঁটে পাগুলো ভাঁজ করে প্রায় শুয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও এগোল। এখন আর মোটেও ভয় পাচ্ছে না সোহেলকে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আততায়ী, ধমকের সুরে তার

কাছে জানতে চাইল সোহেল, 'কী রে, শালার শালা, তোর পিস্তল কই?'

কড়া চোখে ওকে দেখল জাপানি লোকটা। বাংলা ভাষা না বুঝলেও বক্তব্য ভালই বুঝেছে, যেভাবে হোক বাঁচতে হবে। তার দিকে না চেয়ে বালি থেকে একমুঠো নুড়িপাথর তুলে ড্রাগনের নাক-মুখে ছুঁড়ল সোহেল। একটু দূরে বর্শাটা দেখে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিল ওটা। ঘুরেই দু'হাতে বর্শা বাগিয়ে খোঁচা দিতে চাইল ছোটমিয়ার নাকে।

ভয় পেয়ে হিসহিস শব্দে সরে গেল কুমিরের সম্মুন্ধি।

এদিকে হঠাৎ খরগোসের গতি তুলে কাছের দেয়াল লক্ষ্য করে ছুট দিল সোহেলের সঙ্গের লোকটা। বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'ওউপ্স্, ওয়াতাশিনোচিচি!' অর্থাৎ: ওরে, বাপরে বাপ!

তাকে দৌড়াতে দেখে আচমকা খেপে গেল পরিখার বড় মিয়াসাহেব। দৈর্ঘ্য দশ কি বারো ফুট, ওজন কমপক্ষে তিন শ' পাউণ্ড। অবিশ্বাস্য গতি তুলে তেড়ে গেল লোকটার দিকে।

একবারও ঘুরে তাকাল না আততায়ী, দৌড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে ধরল দেয়ালের ওপরের কিনারা। পেছন পেছন ছুটে গেল কমোডো ড্রাগন। পেছন পায়ে ভর দিতেই পেয়ে গেল শিকারকে নাগালে। লোকটার কাঁধ ও বাহুতে বসাল বড় বড় হলুদ দাঁত। ছিঁড়ে গেল শার্ট, সঙ্গে এল ছোট এক চাকা মাংস। ছেঁড়া কাপড় ও মাংস নিয়ে ধপ করে পরিখার মেঝেতে পড়ল কমোডো ড্রাগন। খুবই হতাশ। আরেকটু হলেই পেতে যাচ্ছিল দারুণ ডিনার।

হাঁচড়েপাছড়ে দেয়ালে উঠল আততায়ী।

তার কাঁধে রঙিন উল্কি দেখল সোহেল। এভাবে লাফিয়ে দেয়ালে লোকটাকে উঠতে দেখে রীতিমত শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর মনে। তখনই চিন্তা এল মনে: এবার? দুনিয়ার সবচেয়ে হিংস্র চারটে জন্তুর সঙ্গে রয়ে গেছি খাদের ভেতর!

ফিসফিস করল সোহেল, 'কোন্ কুক্ষণে বলেছি: ওগুলো কীভাবে খায় দেখতে পেলে বেশ হতো!'

ওর দিকেই আসছে চার কমোডো ড্রাগন।

হয়তো বর্শা দিয়ে অন্যগুলোকে ঠেকাতে পারবে, কিন্তু বড়টা কামড়ে ভাঙবে বর্শা। বা দাঁত খিঁচিয়ে কেড়ে নেবে। আর তারপর ওকে খাওয়ার পর টুথপিকের মত ব্যবহার করবে দাঁত পরিষ্কার করতে!

না, এ হতে দেয়া যায় না!

দানবটাকে পাশ কাটিয়ে ঝেড়ে দৌড় দেবে, ভাবল সোহেল। কিন্তু ওকে সরতে দেখে পথ আটকে দিল বড়মিয়া।

তখনই বজ্রপাতের মত বিকট এক আওয়াজে চমকে গেল সোহেল ও চার ড্রাগন। পরিখায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল জ্বলন্ত প্যাগোডার একাংশ। চারদিকে ছিটকে গেল আগুনের ফুলকি। ভয় পেয়ে সরসর করে ক' গজ পিছিয়ে গেছে চার কমোডো ড্রাগন।

'আগুন অপছন্দ,' বিড়বিড় করে আগুনের দিকে এগোল সোহেল। গা থেকে কোট খুলে ওটা দিয়ে সাবধানে ধরল লম্বা একটা জ্বলন্ত কাঠ। এখন একহাতে বর্শা, আরেক হাতে জ্বলন্ত মশাল। জন্তুগুলোর দিকে এগোতে শুরু করে কাছের ড্রাগনটার দিকে আগুনে কাঠ ঠেলে ধমকে উঠল সোহেল, 'পিছিয়ে যা বলছি!'

মোটা, বেঁটে পা দিয়ে চাপড় মেরে জ্বলন্ত কাঠ সরাতে চাইল জন্তুটা। তবে চামড়ায় তাপ লাগতেই সরে গেল। ওটার মতই পিছু হঠল অন্য দুই ছোট ড্রাগন। কিন্তু জায়গা ছাড়তে আপত্তি আছে বড়মিয়ার।

'হয় এখন, নইলে কখনও নয়,' বিড়বিড় করল সোহেল। পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড় দিল জন্তুটার দিকে। ওটার মুখ লক্ষ্য করে তাক করেছে জ্বলন্ত কাঠ।

অনায়াসেই নাক দিয়ে ঠেলে আগুন ধরা কাঠ সরিয়ে দিল

জন্তুটা। ক্ষণিকের জন্যে সরে গেছে মনোযোগ, এটাই চেয়েছে সোহেল। দৌড়ের মধ্যেই সামনের বালিতে বর্শা গাঁথল ও, পোল ভল্টের ভঙ্গিতে শূন্যে ভেসে পেরোল বড় ড্রাগনটাকে। পা বালিতে পড়তেই উড়ে চলল ও দেয়াল লক্ষ্য করে।

ওপরে ছোঁ দিয়েও উড়ন্ত খাবার মুখে পায়নি বড়মিয়া। চার পা নিয়ে ধপ্ করে বালিতে পড়ল ওটা। ঝট্ করে ঘুরে গেল টিকটিকির মত। ধাওয়া করবে কি না বুঝছে না।

ততক্ষণে লাফিয়ে সিমেন্টের দেয়ালের কিনারা দু'হাতে ধরেছে সোহেল। শরীর টেনে উঠে পড়ল ওপরে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল পরিখার ভেতর।

নিচে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে রাগী চোখে ওকে দেখছে চার কমোডো ড্রাগন। একবার হাত নেড়ে টাটা দিয়েই লেকের দিকে ছুট দিল সোহেল। ওদিকেই পাথরের স্তূপের আড়ালে বিজ্ঞানী শিমেযুকে নিয়ে লুকিয়ে আছে আসিফ। আশপাশে দেখা গেল না আহত আততায়ীকে। লেকে তুমুল গতি তুলে আঁধারে হারিয়ে গেল কয়েকটা স্পিডবোট।

সোহেল বাইরের দেয়ালের কাছে যেতেই পাথর স্তূপের পেছন থেকে বেরিয়ে এল আসিফ। 'চলে যাচ্ছে।'

'জানা দরকার এরা কারা, এবং কেন এসেছিল,' বলল তানিয়া।

'যে কাজে এসেছে, শেষ করে গেছে,' বলল সোহেল। 'পুড়িয়ে আহত করেছে বিজ্ঞানীকে। নষ্ট হয়েছে তার যন্ত্র-পাতি। ছাই হচ্ছে দুর্গ। কোনও রেকর্ড বা ডেটা পাব না। সব ছিল কাগজে।'

'সব নষ্ট হয়নি,' বলল তানিয়া।

ঘুরে ওকে দেখল সোহেল।

লাঠিতে মুড়িয়ে রাখা একটা কাগজ খুলল তানিয়া। ওটা নীল ওই বড় মানচিত্রের অংশ। ছিঁড়ে এনেছে ফ্রেম থেকে। পরিষ্কার দেখা গেল লাল রঙের সব রেখা।

‘বিশেষ কেউ চাইছে আমরা যেন জানতে না পারি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে যি-ওয়েভ,’ বলল তানিয়া। ‘তাই মনে হলো এসব তথ্য আমাদের কাজে লাগবে।’

‘মানুষ খুন করবে, এতই জরুরি তথ্য?’ বিড়বিড় করল আসিফ।

‘খুন করেছে, নিজ চোখেই দেখলি,’ বলল সোহেল। একবার দেখল অচেতন বিজ্ঞানীকে। ‘এঁর কী হাল?’

‘কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে,’ বলল তানিয়া, ‘বোধহয় পুড়ে গেছে ফুসফুস। শ্বাস নেয়ায় বুকে ঢুকেছে আগুন।’

চুপ করে থাকল সোহেল ও আসিফ। শিমেযুকে বাঁচানো যাবে কি না, জানা নেই। মানুষটাকে নিতে হবে কোনও হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে।

‘একটা গাড়ি পেলে হতো,’ বলল আসিফ। ‘পুড়ে গেছে গ্যারাজ?’

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল সোহেল। জবাব দিতে হলো না ওকে। পুরো কাঠের দুর্গ এখন অঙ্গার। লাল-হলদে আগুনের পাহাড়ের চূড়া যেন। ‘বেশিক্ষণ লাগবে না, আগুন দেখে পৌঁছে যাবে সবাই।’

একমিনিট পর ওরা শুনল ইঞ্জিনের আওয়াজ। আঁধার চিরে আসছে বোট। তীরের কাছে গেল ওরা।

অন্ধকারে চোখ চালাল সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল, জল কেটে আসছে বোঁচা, থ্যাবড়া নাকের ভারী এক গাড়ি, শব্দটা ফোক্সভাগেনের এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের মত।

‘দ্য ডাক,’ জানাল সোহেল। ‘শিমেযুর কালেকশনে ছিল। অ্যামফিবিয়াস কার।’

হুইলে রানা। পাশে হিনা। পেছনে বিজ্ঞানীর ক’জন স্যাঙাৎ।

রানার মনোযোগ কাড়তে প্রাণপণে হাত নাড়তে লাগল সোহেল।

ধীরে ধীরে তীরের দিকে এল মন্থর গতি উভচর গাড়ি।
খুশি হয়ে হেসে ফেলল সোহেল, আসিফ ও তানিয়া।
এবার হাসপাতালে নিতে পারবে আহত বিজ্ঞানীকে।

বারো

ক্লান্তিকর রাত পার করে, ভোরে হাসপাতালে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেয়ার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে রানা, সোহেল, আসিফ ও তানিয়াকে। আপাতত হোটেলে ফিরতে পারে।

আগেই বুক ছিল রুম, শিনজুকু প্রিন্স হোটেলে ফিরে যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা। পাঁচ ঘণ্টা পর অ্যালার্মের ঘণ্টি জাগিয়ে দিতেই জড় হয়েছে রানার ঘরে।

ফোনে আলাপ করতে হবে নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। গতরাতে কী হয়েছে, রানার কাছে শুনে চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। চুপ করে আছেন।

রানা দিল নতুন তথ্য, 'এবার চাইনিযদের জলসীমা পেরোতে হবে। জানতে চাই গোপনে কী করছে ওরা।'

'সেটা অসম্ভব,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যামিলটন। 'তোমরা ধরা পড়লে নুমা আর আমেরিকান সরকারকে জালে জড়িয়ে নেবে চিন সরকার।'

'সাগরের উচ্চতা বাড়ছে, তদন্ত না করে উপায় নেই,' টেবিলে রাখা ফোনের স্পিকারের দিকে চেয়ে বলল রানা।

'কিন্তু তুমি যে লোকেশনের কথা বলছ, ওটা চাইনিয টেরিটোরিয়াল ওঅটার। ওরা বলে স্পেশাল অপারেশন্স যোন।

টেস্ট করে নেভাল্ এক্সপেরিমেন্ট। সর্বক্ষণ বোট নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এলাকা। চোখ রাখছে নেভির জাহাজ, সাবমেরিন ও এয়ারক্রাফ্ট্। ওদিকে আছে চালু রাখা সোনার বয়া। কাছাকাছি কেউ গেলেই ধরা পড়বে।'

'আপনি তা হলে নিষেধ করছেন।' সোহেল, আসিফ ও তানিয়াকে দেখে নিল রানা। শিমেযুর অ্যানালগ মেশিনের রিডিং পাওয়ার পর প্রত্যেকে চাইছে সাগরের ওই এলাকা ঘুরে দেখতে।

'স্যর, ডক্টর শিমেযুর থিয়োরি কিন্তু জিয়োলজিকালি ঠিক হতে পারে,' বলল আসিফ, 'নিশ্চয়ই কোনও উপায় আছে, যাতে চিনের পুব সাগরে যাওয়া যাবে?'

'সম্ভব নয়,' বললেন হ্যামিলটন। 'কয়েক বছর আগে আমাদের একটা বিমান গুলি করে ফেলে দিয়েছে ওরা। অথচ, টেকনিকালি ওটা ছিল আন্তর্জাতিক এয়ারস্পেসে।'

'শুনেছি কিছু দিন আগে প্রায় অদৃশ্য অ্যাটাক সাবমেরিন পেয়েছে আপনাদের নেভি,' বলল রানা।

'ওটা চেয়েছি আমরা,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবে রাজি হয়নি নেভি। ওদিকের সাগর অগভীর। তা ছাড়া, সাগরের নিচে আছে চিনাদের সফিসটিকেটেড লিসেনিং পোস্ট। আমেরিকান নেভিকে দোষ দিতে পারছি না।'

নেভির কাছে ওই অ্যাটাক সাবমেরিন চেয়েছেন নুমা চিফ, তথ্যটা হজম করে নরম সুরে বলল রানা, 'তা হলে অন্য উপায় খুঁজতে হবে।'

নীরব হয়ে গেছে ঘর।

সামান্য বিরতির পর বললেন হ্যামিল্টন, 'গত দু'বছরে চিনের পুব সাগরের ওই এলাকায় পানির নিচে নানান শব্দ ধরেছে নেভি আর নুমা। আর ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয়েছে ডক্টর শিমেযুর যি-ওয়েভ। দুই-এ দুই যোগ করলে বুঝতে দেরি হওয়ার কথা নয়, গোপনে ওখানে কিছু করছে চিনারা।'

‘কী ধরনের আওয়াজ, স্যর?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘গভীর সাগরে ড্রিলের মত শব্দ,’ বললেন হ্যামিলটন, ‘আবার নেভির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মহাদেশীয় তাক থেকে বেরোচ্ছে কোনও তরল।’

‘তেল?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘হতে পারে,’ বললেন নুমা চিফ, ‘চিনের পুব আর দক্ষিণ সাগরে আছে হাইড্রোকার্বন ডিপোযিট। এ ব্যাপারে খুব কড়া নজর রেখেছে চিনা সরকার। বিশেষ করে চিনের দক্ষিণ সাগরে। তবে শিমেযুর লোকেশন পুব সাগরে। ওই এলাকা যে চিনা নেভির, তাতে ভুল নেই।’

‘তাদের নিজ এলাকাতেই হোক, কিন্তু গোপনে কেন ড্রিল করবে?’ প্রশ্ন তুলল তানিয়া।

‘দু’বছর আগে একবার সাগরের নিচে খনি থেকে “ওর” তুলতে চেয়েছিল একটা কোম্পানি,’ বলল আসিফ। ‘কিন্তু জিয়োলজি টিম মানা করে। সাধারণ রিগ বসাবার চেয়ে অন্তত এক শ’ গুণ বেশি খরচ ওতে।’

‘ঠিকই বলেছ,’ বললেন হ্যামিলটন। ‘তবে চিনের পুব সাগরের নিচে যে সোনার রেকর্ডিং আমরা পেয়েছি, ওটা সাধারণ ড্রিলিং মনে হয়নি। কিছু ডেটা থেকে মনে হয়েছে, সাগরতলে তীব্র বেগে বেরোচ্ছে হালকা কোনও তরল। সেটা ভারী ক্রুড অয়েল নয়। আবার আরেক জায়গায় পাওয়া গেছে ভারী, ধীর গতির কিছু। ওই আওয়াজ এসেছে মহাদেশীয় তাকের অনেক গভীর থেকে। কিন্তু অত গভীরে কখনও ড্রিল করা হয়নি।’

‘হয়তো তৈরি হচ্ছে আগ্নেয়দ্বীপ,’ বলল আসিফ, ‘আমরা হয়তো ওটাই খুঁজছি।’

‘কিন্তু ঘুরে আসার উপায় নেই,’ বলল সোহেল।

‘আপনারা পুরুষালী সব চিন্তা করছেন,’ বলল তানিয়া। ‘এবার মেয়েলিভাবে ভাবুন। আমরা সহায়তা চাইতে পারি চিন

সরকারের কাছে। ডেটা দেব। জানাব, সাগর ফুঁড়ে উঠে আসছে জমি ওপরে। সম্ভবত তৈরি হচ্ছে চিনের এলাকায় বড় কোনও দ্বীপ। আমরা চাইব ওটা পরীক্ষা করতে। হতেও তো পারে রাজি হবে চিনা সরকার?'

কথাটা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তারপর বলল রানা, 'তাতে বাড়বে বিপদের সম্ভাবনা। গতরাতে খুন হয়েছে শিমেযুর পাঁচজন শিষ্য। বিজ্ঞানী হাসপাতালে। বাঁচবেন কি না ঠিক নেই। এতবড় হামলা হয়েছে শুধু ডেটা গোপন করতে। সেগুলো চিনের পুব সাগরের। চিনা সরকার সরাসরি জড়িত না হলেও চাল দিচ্ছে শক্তিশালী কোনও পক্ষ।'

মাথা দোলাল তানিয়া, বুঝতে পেরেছে।

'যারাই হোক, গোপন করছে কিছু,' বলল রানা, 'চাইছে না সব ফাঁস হোক। কাজেই খুঁজতে হবে অন্য পথ।'

'বলতে পারো ওখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব,' বললেন হ্যামিলটন। পরক্ষণে জানালেন, 'রানা, তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি চাইনিয লিসেনিং পোস্টের ব্যাপারে সব ডেটা। সোনার বয়া, তাদের প্যাট্রল স্কেজুয়াল আর সার্ভেইল্যান্স কেপেবিলিটির তথ্য আছে ওসব ডেটার ভেতর। তবে আমরা চাই না আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়তে। তোমরা ওখানে ধরা পড়লে, মেরে না ফেললেও, অন্তত বিশ বছর পচতে হবে চিনা জেলখানায়।'

সোহেলের দিকে তাকাল রানা।

কাগজ সরাবার আওয়াজ পেল ওরা ফোনে।

'এবার বিদায় নেব,' বললেন হ্যামিলটন, 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটিং আছে। কয়েক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করব তোমাদের সঙ্গে। আশা করি এরই ভেতর দেখে নেবে জরুরি ডেটা।'

লাইন কেটে যেতেই উঠে দাঁড়াল রানা। অন্যরা হাই তুললেও পুরো সচেতন ও।

ঘুমে কাতর হলেও ওর দিকে মাথা দোলাল সোহেল। 'এবার? ঢুকতে হবে চিনের সাগরে?'

কেউ কিছু বলার আগেই টোকার আওয়াজ হলো দরজায়। কবাট খুলে রানা দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের ডেস্ক ম্যানেজার। হাতে একটা মেসেজ।

কাগজটা নিয়ে চোখ বোলাল রানা।

'কী ওটা?' জানতে চাইল তানিয়া।

'বলতে পারো সমন,' বলল রানা, 'বলেছে জাপানিয ফেডারাল পুলিশের ডিসট্রিক্ট অফিসে যেতে।'

'মনে হচ্ছে ভালুকের মত ছয়মাস ঘুমিয়ে থাকি,' বলল সোহেল। 'তুই বরং যা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উপায় নেই। তোর জন্যেই এত আয়োজন। ওই যে, কমোডো ড্রাগনের ডিনার হতে আপত্তি তুলে পালিয়ে গেল যে লোক, তার ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছে তোর সঙ্গে। আমাদের মধ্যে তুই একমাত্র লোক, যে তাকে দেখেছে।'

আরেকবার হাই তুলল সোহেল। 'ঠিক আছে, ওদেরকে খুলে বলব, কীভাবে বিপুল সাহসের সঙ্গে লড়াই করে, আস্ত শরীরটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছি ভয়ঙ্কর চার ড্রাগনের কবল থেকে!'

মাথা দোলাল রানা, চোখে কৌতুক।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তানিয়া। 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানে চেপে এখন চোখ ভেঙে ঘুম পাচ্ছে।'

'আমারও একই হাল,' বলল আসিফ। 'তোরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আয়, আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই।'

'পারলে ঘুমিয়ে নে,' বলল রানা। 'তবে বোধহয় চিনের পুব সাগর থেকে ঘুরে আসার উপায় বেরোবে।'

ঘাড় কাত করে বন্ধুকে দেখল আসিফ।

ভুরু কুঁচকে গেছে তানিয়ার। 'নুমা চিফ না বললেন উপায়

নেই ওখানে যাওয়ার?'

'উনি বলেছেন আমেরিকান সরকারকে জড়ানো চলবে না,' বলল আসিফ।

'কিন্তু তাঁর মুখ এসব বললেও চোখে ছিল নীরব সায়,' বলল রানা।

আপত্তি তুলল তানিয়া, 'কিন্তু আপনি তো আর তাঁর চোখ দেখেননি।'

'কল্পনায় দেখে নিয়েছি,' হাসল রানা। 'নইলে এত ডেটা পাঠাচ্ছেন কেন? নেভাল প্যাট্রল আর সোনার বয়ার অত বয়ান এমনি এমনিই? তবে আমাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে নিরাপদ পথ।'

বুকে দু'হাত ভাঁজ করল তানিয়া। 'আমার তো মনে হয়নি তিনি চান আমরা গিয়ে বিপদে পড়ি।'

'খোলা লাইনে আর কিছু বলার উপায় ছিল না তাঁর,' বলল রানা, 'কান পাততে পারে যে-কেউ। কয়েক মিনিট পর দেখো এনক্রিপটেড ই-মেইল লিঙ্ক। নতুন মেসেজ না পেলে ঘুমিয়ে পার করে দিয়ো বিকেলটা।'

'রানার মত আমারও মনে হয় খাটুনির কাজ পেয়ে যাবি,' আসিফকে বলল সোহেল। স্বামী-স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যেতেই উঠে আড়মোড়া ভাঙল সে। 'বাপরে! ঘুমের অভাবে বুড়ো তো হয়েইছি, তার ওপর হাড়-মুড়মুড়ে ব্যারামও ধরেছে!'

মুচকি হাসল রানা। 'হে, মহাবীর, ড্রাগন পালোয়ান! আমি তো বিমানে ঘুমিয়ে চ্যাম্পিয়ন বদ্ধ-পাগল; তুই কী? তোর এত ঘুম-ঘুম কীসের?'

'চোপ! ব্যাটা পার্মানেন্ট পাষণ্ড!' বিড়বিড় করল সোহেল।

তেরো

সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরার মেসেজ পেয়ে ট্রেনে চেপে কয়েক স্টেশন যাওয়ার পর অন্য আরেক ট্রেনে উঠেছে রানা ও সোহেল। আরও চার স্টেশন পেরোবার পর নিয়েছে ট্যাক্সি। একটু পর ওটা ছেড়ে নানান গলি ঘুরে পৌঁছে গেছে মেট্রো পুলিশ দপ্তরের সামনে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে না বদ পুলিশের আখড়া,' মন্তব্য করল সোহেল।

বাড়ির চারদিকের দেয়ালে রামধনুর সাত রঙ। প্রধান ফটকের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরো ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার। হাতে সাদা গ্লাভ্স্। ডানহাতে চকচকে পলিশ করা লাঠি। লোকজন পাশ দিয়ে গেলেও নড়ছে না সে, চোখের পাতাও ফেলছে না।

'রিতসুবান,' বলল রানা, 'অতন্দ্র প্রহরী। সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে, সবসময় তাদের ওপর চোখ রেখেছে পুলিশ বাহিনী।'

'শুনে জ্ঞান লাভ করলাম,' বলল সোহেল। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, মাস্টার শিমেযুকে নিরাপদে রাখতে পারেনি।'

দালানে প্রবেশ করে হীরক আকৃতির এক রুমে ঢুকল ওরা। দুটো দরজা দালানের গভীরে যাওয়ার জন্যে, আবার রাস্তায় যাওয়ার জন্যে দুটো দরজা। ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভেবেছিল রানা ও সোহেল, কিন্তু কয়েকটা

ডেস্কে বসে আছে জাপানি ভাষা বলা কয়েকটা কমপিউটার। সোহেলের সুবিধার জন্যে একটার সামনে থামল রানা। স্ক্রিনে টোকা দিতেই জাপানি ভাষা ভুলে ইংরেজির বোল ফোটাল যন্ত্রটা। জানতে চাইল, 'আপনি আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলতে চান, নাকি ব্রিটিশ ইংরেজি?'

বিরক্ত হয়ে স্ক্রিনের অপশন থেকে ব্রিটিশ ইংরেজি বেছে নিল সোহেল।

'ওয়েলকাম টু দ্য ইয়ামানা পোলিস স্টেশন,' অভ্যর্থনার সুরে বলল কমপিউটার, 'প্লিয স্টেট ইয়োর রিযন ফর অ্যারাইভাল।'

'সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরার সঙ্গে দুপুর দুটোয় আমাদের মিটিং আছে,' বলল রানা।

'দয়া করে নিজের নাম ও কোন্ দেশের মানুষ তা টাইপ করে দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে।'

'মাসুদ রানা, জাতে বাঙালি, বাংলাদেশের নাগরিক।'

আউড়াল সোহেল, 'সোহেল আহমেদ, জাতে বাঙালি, বাংলাদেশের নাগরিক।'

চুপ থাকল কমপিউটার।

'ল্যারি কিঙের সুন্দরী ভেনাস সুযোগ পেলে এত চুপচাপ স্বামী হাতছাড়া করত না,' মন্তব্য করল সোহেল।

ল্যারি কিং নুমার রেসিডেন্ট কমপিউটার জিনিয়াস। তৈরি করেছে অত্যাধুনিক কমপিউটার সিস্টেম। তাক লেগে যাবে যে কারও। ওর কমপিউটার ভাবতে পারে নিজে থেকে। আছে সবচেয়ে দ্রুত প্রোসেসর। ফলে ভেনাস পৃথিবীর সেরা আর্টিফিশাল ইন্টেলিজেন্সের অধিকারী। এমন কী, তার আছে সূক্ষ্ম কৌতুকবোধও।

মৃদু শব্দে খুলে গেল ডানদিকের দরজা। 'আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা। ওদিকের দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যান।'

তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকল রানা ও সোহেল। চারপাশে দেখল শ'খানেক কমপিউটার স্ক্রিন সামনে নিয়ে বসে আছে একদল পুরুষ ও নারী। টিপে চলেছে কি-বোর্ড। ঘরের মাঝে কোনও দেয়াল নেই। আধুনিক ডিযাইন। ছাতে নির্দিষ্ট জায়গায় বাতি। একতিল ধুলো নেই ঘরে। চকচক করছে চারপাশ। কোনও অপরাধীকে দেখল না রানা ও সোহেল। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জাপানের ক্রাইম রেট পৃথিবীর সবচেয়ে নিচে। এর বড় কারণ, দেশটি অত্যন্ত ধনী। আরেকটি কারণ, জাপানিরা ছোটবেলা থেকেই শেখে নিয়ম-কানুন।

দু'একজন চেয়ে দেখলেও বেশিরভাগ অপারেটর ঘুরেও তাকাল না ওদের দিকে।

কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট ও ধূসর টাই পরনে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন রানা ও সোহেলের দিকে। তাঁকে অ্যাথলেট বলেই মনে হলো ওদের। চিবুকে গভীর খাদ। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল।

'আমিই সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরা,' বললেন তিনি।

মৃদু বাউ করল রানা, তবে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন তিনি। 'খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায়। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।'

নিখুঁত, ছোট এক অফিসে ওদেরকে নিলেন উবোন হিমুরা। ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

'আমার দেখা পৃথিবীর সেরা পুলিশ স্টেশন এটা,' মন্তব্য করল সোহেল।

'তা বোধহয় নয়,' বললেন উবোন হিমুরা। 'আমরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাই, এটুকু বলতে পারি।'

চারপাশে তাকাল সোহেল। ওর চোখ খুঁজছে খুঁত। নেই কোথাও। তারপর ওর মনে পড়ল রানার কথা, জাপানিরা

সবসময় প্রশংসাকে নিন্দনীয় বলে ধরে নেয়। তাই চেষ্টা করে আরও নিখুঁত হতে। বাঙালিদের অতি তাড়াহুড়োর কথা ভেবে লজ্জা পেল সোহেল। মনে পড়েছে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার হেডিং: রকেট বেগে চলেছে বাঙালি শিশু। আর্টিকেলে লেখা হয়েছে: কত কম বয়সে স্কুলে গুঁজে দেয়া হচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। তাতেই খুশিতে কুর্দন করছে বা লম্ফ দিচ্ছে বাবা-মারা। *দেখিয়ে দিলাম দুনিয়াকে!* অথচ, জাপানে বেশিরভাগ শিশুকে দশ বছর হওয়ার আগে স্কুলে ভর্তিই করা হয় না। আগে বাবা-মা ও আত্মীস্বজনকে সময় দেয়া হয়, যাতে তাঁরা বাচ্চাটাকে মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এই দালান সত্যিকারের শিল্প। দেখার মত। কোথাও কোনও খুঁত পাবে না কেউ। এখানে আসার সময় ওরা দেখেছে র‍্যাকে রাখা অস্ত্র। যে-কেউ বলবে জাদুঘরে পা রেখেছে সে। ধুলোর কণাও নেই কোথাও।

'আপনাদের ফয়েতে দেখলাম, রিসেপশনিস্ট বা ডিউটি অফিসার নেই,' বলল সোহেল।

'কেউ থাকলে সময় নষ্ট হতো,' বললেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা, 'আপনারা তো জানেন, ক্রমেই কমছে জাপানিদের জনসংখ্যা। আরও জরুরি কাজ দেয়া হচ্ছে পুলিশ অফিসারদেরকে।'

'কিন্তু ওই যে রিতসুবান?' প্রশ্ন তুলল সোহেল।

কাঁধ ঝাঁকালেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা। 'অপরাধ থেকে সবাইকে দূরে রাখতে এ ব্যবস্থা। তবে জীবন্ত গার্ড না রেখে ব্যবহার করা হয় ম্যানিকিন।'

ওটা এতই নিখুঁত, বোঝার উপায় ছিল না যে নকল পুলিশ।

'ভাল... আপনাদের মেশিন রিসেপশনিস্ট অনেক ভাষা জানে, এটা বলতেই হবে,' প্রশংসার সুরে বলল সোহেল।

'এ ছাড়া উপায়ও ছিল না,' বললেন হিমুরা। 'আমরা জানি, জাপানের বেশিরভাগ অপরাধ করে বিদেশিরা।'

সুপারইন্টেণ্ডেন্টের মুখে মৃদু হাসি দেখল রানা। কথাটা বলে তৃপ্তি পেয়েছেন তিনি।

'এবার বলুন কেন ডেকেছেন?' জানতে চাইল সোহেল।

'আমরা চাই, আপনারা যেন যত দ্রুত সম্ভব এ দেশ ছেড়ে চলে যান,' হঠাৎ করেই বোমা ফাটালেন হিমুরা।

'জী?' চেয়ারের পিঠে হেলান দিল রানা।

'আমরা চাই আপনারা যেন দেরি না করে ফিরে যান,' আবারও বললেন হিমুরা, 'আপনাদেরকে এস্কোর্ট করে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেব আমরা।'

'আপনারা কি জোর করে আমাদেরকে এ দেশ থেকে বের করে দিতে চাইছেন?' জানতে চাইল রানা।

'আপনাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই,' বললেন পুলিশ সুপার, 'গতরাতে যারা হামলা করেছিল, তাদের পরিচয় কী, তা জানতে পেরেছি আমরা। আগে তারা ছিল ইয়াকুযা দলের কুখ্যাত খুনি।'

ড্রাগনের খপ্পরে পড়ে আহত হলো যে লোক, তার বর্ণনা সোহেল দেয়ার পর, রানাও ধারণা করেছিল, সে হবে ইয়াকুযা দলের কেউ। নানান উল্কি ব্যবহার করে তারা। প্রথম যে প্রশ্নটা ওর মনে এল, সেটা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন আধপাগল এক বিজ্ঞানীকে খুন করতে চাইবে ইয়াকুযা দলের কেউ?'

'প্রাক্তন ইয়াকুযা,' শুধরে দিলেন হিমুরা। 'দল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'তার মানে, বলতে চাইছেন, সে বা তারা এখন ভাড়াটে খুনি,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা দোলালেন পুলিশ সুপার। 'আগে ইয়াকুযারা ছিল রোনিন। মানে, সামুরাই যোদ্ধা। মাথার ওপরে ছিল না প্রভু বা মালিক। যাযাবর বলতে পারেন। বা ভাড়াটে যোদ্ধা। এ যুগেও

তা-ই রয়ে গেছে। কেউ উপযুক্ত টাকায় ভাড়া করলে তার হয়ে খুন করে খুশি মনে। মিস্টার সোহেল যাকে দেখেছেন, সে একসময় ছিল ইয়াকুযা দলের পাণ্ডা। তবে কয়েক বছর আগে ইয়াকুযা দলের সিণ্ডিকেট ভেঙে দিই আমরা। বড় নেতাদের ভরা হয় জেলখানায়। নিচে যারা ছিল, গোপনে অপরাধ করছে তারা। কারও নির্দেশে কাজ করে না। ফলে আরও অনেক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এরা।'

'আপনারা কি জেনেছেন, কার হয়ে কাজ করছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন হিমুরা। 'বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। একেকজনের আলাদা আলাদা স্টাইল। জানার উপায় নেই, ওদেরকে ভাড়া করেছে কে বা কারা।'

শিমেযুর দুর্গে হামলার পেছনে রয়েছে চিনের পুব সাগর থেকে পাওয়া ডেটা। অথচ, আর কোনও তথ্য নেই। পুলিশ সুপার কী বলেন জানতে তাঁর দিকে তাকাল রানা।

'মূল কথা হচ্ছে, হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছেন আপনারা,' বললেন হিমুরা। 'এবার ধরে নিতে পারেন, আপনাদেরকে বাঁচতে দেবে না তারা। নইলে অপরাধী সমাজে ছোট হতে হবে। তাই এই অপমান সহ্য করবে না তারা কিছুতেই।'

'অথচ, একটু আগে বলেছেন, জাপানের বেশিরভাগ অপরাধ করে বিদেশিরা,' মন্তব্য করল রানা।

'তাই করে, অত্যন্ত দুঃখজনক,' মাথা নাড়লেন হিমুরা। সোহেলের দিকে ঠেলে দিলেন একটা ফাইল। 'শুধু আপনি দেখেছেন তাদের একজনকে। তাই ওই লোককে সনাক্ত করলে, উপকৃত হব আমরা।'

ফাইল টেনে নিয়ে খুলল সোহেল। ভেতরে মানুষের ছবি নেই, বদলে রঙিন সব ডিযাইন। সবই পিঠ ও কাঁধের উল্কি।

'ইয়াকুযারা সারাশরীরে এঁকে নেয় উল্কি,' বললেন হিমুরা, 'একেক দল ব্যবহার করে একেক ডিযাইন। দেখুন ওই

লোকের ডিযাইনের সঙ্গে এদের কারও মিল আছে কি না।'

সোহেলের পাশ থেকে দেখছে রানা। অত্যন্ত জটিল সব ডিযাইন। একেবারেই আলাদা। কোনও কোনওটার ভেতর রয়েছে ডানা বা ড্রাগন। এ ছাড়া, আছে আগুন ও করোটি। একটা ক্যালাইডোস্কোপে অসংখ্য রঙ ও ধারালো তলোয়ার।

'এখানে নেই,' প্রথম পাতা ওল্টাল সোহেল। পরের পৃষ্ঠা দেখে মাথা নাড়ল। 'এখানেও নেই।' আরও কয়েক পৃষ্ঠা দেখার পর হঠাৎ মুখ তুলল। 'এই যে প্যাটার্ন, এটাই ছিল ওই লোকের ঘাড়ে। তবে খানিকটা মাংস আর চামড়া নিয়ে গেছে কমোডো ড্রাগন।'

কাগজটা দেখলেন হিমুরা। 'যা ভেবেছি। কুখ্যাতির কারণে এর নাম দেয়া হয়েছে: "ওরে"। অর্থাৎ প্রেতাত্মা বা ভূত। পুরো নাম: "ওরে চিচিওয়া"।'

'তা হলে এই লোকই প্রেতাত্মা?' মৃদু হাসল সোহেল। 'কী সৌভাগ্য, প্রথমবারের মত দেখা পেলাম।'

'আসল নাম কেউ জানে না,' বললেন পুলিশ সুপার। 'প্রথমে যখন সিণ্ডিকেটের হয়ে খুন করতে লাগল, তার কিছু দিনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল কুখ্যাতি। বেশিরভাগ খুনি মজা পায় না খুন করতে। কিন্তু এর কথা আলাদা। খুব খুশি হয় ভয়ঙ্করভাবে মানুষ হত্যা করতে পারলে। তা ছাড়া, হুড়মুড় করে এসেছে লাখ লাখ টাকা। আর কী চাই!'

'জানলেন কে খুন করেছে দুর্গে, এবার ধরে ফেলুন,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে আর এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না আমাদেরকে।'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়,' ডিযাইনটা সরিয়ে রাখলেন হিমুরা। 'এদেরকে বাগে পাওয়া কঠিন। বছরের পর বছর ধরে তাকে খুঁজছি আমরা।'

'কমোডো ড্রাগন বিষাক্ত,' বলল সোহেল। 'যে লোকটা কামড় খেয়েছে, তাকে অবশ্যই যেতে হয়েছে হাসপাতালে বা

মর্গে।'

'সত্যিই খুব বিষাক্ত হয় কমোডো ড্রাগন,' সায় দিলেন পুলিশ সুপার। 'তবে আজ সকালে এক এক্সপার্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, প্রতিটা কামড়ে বিষ ঝাড়ে না এসব গিরগিটি। মিস্টার সোহেল, আপনি যে কামড় খেতে দেখেছেন, ওটা মারাত্মক হামলা না-ও হতে পারে।'

'ড্রাগনের মুখের ভেতরের অবস্থা ভাল থাকার কথা নয়,' বলল রানা। 'যতটা মনে পড়ে, ওগুলোর দাঁতে থাকে হাজার রকমের ব্যাকটেরিয়া।'

'কথা ঠিক,' সায় দিলেন হিমুরা, 'ওরে বোধহয় এখন জ্বরের ঘোরে কোঁ-কোঁ করছে। নিশ্চিতভাবেই ইনফেকশন হয়েছে। নিচ্ছে হাই-ডোযের অ্যান্টিবায়োটিক। তবে ধরে নিতে পারেন বাঁচবে সে। আর এজন্যেই আপনাদের বোঝার কথা, আপনারা আছেন মস্ত বিপদে। প্রথমে এ কথাই বলেছি।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। বুঝে গেছে সহজ সমাধানে পৌঁচেছেন হিমুরা। তাই ওদেরকে ডেকে এনেছেন পুলিশ স্টেশনে। নিজ মুখে বলছেন না কিছু।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'আমরা যদি সহায়তা করি, আপনি হয়তো উৎরে দিতে পারবেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে।'

চুপ করে থাকলেন হিমুরা।

'এসব ভেবেই বহু পথ ঘুরে আপনাদের স্টেশনে এসেছি আমরা,' বলল রানা। 'আমাদের পিছু নেয়নি কেউ।'

মৃদু মাথা দোলালেন পুলিশ অফিসার। 'আপনারা খুব বিচক্ষণ মানুষ। জেদিও। আবার এ কথাও ঠিক, জেদি হলেও ততটা বিচক্ষণ নন আপনারা।'

'আমরা চাই আপনাদের পাশে থাকতে,' বলল রানা।

'তা হলে কী করতে বলেন?' ভুরু নাচালেন হিমুরা।

'আপনি তো জানেন, হামলাটা ছিল বড় ধরনের। ব্যবহার

করা হয়েছে কয়েকটা স্পিডবোট। ছিল ডযনখানেক লোক। সঙ্গে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। ব্যবহার করেছে গ্রেনেড। এসব সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যয় করেছে বহু টাকা। যে যা-ই বলুক, চোর, ডাকাত বা অপরাধীদের ভেতর সম্মান বলে কিছু থাকে না। একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে না। তার মানে, কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পয়সা পাবে না এরা। অন্তত পুরো টাকা পায়নি।'

গম্ভীর হলেন হিমুরা। 'বোধহয় বোঝাতে চাইছেন, বিশেষ কোথাও বসে টাকা লেনদেন হবে।'

'সেটা আপনি আগেই জানেন,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন পুলিশ সুপার। ক'সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনারা কোন্ দিক থেকে কাজে আসবেন আমাদের?'

'বিজ্ঞানী শিমেযু আর তাঁর লোকদেরকে পাঠিয়ে দিন কোনও সেফহাউসে,' বলল রানা, 'মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিন, হামলায় মারা গেছে ক'জন বাঙালি। একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। নাম প্রকাশ করবেন না কারও। সংখ্যা বলাই যথেষ্ট।'

'আচ্ছা? তারপর?'

'ওরে প্রাক্তন ইয়াকুযা খুনি, কমোডো ড্রাগনের কামড়ে প্রতি চারঘণ্টায় নিচ্ছে হাই-পাওয়ারের অ্যান্টিবায়োটিক। স্বাভাবিকভাবেই তার মনে হবে, এখনই উচিত নিযুক্তকারীর কাছে বাকি টাকা চেয়ে নেয়া।'

রানা থেমে যেতেই ওর মনের কথা বললেন হিমুরা, 'প্রাপ্য টাকা নিতে গোপন আস্তানা থেকে বেরোবে ওরে চিচিওয়া।'

'আমার তা-ই ধারণা,' বলল রানা।

'যদি চেক-এ পরিশোধ করে,' বলল সোহেল, 'বা ইলেকট্রনিকালি?'

'অনেক বড় অঙ্কের টাকা,' বললেন হিমুরা। 'ঝামেলা

করতে পারে সরকারী ক্লিয়ারিং হাউস। কাজেই টাকা হারাবার ঝুঁকি নেবে না ওরে। সাধারণত এসব লেনদেন হয় খোলামেলা জায়গায় মুখোমুখি বসে। কোনও পক্ষ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে।'

'আপনি যদি বের করতে পারেন কোথায় লেনদেন হবে, ওখানে হাজির হব আমরা,' বলল রানা। 'দেখিয়ে দিতে পারব কে ওরে চিচিওয়া। এরপর যা করার আপনারা করবেন।'

সোহেলের দিকে তাকালেন পুলিশ সুপার। ভাবছেন, অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হবে বাঙালি লোকটাকে।

'ওরেকে চিনিয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল সোহেল।

নীরবে কী যেন ভাবতে লাগলেন হিমুরা। কিছুক্ষণ পর মাথা দুলিয়ে বললেন, 'আপনারা অত্যন্ত সাহসী মানুষ তা আগেই বুঝেছি, নইলে গতকাল রাতে ওভাবে লড়তেন না।'

'আমরা অতি সাহসী লোক নই, তবে প্রয়োজনে দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে যাই না,' বলল রানা।

'আমাদের মতই আপনারাও প্রশংসাকে পাত্তা দেন না,' বললেন হিমুরা। 'তবে বুঝতে পারছি না, কী কারণে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেবেন।'

'কেউ হামলা করলে ঠিক পছন্দ করি না আমরা,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, দায়িত্বও এড়িয়ে যাই না। আমাদের কারণেই হামলা হয়েছে দুর্গে মানুষগুলোর ওপর। আপনি চান ওরে চিচিওয়াকে। আর আমরা জানতে চাই তাকে টাকা দিয়েছে কে বা কারা এবং তা কী কারণে।'

'তার মানে, নুমা বা আমেরিকান সরকার জানতে চায়?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোনও পক্ষ জানতে চাইলে, সেটা বাংলাদেশ সরকার।'

পুলিশ সুপার হিমুরা বুঝে গেলেন সাধারণ সিভিলিয়ান নয় মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। সিধে করে নিলেন ডেস্কে

পড়ে থাকা কয়েকটা কাগজ। বললেন, 'ঠিক আছে। তবে জানিয়ে রাখি, সব তথ্য মিথ্যা দেব না আমরা। দুঃখজনকভাবে সকালে অচেতন অবস্থাতেই মারা গেছেন বিজ্ঞানী ইয়োশিরো শিমেযু। বেশি পুড়ে গিয়েছিল তাঁর ফুসফুস।'

কথাটা শুনে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার। ভাবছিল এমনই কিছু হবে।

গম্ভীর হয়ে গেছে সোহেলও।

একবার ওকে দেখে নিয়ে পুলিশ সুপারের দিকে তাকাল রানা। 'আশা করি তাঁর শিষ্যদেরকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দেবেন? নিজের কাজ শেষ করতে চাইতে পারে ওরে।'

'এরই ভেতর সরিয়ে ফেলেছি,' বললেন হিমুরা, 'তবে দুধে একটা মাছি ছিল।'

'সে কে?'

'শিমেযুর মহিলা বডিগার্ড।'

'হিনা,' বিড়বিড় করল সোহেল।

'হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে,' বললেন হিমুরা। 'বিজ্ঞানী মারা যাওয়ার সময় ওঁর বেডের পাশেই ছিল। মনে হয়েছিল প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। কিন্তু পরে যখন জবানবন্দি নিতে চাইলাম, তাকে আর খুঁজে পেলাম না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় মেয়েটার অস্ত্র থেকে আঙুলের ছাপ নিয়েছি। তাতে জানলাম, দীর্ঘ অপরাধী রেকর্ড আছে হিনার। টোকিওর ইয়াকুযা দলের হয়ে ডাকাতিও করেছে।'

রানার দিকে তাকাল সোহেল। 'এত কম বয়সেই? তোর কি মনে হয় ওই হামলার সঙ্গে হিনা জড়িত?'

'নিশ্চিত নই,' বলল রানা, 'তবে শিমেযুর হয়ে প্রাণপণে লড়েছে। দুটো গুলি লেগেছিল বুক ও পেটে। কেভলার ভেস্ট না থাকলে মারা পড়ত।'

'অতীত রেকর্ড ভাল নয়,' বললেন হিমুরা। 'ওকেও প্রায় ভূতের মতই ভয় পায় পাবলিক। ছোটবেলা থেকেই এতিম।

লড়েছে রাস্তায় রাস্তায়। পরে অপরাধী জগতে ঠাঁই করে নিয়েছে।'

'হয়তো উপায় ছিল না,' বলল সোহেল।

কঠিন সুরে বললেন হিমুরা, 'হয়তো। আপনাদের সঙ্গে হিনা যোগাযোগ করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।'

'মনে করি না যোগাযোগ করবে,' বলল রানা। 'নইলে চলে যেত না। তবে সে ফোন দিলে বা দেখা করলে, আমরা আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে,' বললেন পুলিশ সুপার, 'আমরা খবর ছড়িয়ে দিচ্ছি ইনফর্মারদের মাধ্যমে। কপাল ভাল হলে জানব কোথায় হবে টাকার লেনদেন। সেক্ষেত্রে ওখানে যাব আমরা।'

চোদ্দ

দূর থেকে দেখলে কেউ ভাববে, প্রচণ্ড বেগে চলেছে প্রকাণ্ড একটা সাদা সাপ। গতির কারণে একেবারে ঝাপসা। ওটা আসলে জাপানের নামকরা বুলেট ট্রেন। এইমাত্র সাঁই করে ঢুকে পড়ল একটা সুড়ঙ্গের ভেতর। পরক্ষণে বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে বেরোল সুড়ঙ্গের আরেকমাথা দিয়ে।

জীবনে প্রথমবারের মত 'টানেল বুম' শুনল তানিয়া। বসে আছে বারো বগির ট্রেনের অষ্টম বগিতে। পাশেই জানালা। বাইরের প্রচণ্ড শব্দ মোটেও ঢুকছে না ভেতরে। যেন মসৃণভাবে ভাসতে ভাসতে চলেছে ওরা সবাই।

'ভাল লাগছে টোকিও থেকে বেরোতে পেরে,' আসিফকে

বলল তানিয়া, 'বিশেষ করে রানা যা বললেন। যখন-তখন খুন হবেন।'

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ দেখল আসিফ। না, ওদের কথা শুনছে না কেউ। টোকাইডো শিনকানসেন রেললাইন জাপানের মেইন বুলেট ট্রেন রুট। সে পথেই টোকিও থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলেছে ওরা। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যবহৃত হাই-স্পিড রেললাইন হলেও অফ আওয়ারে প্রিমিয়াম কার-এ পড়ে থাকে অনেক সিট।

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত, মস্তবড় বিপদে পা দিচ্ছে রানা আর সোহেল,' বলল আসিফ, 'তবে এটাই ভরসা, নিজেদের কাজ বোঝে ওরা।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বলেছেন, চাইনিয প্যাট্রল এড়িয়ে পুব সাগরে যাওয়া অসম্ভব,' বলল তানিয়া। 'কী করা যায় সে ব্যাপারে কিছু ভাবছ?'

'এই যে, এটা দেখো।' নোটবুক কমপিউটার খুলে সামনের ট্রে টেবিলে রাখল আসিফ। চলার পথে অনেক সময় নিয়ে নুমা চিফের পাঠানো তথ্য ঘেঁটে দেখেছে। তানিয়ার দিকে স্ক্রিন ঘুরিয়ে দিল ও।

স্ক্রিনের অ্যাংগেল ঠিক করে চিনের পুব সাগরের ম্যাপ দেখল তানিয়া। বাঁকা সব রেখা নানাদিকে। ওগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে কোথায় ঘুরছে চাইনিয নেভাল ভেসেল। বড় একটা অংশ ধূসর রঙের। ওই এলাকায় আকাশ থেকে চোখ রাখছে অ্যান্টিসাবমেরিন এয়ারক্রাফট। আরও আছে সারি সারি লাল বৃত্ত। ওগুলো সোনার বয়া। কোনও উপায় নেই যে ফাঁকি দেয়া যাবে চিনা কর্তৃপক্ষকে।

'ওই এলাকা পাহারা দিচ্ছে চাইনিয মিলিটারি,' বলল তানিয়া।

'এত সিকিউরিটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওখানে লুকিয়ে সত্যিই কিছু করছে ওরা,' বলল আসিফ। 'তবে তাদেরকে

ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কাজে না-ও আসতে পারে। এর চেয়ে কর্তৃপক্ষকে ই-মেইল করে বলে দেয়া ভাল: "ভাই, আমরা আসছি, আপনারা দয়া করে শাংহাই জেলখানায় আমাদের জন্যে দুটো সিট রাখবেন।"'

'মানতে হচ্ছে তোমার কথাই...' বলতে বলতে থেমে গেল তানিয়া। হারিয়ে গেল নিজ মনে। হয়তো সত্যিই উপায় আছে যি-ওয়েভের এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার। কেমন হয় ওরা দক্ষিণ থেকে পুব সাগরে গেলে? কয়েক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে মানচিত্রটা বড় করল ও। দেখল, প্রতিটি ভাইটাল জায়গায় রয়েছে নেভাল প্যাট্রল। কোথাও কোনও ক্রুটি রাখেনি চাইনিয কর্তৃপক্ষ। 'ধরো, আমরা যদি ব্যবহার করি শিপিং লেন?'

'তাতে কী লাভ?'

'এশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর শাংহাই। আমরা যদি ওখান থেকে একটা মালবাহী জাহাজে করে রওনা হই?'

'তারপর মাঝ সাগরে নেমে গেলাম। ...তারপর? সাঁতরে বাড়ি ফিরব কী করে?'

'হুঁ, ভাবিনি। কিন্তু ঠিক জায়গায় যাওয়ার পর যদি আমরা জাহাজ থেকে কিছু ফেলে দিই? যেমন ক্যামেরা? সেটার সঙ্গে থাকবে সোনার। আর তারপর জাহাজে বসে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালাব সব।'

খুশি হয়ে উঠল আসিফ। 'তবে ওই সোনার বা ক্যামেরা রেখে আসতে হবে সাগরের নিচেই।'

'খরচ খুব বেশি পড়বে না,' বলল তানিয়া।

'ঠিক,' সায় দিল আসিফ। 'একেবারে শেষ সময়ে উঠব ফ্রেইটারে। তাতে সন্দেহ করবে কেউ কেউ। কিন্তু আমরা তো আর পেটমোটা রোভ তুলছি না জাহাজে। তাই লাগেজ খুঁজতেও যাবে না কেউ। অবশ্য ডেকের পাশ থেকে সাগরে ক্যামেরা বা সোনার নামালে দেখে ফেলবে যে-কেউ।'

'দেখবে না,' বলল তানিয়া, 'উঠব ওসাকা টু শাংহাই-এর

ফেরিতে। বুক করব কেবিন।' স্বামীর দিকে কমপিউটার ঘুরিয়ে দিল ও। হাইলাইট করল শিপিং রুট। 'এই কমপিউটারের তথ্য ঠিক হলে, ওই ফেরি যাবে টার্গেট এরিয়া থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূর দিয়ে।'

'প্রথম সমস্যা মিটে গেল,' বলল আসিফ। 'কিন্তু রোভ? ওটা পাব কোথায়?'

টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করেছে তানিয়া। 'সেটাই এখন ভাবছি।'

হঠাৎ মুচকি হাসল আসিফ। 'বোধহয় পেয়ে গেছি উত্তর। বলো তো, ঠিক কখন রওনা হবে ওই ফেরি?'

ইণ্টারনেটে গিয়ে ওসাকা টু শাংহাই ফেরির স্কেজুয়াল দেখল তানিয়া। 'সপ্তাহে দু'বার আসা-যাওয়া করে। আগামীকাল দুপুরে রওনা হবে শাংহাইয়ের দিকে।'

'তা হলে যথেষ্ট সময় পাব,' বলল আসিফ।

'কীসের জন্যে সময়?'

'তোমার মনে আছে, কিছু দিন আগে ক্রো-র কথা বলেছিল ববি মুরল্যাণ্ড?'

ক'সেকেণ্ড পর বলল তানিয়া, 'হ্যাঁ। ওঁর নতুন তৈরি রোভ। মেকানিকাল কাক। ছোঁক-ছোঁক করার জন্যে।'

'ওটা ক'দিন আগে পরীক্ষা করেছে হাওয়াই দ্বীপের কাছের সাগরে,' বলল আসিফ, 'হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা না হয়ে থাকলে, আমরা নুমা চিফকে অনুরোধ করতে পারি, যাতে ওটা জাপানে পাঠিয়ে দেন তিনি। তা হলে এয়ারপোর্ট থেকে সংগ্রহ করে নেব। সময়ও পাব ফেরির টিকেট কাটতে। রোভটাকে পেটে নিয়ে শাংহাই-এর দিকে যাবে ফেরি।'

পনেরো

'পুরুষ, দৈর্ঘ্য ছয় ফুট,' রোবটের মত আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল চিনা টেকনিশিয়ান। পরনে সাদা ল্যাব কোট। চোখে চশমা। ন্যাড়া মাথা চকচক করছে কাঁচের সাদা বলের মত। নাম লোকটার সাবা সাবেলা, বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটনের ইঞ্জিনিয়ার দলের নেতা। 'স্যর, আপনার কথা মত রাখা হয়েছে ত্বক। তবে এখনও মুখ বা চুল দিইনি আমরা।'

নাগাসাকি উপকূলে হাশিমা দ্বীপে নীরব, শীতল এক গোপন ফ্যাসিলিটির মাঝে চৌকো এক ঘরে দাঁড়িয়ে আছে বিলিয়নেয়ার। ছাতে জ্বলছে অত্যুজ্জ্বল সাদা বাতি। ঘরের মাঝে ধাতব টেবিলে পড়ে আছে মস্তক ছেদ করা একটা দেহ। গভীর মনোযোগে ওটাকে দেখল লো হুয়াং লিটন। মুণ্ডহীন ধড়ের ত্বক থেকে আসছে প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ। একটু বেশি চকচক করছে। 'না, নতুন করে কাজে নামুন। এখনও রয়ে গেছে অনেক বেশি খুঁত। বাজে ধরনের খুঁত।'

তর্ক করতে গেল না ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলা। অবশ্য চেহারায় প্রকাশ পেল অসন্তুষ্টি। নরম সুরে বলল, 'বডি প্যানেল নিখুঁত করা জটিল কাজ। গায়ের পেশি আর ত্বক সত্যিকারের মানুষের মত নড়াচড়া করতে হবে। যতই থ্রি-ডি প্রিন্টিং প্রসেস ব্যবহার করা হোক, পলিমার দিয়ে সত্যিকারের মানুষের মত মাংস বা ত্বক তৈরি প্রায় অসম্ভব।'

'আবারও বলছি, নিখুঁত হতে হবে কাজে,' বলল লো

হুয়াং, 'অন্ধ লোকও বলবে এর ত্বক নকল। আর গা থেকে বেরোচ্ছে পোড়া প্লাস্টিকের দুর্গন্ধ। তা ছাড়া, কেউ স্পর্শ করলেই বুঝবে, এর হাত, পা বা শরীরে কোনও রোম নেই। নেই জন্মদাগ বা পুরনো ক্ষত। মানুষ এমন হয় না।'

'এ কথা আমরা ভাবিইনি,' অপরাধী সুরে বলল টেকনিশিয়ান।

'এবার ভাবুন,' নির্দেশের সুরে বলল বিলিয়নেয়ার। 'নতুন করে ডিযাইন করুন ত্বক। নিজেকে ভাবুন শিল্পী। নিখুঁত কিছু তৈরি করতে হবে না। নিখুঁত কোনও মানুষকে খুঁজে পাবেন না। যে-কারও কনুইয়ের কাছে থাকবে চামড়ায় ভাঁজ, এখানে ওখানে পুরনো ক্ষতের চিহ্ন। আঁচিলও থাকতে পারে।'

মাথা দোলাল সাবা সাবেলা। নোটবুকে তুলে নিল তথ্যগুলো। 'এবার বুঝতে পেরেছি, স্যর। এরপর...'

'পোড়া প্লাস্টিকের গন্ধটাও দূর করবেন। আমার তো মনে হচ্ছে ঢুকে পড়েছি পুরনো টায়ারের দোকানে।'

লজ্জায় লাল হলো টেকনিশিয়ানের দু'গাল। 'জী, স্যর। দেরি না করে কাজে নামছি আমরা।'

'গুড,' বলল লো হুয়াং। 'এবার বলুন আকার-আকৃতির কথা। আগেই বলেছি, নানান ধরনের হতে হবে দেহ।'

'ভেতরের ফ্রেমে নানাধরনের ত্বক ও মাংসপেশি জুড়ে দিতে পারব,' বলল সাবেলা। 'ফ্যাক্টরির মডেলের মত নয় এগুলো। লম্বা বা বেঁটে করে দেয়া সমস্যা নয়। ওজনও কমবেশি করতে পারব। চার ফুট আট ইঞ্চি থেকে শুরু করে সাত ফুটি দানবও তৈরি সম্ভব। একবার ফ্রেম তৈরি হলে থ্রি-ডি প্রিন্টিং করে তৈরি হবে বডি প্যানেল। চাইলে একই চেসিস বেশ ক'বার ব্যবহার করতে পারব। কঠিন নয় বডি প্যানেল অ্যাডজাস্ট করা। ছোট-বড় করে নেয়া যাবে মাথা, হাত-পা আর মাঝের অংশ।'

'ভেরি গুড,' মাথা দোলাল লো হুয়াং, 'তো কাজে নেমে

পড়ুন। আগামীকাল এসে দেখব কাজ কতটা এগোল।'

ইঞ্জিনিয়ারের নতুন উদ্যম দেখে খুশি মনে দরজার দিকে চলল হুয়াং লিটন। উজ্জ্বল আলোকিত ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে এল বাইরের সুড়ঙ্গে। দেখে নিল চারদিকের পাথুরে নোংরা দেয়াল। তিরিশ ফুট দূরে দূরে একটা করে এলইডি বাল্‌ব্। ওই আলোয় দূর হয়নি অন্ধকার।

সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে চলল লো হুয়াং। জায়গায় জায়গায় ছাত নেমে এসেছে, মাথা নিচু করতে হচ্ছে তাকে। অবশ্য, আরও কিছু দূর যাওয়ার পর শুরু হলো মানুষের তৈরি করিডোর। শেষমাথার দরজা খুলতেই এল প্রাকৃতিক আলো।

ঢুকে পড়েছে লিটন বিশাল এক ফাঁকা ওয়্যারহাউসে। ওপর দিকের কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে আসছে আলো। বহু ওপরে উঠেছে করোগেটেড ধাতব দেয়াল। একপাশে স্তূপ হয়েছে ভাঙা কাঠের বাক্স। পাশেই বাচ্চাদের জং ধরা একটা ট্রাই সাইকেল। লো হুয়াং লিটন ওয়্যারহাউসে ঢুকে চমকে দিয়েছে দুটো কবুতরকে। ডানার ফটফট আওয়াজ তুলে ক'বার ঘুরে ভাঙা এক জানালার চৌকাঠে গিয়ে উঠল ওরা।

ওদিকে চেয়ে রইল বিলিয়নেয়ার। টেকনিশিয়ানরা বলেছে, কয়েক দিন আগে ভুল করে ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে দুই কবুতর, এরপর আর বেরোতে পারেনি। নিজেকে ওদের মতই বন্দি মনে হলো লো হুয়াং লিটনের। এই মিশন হাতে নেয়ার পর থেকে ক্রমেই জড়িয়ে গেছে নিজের তৈরি ফাঁদে।

যেইন নিং প্রস্তাব দিতেই লাফিয়ে তার কোলে গিয়ে উঠেছে সে। অথচ, উচিত ছিল সতর্ক হওয়া। অনেক জটিল হয়ে গেছে পরিস্থিতি।

ওয়্যারহাউস থেকে বেরোবার দরজার দিকে পা বাড়াল লো হুয়াং। তখনই বেজে উঠল ফোন। কোটের পকেট থেকে কালো, চিকন ডিভাইসটা বের করল সে। স্ক্রিনে কোনও নম্বর নেই। শুধুমাত্র একটা কোড বুঝিয়ে দিল, পার্সোনাল নেটওঅর্ক

থেকে করা হয়েছে এনক্রিপটেড কল।

সবুজ বাটন টিপে কল রিসিভ করল লো হুয়াং লিটন।

'কোথায় ছিলে?' ওদিক থেকে কড়া সুরে জানতে চাইল কেউ। 'অন্তত দশবার ফোন করেছি সকাল থেকে।'

আপাতত নিজের ভেতর নেই প্রেতাত্মা, ভাবল লিটন। 'কোথায় আছি তোমার জানার দরকার নেই। বলো কেন ফোন করেছ।'

'বাকি প্রাপ্য বুঝে নেয়ার জন্যে।'

'চুক্তির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে?' বলল বিলিয়নেয়ার। 'প্রথমে আমার জানতে হবে সফল হয়েছ কি না। তার আগে...'

'একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে,' বলল ওরে। 'তাতে বুঝবে, আমার কাজ শেষ করেছি।'

মৃদু আওয়াজে হাজির হলো লিঙ্ক। কান থেকে সরিয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকাল লো হুয়াং। ওখানে আছে একটা জাপানিয নিউজ রিপোর্ট। লেখা আছে পুড়ে গেছে দুর্গ। মারা গেছে এগারোজন। তাদের ভেতর রয়েছেন দুর্গের মালিক বিজ্ঞানী ইয়োশিরো শিমেযু। খুন হয়েছে তিনজন বাঙালি অতিথি। আরও কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে। তবে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

একটা হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে বর্ণনা দিচ্ছে এক জাপানি রিপোর্টার। কী কারণে দুর্গে আগুন ধরেছিল, সেটা নিয়ে এখনও তদন্ত করছে ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশবাহিনী। তবে কোনও ধরনের তথ্য নেই বললেই চলে।

'ওই কাজের জন্যে বাড়তি টাকা দেয়া উচিত তোমার,' বলেই পর পর দু'বার হ্যাচ্চো-হ্যাচ্চো করে হেঁচে নিল প্রেতাত্মা। পরক্ষণে শুরু হলো বিচ্ছিরি খক-খক কাশি।

'অসুস্থ নাকি?' জানতে চাইল লো হুয়াং।

'আহত,' বলল ওরে। 'কিন্তু নিজের কাজ ঠিকই শেষ

করেছি। এবার তোমার পালা। টাকার ব্যবস্থা করো।'

কতটা খারাপভাবে প্রেতাত্মা আহত, জানতে পারলে ভাল হতো, ভাবল লো হুয়াং। জাপানি বিজ্ঞানীর মত ওই ব্যাটাও ফুসফুস পুড়ে মরলে আর টাকা দিতে হতো না। 'কথামতই টাকা পেয়ে যাবে। তবে কাজ ঠিকভাবে শেষ হয়েছে, সেটা নিশ্চিত হয়ে নেব।'

'যা খুশি করো, তবে বাড়তি সময় দেব না,' বলল ওরে, 'এখনও বেঁচে আছে কেউ কেউ। বেরিয়ে আসতে পারে সত্য ঘটনা। তার আগেই ডুব দিতে হবে আমাকে। কাজেই টাকা দেবে তুমি আজ রাতেই।'

'আমার আজ অন্য কাজ আছে,' বলল লো হুয়াং।

'ভুলেও চিটিংবাজি করতে যেয়ো না,' ধমকের সুরে বলল প্রেতাত্মা, 'তোমার চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী লোকও ওই কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে আমার হাতে।'

ঘাড়ের কাছে ভীষণ রাগী প্রেতাত্মা খুনি চাই না, ভাবল লো হুয়াং। টাকা বড় কথা নয়, তবে নিয়মের বাইরে যাবে না সে। 'ঠিক আছে, আজ রাতেই টাকা পাবে। পেয়ে যেতে পারো আরেকটা ভাল কাজও। যদি উপযুক্ত হও আর কী।'

চুপ থাকল ওরে। কিছুক্ষণ কেশে নিয়ে বলল, 'আগের টাকা দিয়ে নাও। পরের কাজ পরেই শুনব।'

'ঠিক আছে,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'তবে যেখানে দেখা হবে, সেখানে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হবে তোমাকে।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'দু'জনই চিনি এমন জায়গায় বসব,' বলল লো হুয়াং লিটন। 'নিয়ন সাইন। বিশ্বাস করো, ওখানে গেলে পুরনো অনেক দোস্তের সঙ্গে দেখা হবে তোমার।'

ওই বেআইনী নাইটক্লাব ও গ্যাম্বলিং প্যালেস ভাল করেই চেনে ওরে। জাপানে ক্যাসিনো নিষিদ্ধ হলেও দাপটের সঙ্গেই বড় সব শহরে ব্যবসা করছে অমন দু'চারটা সংগঠন।

'ঠিক আছে,' বলল ওরে, 'দেখা হবে। ভুলেও চালাকি করতে যেয়ো না।'

শহরতলীতে নিয়ন সাইন ক্লাব চালায় টোকিওর শক্তিশালী ইয়াকুযা কার্টেল। ক্যাসিনো রুমে চলে কোটি কোটি টাকার জুয়া। নিশ্চিন্তে যা খুশি করে ধনীদের তরুণ-তরুণী ছেলে-মেয়েরা। নিয়মিত হাজির হন রাজনৈতিক নেতা, খেলাপি ঋণকারী বড় মাপের অপরাধী ব্যবসায়ীরা।

ওরেকে ভালভাবে চিনলেও কিছুই বলবে না কার্টেলের কর্মচারী বা সশস্ত্র গার্ডরা। কোনও কৌশলের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই লো হুয়াং লিটনের। তবে ক্লাবে ঢুকতে গেলে অস্ত্র বা কোনও গুবরে পোকা আছে কি না, আগেই সার্চ করা হবে। কাজেই তার মনে হয়েছে, পুরো দ্বীপে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে নিয়ন সাইন ক্লাব। চাইলেও যা খুশি করতে পারবে না ভূত বা প্রেতাত্মা।

ষোলো

মুখে ফুলফেস হেলমেট পরে ওসাকা উপসাগরের আট ফুট তলা দিয়ে চলেছে আসিফ রেজা, পরনে ওয়েট সুট। অশ্বারোহীর মত বসে আছে ববি মুরল্যাণ্ডের তৈরি রোভ ক্রো বা কাকের পিঠে। জোরালো স্রোতের টানে ওর মনে হচ্ছে, তুষার ভরা উঁচু পাহাড় থেকে সাঁই-সাঁই করে নামছে ও। শক্তহাতে ধরেছে মেশিনের হ্যাণ্ডেল। পেছনে বৃত্তাকার খাঁচায় বনবন ঘুরছে প্রপেলার। আহত হওয়ার ভয় নেই, তাই

প্রপালশান ডাক্টের একটু আগে রেখেছে পা।

হেলমেটের মাইক্রোফোনের স্পিকারে বলল আসিফ, 'গতি কমাও। পিছলে প্রপেলারে পা ঢুকলে নতুন গোড়ালি লাগবে। খরচা অনেক।'

ওপরে রয়ে গেছে রিভেটার, আসিফের কথা পৌঁছে দিল তানিয়ার কাছে। এক শ' গজ দূরের সাগরে বোটে বসে রোভ নিয়ন্ত্রণ করছে ও। সাগরতলে ওর কণ্ঠ এল অস্পষ্টভাবে। 'তুমিই না চেয়েছিলে পানির নিচে কাজটা করতে?'

'পরেরবার হাসতে হাসতে তর্কে হারব।' সাবধানে শরীর মুচড়ে দু'পাশ দেখল আসিফ। ওসাকা উপসাগরের ময়লা পানির মাঝ দিয়ে দূরে চোখে পড়ল তানিয়ার বোটের তলি। অন্ধকারের বুকে সাদা একটা রেখা।

এখন সাগর-সমতল থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট নিচ দিয়ে চলেছে আসিফ। রোদেলা বিকেল, অথচ ওপর থেকে আসছে না কোনও আলো। বন্দরের পলি, পাথর ও বালি একটু পর পর সরছে এদিক-ওদিক ভারী জাহাজ চলাচলের কারণে। তার ওপর শহরতলী ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল দূষণে বহু গুণ বেশি জন্মেছে অ্যালগি। একসময়ে ওগুলো খেতে হাজির হতো হাজার হাজার মাছ। কিন্তু শেষে দেখা গেল মাছগুলোকেই বরং তাড়িয়ে ছেড়েছে সাগরতলের ওই বিষাক্ত শৈবাল।

'প্রায় কিছুই দেখছি না,' বলল আসিফ, 'টার্গেট থেকে কতটা দূরে আছি?'

'আরও সিকি মাইল,' বলল তানিয়া, 'একটু পর পাশ কাটিয়ে যাব ফেরি। তখন তোমাকে পৌঁছে দেব ওটার ঠিক নিচে। জাহাজটা দেখলেই আমাকে বলবে। তারপর তোমার কথা শুনে ঠিক করব কোর্স।'

'তার মানে, বলে দিতে হবে কীভাবে ড্রাইভিং করবে?' জানতে চাইল আসিফ। 'ভাল। জীবনে প্রথম।'

'তুমি তো আর কোনওকালেও ড্রাইভিং ঠিকভাবে শিখলে

না,' বলল তানিয়া। 'এবার বাঁক নাও। একমিনিট পর দেখবে নাকের কাছে হাজির হয়েছে ফেরির খোল।'

স্রোত সামলে প্রতিটি সেকেণ্ড গুনতে লাগল আসিফ। মাথা উঁচু করে দেখছে দূরে। কিন্তু ওদিকে আছে শুধু ধূসর-সবজেটে পর্দা। আওয়াজের অভাব নেই। চিঁ-চিঁ তীক্ষ্ণ শব্দ তুলছে রোভের ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক প্রপেলার। গুঞ্জন তুলে দূরে যাচ্ছে তানিয়ার বোট। নিচু চাপা একটা আওয়াজ আসছে সরাসরি সামনে থেকে।

'ফেরির ইঞ্জিনের শব্দ শুনছি,' বলল আসিফ।

'দেখতে পেয়েছ?'

'এখনও না,' বলল আসিফ, 'বুঝতে পারছি, এজন্যেই কোটি বছর ধরে শরীরে সোনার তৈরি করেছে ডলফিনের দল।'

'সোনারের চেয়েও ভাল জিনিস এই আওয়াজ,' বলল তানিয়া, 'কিছু দেখলে জানাবে। কমিয়ে দিচ্ছি রোভের গতি।'

বেগ কমতেই টের পেল আসিফ, আপাতত মাত্র কয়েক নট ওর গতি। তাতে চাপ কমল হাতের ওপর থেকে। একটু দূরে দেখল বিশাল কী যেন। 'দেখেছি,' বলল আসিফ। 'প্রস্রাব করা গরুর মত বিলজ ওঅটার ফেলছে। আমাকে সরাও দশ ডিগ্রি বামে। সরাসরি ফেরির নিচ দিয়ে যেতে চাই না।'

জালি দিয়ে ঘেরা প্রপেলারের নাকের কাছ থেকে সরল ব্যাঙাচি আকৃতির রোভ।

'সরাসরি বিশ সেকেণ্ড এগোও,' বলল আসিফ, 'তারপর আমাকে রাখবে ফেরির কিল থেকে দশ ফুট নিচে। বন্ধ করবে থ্রটল।'

ফেরির খোল পরিষ্কার দেখছে আসিফ। অনেকটা ওপরে ওঅটার লাইন। ত্রিশ বছর সাগরে চলে লোহার লাল খোলে এখন খয়েরি দাগড়া সব জং। জায়গায় জায়গায় পুরু হয়ে জন্মেছে শৈবাল। জাহাজের ষোলো ফুট নিচ দিয়ে চলেছে

আসিফ। ভয় নেই মাথা ঠুকে যাবার। 'এবার থ্রটল বন্ধ করো,' বলল আসিফ।

ক'সেকেণ্ড পর থামল ইলেকট্রিকাল মোটর। ফেরির কিলের নিচে থামল রোভ। ড্রাইভিং বাতি জ্বালল আসিফ। 'এবার গায়ে খাটতে হবে।'

উরু থেকে রোভের ফিতা খুলে সাঁতরে ওপরে উঠল ও। বিশাল জাহাজের নিচে থাকা সত্যিই অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। ওর মনে হলো, উঠে স্পর্শ করতে পারবে আকাশের সারি সারি মেঘ। 'পৌঁছে গেছি ঠিক জায়গায়।'

'কেমন লাগছে?' জানতে চাইল তানিয়া, 'মাথার ওপরে ভাসছে তিরিশ হাজার টনি জাহাজ!'

'ভাবছি বয়্যান্সির নিয়ম মেনে ভেসে থাকুক ফেরি! তবে আগামী দশ মিনিটে এখান থেকে বেরোতে না পারলে রীতিমত মানসিক কষ্টে পড়ব।'

জাহাজের খোলের যে অংশ বেছে নিয়েছে, সেটা খুঁজে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না ওর। ওটা বো-র কাছেই। নুমার ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, ফেরি চললে কম ডাইন্যামিক প্রেশার পড়বে ওখানে। 'রোভ রাখার জায়গা পেয়ে গেছি।'

'দেখতে কেমন?' জানতে চাইল তানিয়া।

'পুরু হয়ে খোলে লেগে আছে কোটি কোটি গুগলি,' বলল আসিফ, 'বুঝলাম, শাংহাই ফেরি কোম্পানি বাপের জন্মেও তাদের জাহাজ পরিষ্কার করেনি।'

ম্যাগনেটে ব্যবহার করে জোঁকের মত জাহাজের গায়ে আটকে যাবে এই রোভ। কিন্তু লোহার খোলে গুগলি বেশি থাকলে মোটেও কাজ করবে না চুম্বক। যেখানে রোভটাকে রাখবে, আগেই উপড়ে নিতে হবে সেখানের সব গুগলি। এজন্যেই গোপনে ফেরির নিচে হাজির হয়েছে আসিফ। ওর সঙ্গে নিডল স্কেলার। শক্তিশালী ইলেকট্রিকাল ডিভাইস। দেখতে অ্যাসল্ট রাইফেলের মত। বাঁট রাখতে হবে কাঁধে।

ওপরে খাড়া হ্যাণ্ডগ্রিপ। লম্বা ব্যারেলের শেষে টাইটেনিয়াম বাটালি। যন্ত্রটা আসিফ চালু করলেই তীব্র বেগে আগু-পিছু করবে ওটা। শক্তহাতে যন্ত্র ধরলে ছিটকে পড়বে সব গুগলি, বেরিয়ে আসবে জাহাজের মসৃণ খোল।

'কাজ শুরু করলাম,' স্ত্রীকে জানাল আসিফ। কাঁধে ঠেকাল নিডল স্কেলারের বাঁট। সুইচ টিপে গুগলির ওপর বাটালি রেখে এগোতে চাইল সাঁতরে। জাদুর মত কাজ করছে ধারালো বাটালি, একেকবারে খসে পড়ছে অনেক গুগলি।

'কতটা পুরু গুগলির স্তর?' জানতে চাইল তানিয়া।

'অন্তত চার ইঞ্চি,' বলল আসিফ।

'ভাবলে অবাক লাগে, কীভাবে জাহাজকে নিজেদের বাড়ি বানিয়ে নেয় এরা,' বলল তানিয়া। 'জানো, জাহাজ বা বোট জলে নামার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় ওগুলোর গায়ে জন্মায় মাইক্রোব?'

'জানতাম না,' বলল আসিফ। 'তবে, তানিয়া, এগুলো মাইক্রোব নয়।' কাজে মনোযোগ দিল ও।

নানান গুগলি নিয়ে বকে চলল তানিয়া। আজ থেকে হাজার বছর আগে উড ওঅর্ম থেকে বাঁচতে তাদের নৌকার তলিতে সীসার পাত লাগাত রোমানরা। পরে জাহাজের বহর রক্ষা করতে খোলের নিচে তামার পাত লাগাত ব্রিটিশরা। তানিয়া আরও বলল, জাহাজ বা নৌকায় মেরিন গ্রোথ ঠেকাতে দারুণ কাজে লাগে টিনের পাত। কিন্তু তাতে খুব দ্রুত বিষাক্ত হয়ে ওঠে পানি।

স্ত্রীর কথায় মন নেই আসিফের। ঠিক অ্যাংগেল-এ ধরে গায়ের জোরে চালাচ্ছে যান্ত্রিক বাটালি। ছিটকে পড়ছে শক্ত খোলের গুগলি। দু'বর্গ ফুট খোল পরিষ্কারের পর সাফ করল দশফুট পেছনের জায়গা। সামনের মসৃণ খোল থেকে একটু সামনে গুগলি-মুক্ত করল তৃতীয় আরেকটা অংশ।

কাজ শেষ করতে লাগল সাত মিনিট। ব্যথা হয়ে গেছে

হাত ও কাঁধ।

'...তারপর কীভাবে যে ওরা আবার হাজির হয়, ভাবাই যায় না,' কথা শেষ করল তানিয়া।

'ঠিক,' সায় দিল আসিফ। প্রায় কিছুই শোনেনি। 'এ হচ্ছে স্নো-ব্লোয়ারের কাজের মত। উড়িয়ে দাও তুষার।'

'তোমার কাজ শেষ?' জানতে চাইল তানিয়া।

'হ্যাঁ, শেষ।' বেল্টে স্কেলার ঝোলাল আসিফ, 'এবার ঠিক জায়গায় নেব রোভ। তুমি চালু করে দেবে ম্যাগনেট।'

রোভ সেট করা আছে যিরো বয়্যান্সিতে। পানির নিচে যান্ত্রিক কাক সরিয়ে নেয়া কষ্টকর কাজ। কিছুক্ষণের ভেতর হাঁফিয়ে গেল আসিফ। ঠিক জায়গায় ওটা রেখে বলল, 'এবার চালু করো মেইন ম্যাগনেট।'

শক্তহাতে ধরেছে রোভ। শুনল গুনগুন শব্দ, তারপর খঠাং। রোভের ওপরে বড়, বৃত্তাকার সাকশান কাপটা দেখতে মাছের মুখের মত। ওটাই মেইন ম্যাগনেট, আটকে গেছে খোলের সঙ্গে। 'চালু করো অন্যদুটো।'

এক সেকেণ্ড পর জাহাজের গায়ে আটকে গেল রোভের সামনের ও পেছনের ম্যাগনেট। হ্যাণ্ডেল ও রিগিং ধরে টান দিল আসিফ। খোলে পা রেখে প্রাণপণে ছুটিয়ে নিতে চাইল রোভ। একতিল নড়ল না যন্ত্রটা।

সন্তুষ্ট হয়ে খোল থেকে সরল। 'উপড়ে ফেলেছি ছোট অনেক গুগলি, কিন্তু সে-জায়গায় এখন ধাতব বড় একটা। এবার তোমার বোটের দিকে আসছি।'

'আচ্ছা,' বলল তানিয়া, 'আছি পোর্ট সাইডে দু' শ' গজ দূরে। সাঁতরে চলে এসো। হাতে বেশি সময় নেই। ফেরি ধরতে হবে।'

সতেরো

একটু আগে ধূসর দিগন্তের ওদিকে ডুবে গেছে লালচে সূর্য। টোকিওর মেট্রো এরিয়া পেরিয়ে হাইওয়ে থেকে নেমে পড়ল ঝাঁ-চকচকে রুপালি বেন্টলি মিউলস্যান। অপেক্ষাকৃত সরু পথে গ্রাম্য এলাকার মাঝ দিয়ে চলেছে।

যে-কেউ বলবে গাড়িটা আলট্রা-লাক্স সেডান। পাঁচ শ' হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন। নামকরা ব্রিটিশ অটোমেকারের নতুন ফ্ল্যাগশিপ। জাপানি গাড়ির তুলনায় মিউলস্যান আকারে বড়। আদুরে শিশুর মতই সুন্দর, ফোলা ডিযাইন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ গাড়ির ডিএনএ এসেছে অ্যাব্রাম্‌স্ ব্যাটল ট্যাঙ্কের কাছ থেকে। যেমন বিলাসবহুল, শক্তিশালী, তেমনি দ্রুতগামী। দাম তিন লাখ ডলার। সাদা, দামি চামড়া ও মেহগনি কাঠের ইন্টেরিয়ার দারুণ নিখুঁত।

এখন পেছন সিটে বসে আছে বিসিআই-এর তুখোড় দুই এজেন্ট মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। যেন উড়ে চলেছে বিমানে চেপে। নেই সামান্যতম আওয়াজ। চারপাশ নীরব। যে-কেউ ভাববে, সে আছে আরামদায়ক দোলনায়। সিট হেলিয়ে দিতেই রানার পায়ের নিচে উঠে এল ফুটরেস্ট।

রানার দেখাদেখি সিট নামিয়ে হেলান দিল সোহেলও, মাথার পেছনে দু'হাত। 'বুঝলি, কপাল খারাপ, বিপজ্জনক মিশনে যাচ্ছি, নইলে আরামসে ঘুরে বেড়াতাম এই গাড়িতে চেপে।'

টোকিও শহরের সামান্য দূরে বেআইনী এক ক্যাসিনোর দিকে চলেছে ওরা। ওখানে বিপুল অঙ্কের টাকা লেনদেন হবে, জেনেছেন পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরা। তবে তাঁর ইনফর্মার নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেনি, ওই টাকার জন্যে ওখানে যাবে কি না ওরে চিচিওয়া। অবশ্য লোকেশন ও টাইমিং মিলে যাচ্ছে।

ওই ক্যাসিনোয় জুয়া খেলতে যেতে চান বাংলাদেশের মস্ত বড়লোক ব্যবসায়ী মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ, তাই সরকারি ঘুষখোর আমলা ধরে ব্যবস্থা করেছেন হিমুরা। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। তবে পরের কাজটা প্রায় দুঃসাধ্য। ভূত বা ওরের পকেটে ফেলতে হবে ট্র্যাকিং ডিভাইস, সে দায়িত্ব রানা ও সোহেলের।

'কেউ সন্দেহ করলে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবেন না ওখান থেকে,' বললেন হিমুরা। 'কাজেই খুব সাবধান।'

'লাশদুটো যারাই দেখবে, বলতে বাধ্য হবে, দুর্দান্ত সুপুরুষ ছিল দুই যুবক,' হাসল সোহেল। 'তবে আমরা মরলে ওই ক্যাসিনোর কর্তৃপক্ষ বা খুনিরাও প্রাণে বাঁচবে না।'

'ওরা ভয়ঙ্কর,' বললেন পুলিশ সুপার। 'টোকাও পড়বে না ওদের গায়ে।'

রানা ও সোহেল জানে, ওদের মৃত্যু হলে ক'দিন পর ওই ক্যাসিনোয় ঢুকবে বাঙালি ক'জন যুবক। দায়ী লোকগুলোকে খুন করে হারিয়ে যাবে কোথাও। জাপানি পুলিশ বা অন্য কোনও সংগঠন জানবে না কোথা থেকে এসেছিল তারা, গেছে কোথায়।

সোহেলের দামি পোশাক দেখল রানা। দৌড়বিদের মত শরীরে খাপে খাপে বসে গেছে আরমানির সিল্ক সুট। সরু ল্যাপেল। ভেতরে মেরুন রঙের শার্ট। চকচক করছে ক্লিন শেভ্ড্ মুখ। দুর্দান্ত সাহসী এক হাসিখুশি যুবক।

রানার পরনে ডাবল ব্রেস্টেড সাদা ডিনার জ্যাকেট।

কলারটা সিল্কের। সাদা শার্টের গলায় ছোট্ট বাউ টাই। ও-ও ক্লিন শেভ্‌ড্। ক্রু-কাট কালো চুল।

নরম সুরে জানতে চাইল রানা, 'নিয়ন সাইন আর কত দূরে?'

পুলিশ সুপার হিমুরার পরনে বড়লোকের ড্রাইভারের পোশাক। ড্রাইভিং সিট থেকে ঘুরে দেখলেন রানাকে। 'আর বড়জোর পাঁচ মিনিট। আবারও বলছি, মস্ত বিপদ হতে পারে। ঝুঁকিটা না-ও নিতে পারেন। আগেই বলেছি, রক্তারক্তি না করে ওখানে ঢুকতে পারবে না পুলিশবাহিনী। সরকারের হর্তাকর্তারা চাইবেন না তেমন কিছু হোক।'

'আমরা ঝামেলায় জড়াব না,' বলল রানা, 'আপনি যা বলেছেন, তাতে মনে হয়েছে খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওই ক্লাব। ওরে নিজেও সশস্ত্র থাকবে না।'

'আগ্নেয়াস্ত্র বা ছোরা ছাড়াও হাজার পথে খুন করতে পারে ওই লোক,' বললেন হিমুরা। 'খুন-জখম তার কাছে শিল্প। মনে রাখবেন, ট্র্যাকিং ডিভাইস প্ল্যাণ্টের সময় ভুলেও যেন টের না পায়।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। ওর বুক পকেটে রয়েছে দুটো কয়েন। সফিসটিকেটেড বিকন। ওই একইরকম দুটো আছে সোহেলের কাছে। ওরা ঠিক করেছে, প্রথম সুযোগে প্রেতাত্মার পকেটে ফেলবে বিকন কয়েন। যে লোক টাকা দেবে, তার পকেটেও রাখবে কয়েন। এরপর ভূত আর টাকা সরবরাহকারী ক্লাব থেকে বেরোলেই অনুসরণ করবে ওরা। এবং প্রথম সুযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করবেন উবোনো হিমুরা। যেহেতু লড়াইয়ের সময় সোহেলকে মুখোমুখি দেখেছে ওরে, তাই রানা ভাবছে, চেষ্টা করবে আগেই লোকটার পকেটে কয়েন রাখতে।

'আমরা সতর্ক থাকব,' বলল রানা, 'জরুরি আর কোনও তথ্য?'

'ক্লাবে ঢুকলে মনে হবে খুব নিয়ম মেনে চলছে সব,'

বললেন হিমুরা। 'আমার ইনফর্মার তাদের তালিকায় তুলে দিয়েছে আপনাদের নাম। মিস্টার সোহেলকে তারা চিনবে চিটাগাঙের মস্তবড় জাহাজ বহরের মালিক হিসেবে। আপনি বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এবং বলাবাহুল্য, দু'জনই ঋণখেলাপি। ওয়েব সাইট, ঠিকানা বা ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি শেষ। কেউ চেক করলে খুঁত পাবে না। অতীত জেনে নেবে তারা, তাই মালিকপক্ষ চাইবে আপনারা বসুন জুয়ার টেবিলে। নানা দেশের ক্যাসিনোয় বড় অঙ্কের জুয়া খেলে হেরেও মন খারাপ করেন না আপনারা।'

'মন খারাপ করব কেন,' মৃদু হাসল রানা। পকেট ভরা বড় নোটের বাণ্ডিল। একেকজনের কাছে এখন এক মিলিয়ন ইয়েনের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ, ওদের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে অন্তত দশ হাজার ডলারেরও বেশি। কিন্তু এটা মাত্র শুরু। একবার ওরা হারতে শুরু করলে নিয়ন সাইনের স্টাফরা ধরে নেবে, এই দুই জুয়াড়ি খরচ করবে এর দশ গুণ। সম্মানের চোখে দেখা হবে রানা ও সোহেলকে।

'ক্লাবের কোথায় ওরেকে পাব ভাবছেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলা কঠিন,' বললেন হিমুরা, 'তবে যেমন নিষ্ঠুর লোক, আমি হলে আগে তাকে খুঁজতাম কমব্যাট এরিনায়।'

'বক্সিং?' বলল সোহেল। 'ওটা খুব নিষ্ঠুরতা নয়।'

'হবে মাত্র একটা বক্সিং ম্যাচ,' বললেন সুপার, 'পাঁচ রাউণ্ড। ওটা মূল খেলার আগে গা গরম করে নেয়ার জন্যে। এরপর শুরু হবে রক্তাক্ত লড়াই। ওখানে কাউকে খুন হতে দেখলে অবাক হবেন না। ভুলেও বাধা দেবেন না কাউকে, নইলে ফাঁস হবে আপনাদের কাভার।'

'লড়াই হবে মৃত্যু পর্যন্ত?' জানতে চাইল রানা।

'মৃত্যু পর্যন্ত লড়তে হবে, এমন নয়,' বললেন হিমুরা। 'কিন্তু ব্যবহার করা হবে যেসব অস্ত্র, সেগুলো দিয়ে অনায়াসেই

খুন করা যায় যে-কাউকে। ছুরি, তলোয়ার, চেইন ইত্যাদি। লড়াই চলবে মরণপণ। যারা অন্যায় করেছে ইয়াকুযা সংগঠনের বিরুদ্ধে, বেশিরভাগ সময় লড়তে নামানো হয় তাদেরকেই। সোজা কথাঃ প্রমাণ করো তোমার প্রয়োজন আছে, নইলে মরো! যারা হারবে, তাদের কাউকে হয়তো দেখবেন করুণভাবে মরতে।'

পরের দু'মিনিট পেরোল নীরবতার মাঝে।

সিকি মাইল যাওয়ার পর দু'ফুটি, চওড়া একটা ইঁটের দেয়ালের পাশ দিয়ে চলল ওরা। ওই দেয়াল থেকে ওপরে উঠেছে লোহার দণ্ড দিয়ে তৈরি বারো ফুটি বেড়া। ওরা পৌঁছে গেছে নিয়ন সাইন ক্লাবের বিশাল গেটের সামনে।

সুট পরা সশস্ত্র ক'জন এগিয়ে এল ওদের দিকে। রানা ও সোহেলের ক্রেডেনশিয়াল দেখল তারা। আয়না ব্যবহার করে সার্চ করল গাড়ির নিচে। দুটো কুকুর চারপাশ শুঁকে বুঝল, বিস্ফোরক নেই। এরপর ছেড়ে দেয়া হলো রুপালি বেন্টলি মিউলস্যান গাড়িটাকে।

কারুকাজ করা বাগানের মাঝ দিয়ে গেছে ড্রাইভওয়ে। দু'পাশে অলঙ্কৃত লণ্ঠন। গাছ ভরা চেরি ফুল। বিশাল ক্লাব হাউসের কাছে পৌঁছে দারুণ সুন্দর কাঠের এক সেতুর ওপর উঠল ওরা। নিচে শান্ত জলের কোই পণ্ড।

মেইন বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছুতেই থাকল না চারপাশে জাপানি সংস্কৃতির ছাপ। টিন্টেড কাঁচের তৈরি ফ্যাসাডটা মডার্ন ডিযাইনের, উঠেছে ত্রিশ ফুট। মাঝে মসৃণ কংক্রিটের দুটোতলা। নানান বাঁক নিয়ে দালানের পেছনের দু'দিক গিয়ে মিশেছে ঘন ঘাসে ছাওয়া টিলার বুকে।

'আধুনিক বম শেল্টার,' মন্তব্য করল রানা।

'আল্ট্রা-এফিশিয়েন্ট বিল্ডিং ডিযাইন,' বলল সোহেল, 'মাটি থেকে তাপ নিয়ে ঠিক রাখছে বাড়ির টেম্পারেচার।'

'দেখছেন ক্লাবের ওপর অংশ,' বললেন হিমুরা, 'এটা

তৈরি করা হয়েছে স্টেডিয়ামের মত করে। বৃত্তাকার। মাঝে ফাঁকা জায়গা বা খোঁড়লের মত এরিনা। ওটা মাটির নিচে।'

এরিয়াল ফোটো দেখেছে রানা ও সোহেল। তখনও পুরো তৈরি হয়নি এই ক্লাব। বৃত্তাকার দালান আর পেছনের টিলার মাঝে গভীর খাদ। স্টেডিয়ামের মত এরিনা তৈরিতে বিপুল টাকা খরচ করতে হয়নি এদেরকে।

যে-কেউ বলবে, নিয়ন সাইন ক্লাব বড়লোকদের হোটেল। তবে ওই কাজে ব্যবহার হচ্ছে শুধু ওপরতলা। নিচতলায় রয়েছে বেআইনী সব ব্যবস্থাঃ জুয়া, পতিতালয় ও ড্রাগসের আখড়া। একেবারে নিচে কমব্যাট এরিনা। ওটা সদস্যদের মূল আকর্ষণ। দালানের ভেতরের দিকে যে-কোনও কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাবে মরণপণ লড়াই।

এন্ট্রি ডোর চলে আসতেই গতি কমালেন পুলিশ সুপার। এগিয়ে এল এক ভ্যালে। কিন্তু তাকে হাতের ইশারায় বিদায় করে দরজা পেরিয়ে গাড়ি রাখলেন হিমুরা। 'আশা করি বিপদ হবে না। কয়েনের কাজ শেষ হলে বেরিয়ে যাবেন। আমি থাকব ক্লাবের বাইরে গাড়ি নিয়ে।' নেমে ভাল শোফারের মত পেছন দুই দরজা খুলে দিলেন তিনি।

আগে গাড়ি থেকে নামল রানা, আটকে নিয়েছে কোটের বোতাম। অপেক্ষা করল সোহেলের জন্যে। বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বেরোল অলসভঙ্গিতে।

দু'দরজা আটকে ড্রাইভিং সিটে চাপলেন হিমুরা। রওনা হয়ে গেলেন প্রধান গেটের দিকে।

তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে কাঁচের দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকল রানা ও সোহেল। যে-কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের লবির মতই চারপাশ। মেঝে সাদা মার্বেলের। ছাত থেকে ঝুলছে স্ফটিকের ঝাড়বাতি। বাঁক নিয়ে পেছনের দু'দিকে গেছে বিশাল লবি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দামি, আধুনিক সব আসবাবপত্র। লবির একপাশে পিয়ানো ও বেহালা বাজাচ্ছে দুই গম্ভীর

বাদক। শ্যাম্পেনের গ্লাস ভরা রুপার ট্রে হাতে নানাদিকে চলেছে প্রায় উলঙ্গ, দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরীরা।

'জায়গা মন্দ নয়,' মন্তব্য করল সোহেল, 'কিন্তু জানিস, কপাল মন্দ। নইলে কোনও সুন্দরীর বদলে শালা তুই কেন আমার পাশে!'

'তাও তো তুই পেলি মানুষের সঙ্গ,' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'আমি তো পাচ্ছি বাঁদরের।'

'শালা, বেঈমান! আমি মরলে ঠিকই হু-হু করে কাঁদবি!'

'তোর মরে কাজ নেই, এই পৃথিবীটা স্বর্গের মত ভাল হয়ে গেলে খুশি হবে না কেউ।'

সিকিউরিটি এরিয়ার মাঝ দিয়ে যেতে হলো ওদেরকে। মোবাইল ফোন নিয়ে রাখা হলো ছোট্ট দুটো লকারে। দেয়া হলো লকারের চাবি। ফিরে যাওয়ার সময় মোবাইল ফোন সংগ্রহ করবে ওরা। এরপর এয়ারপোর্টে যেসব ব্যাটারি চালিত যন্ত্র দিয়ে বডি স্ক্যান করা হয়, সেগুলো দিয়ে ওদের আগাপাছতলা দেখা হলো। রানার পাশে বিপবিপ করে উঠেছে স্ক্যানার। পকেট থেকে কয়েন ট্র্যান্সমিটার বের করে সিকিউরিটি গার্ডের নাকের কাছে ধরল রানা।

মুচকি হাসল লোকটা।

ওই কয়েন পাঁচ ইয়েন-এর। হলদেটে। মাঝে ফুটো। জাপানের সব জায়গায় ওটাকে ধরে নেয়া হয় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। বহুবার দেখেছে গার্ড। পাঁড় জুয়াড়ীরা নিজেদের কাছে রাখে।

'কপাল খুলবে,' গার্ডের দিকে একটা কয়েন বাড়িয়ে দিল রানা।

লোকটা মাথা নাড়ল। নেবে না।

আবারও পকেটে ট্র্যান্সমিটার রাখল রানা। সিকিউরিটি চেক শেষ হতেই পৌঁছে গেল কাছের হোস্টেসের সামনে। ট্রে থেকে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে মিষ্টি হাসল মেয়েটার উদ্দেশে।

ঘুরে তাকাল চারপাশে।

ক'মুহূর্ত পর ওর পাশে পৌঁছুল সোহেল। 'এবার বল্ তো কী করব? আলাদা হয়ে খুঁজব ড্রাগনের কামড় খাওয়া গাধাটাকে?'

মাথা দোলাল রানা। বামদিক দেখাল। 'আমি যাব ওদিকে। ঘুরে দেখব প্রতিটা তলা। একসিট কোথায় সেটা দেখে রাখবি। দরকার হলে যেন সটকে পড়তে পারি। একঘণ্টার ভেতর দেখা না হলে ফিরব পিয়ানোর সামনে। মন খুলে খরচ কর্। যত জলদি ডুবে যাবি ঋণে, দ্রুত আমাদেরকে দেবে লড়াইয়ের এরিনায় প্রথম সারির সিট।'

ভিড়ে চোখ বোলাল সোহেল। 'ঠিক আছে, পয়সা ওড়ালেই ভিড়ে যাবে অনেকে।'

লবির চারপাশ দেখল রানা। ওরে ওরফে প্রেতাত্মাকে চেনে না। কোথাও কারও তাড়াহুড়ো নেই। শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে ধীর পায়ে বামে চলল রানা।

আঙটি আকৃতির প্রকাণ্ড দালানে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সোহেল। দেয়ালে ঝুলন্ত নানান শিল্প দেখে মুগ্ধ, এমন ভঙ্গি করে গোপনে চোখ রাখছে চারপাশে। ও নিজে ছাড়া আর কেউ দেখেনি ওরে চিচিওয়াকে। রানাকে তার মুখের বর্ণনা দিয়েছে সোহেল। কিন্তু তাকে চট্ করে চিনে ফেলবে রানা, সে সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ওপরতলা ঘুরে দেখল সোহেল। দালানের ভেতর দিকে মেঝে থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত কাঁচের দেয়াল। ওখানে গিয়ে কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তাকাল ও। অন্তত চারতলা নিচে বৃত্তাকার কমব্যাট এরিনা। ছাতে গেঁথে রাখা ধাতব রিগিং থেকে ঝুলছে অসংখ্য ফ্লাডলাইট। গাদাগাদা বৈদ্যুতিক তারের পাশে একটা ক্যাটওঅক।

নিভিয়ে রাখা হয়েছে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফ্লাডলাইট।

এরিনা ঘিরে সারি সারি আরামদায়ক সিট।
কেউ নেই আশপাশে।
অন্য কোথাও খুঁজতে হবে নরাধম প্রেতাত্মাকে।

একতলা নিচে ক্যাসিনোয় পৌঁছে দ্বিতীয় গ্লাস শ্যাম্পেন নিল রানা। কোথাও নেই জ্বরে আক্রান্ত কোনও লোক। এবার দু'হাতে ওড়াবে জাপানিস ফেডারেল পুলিশের দেয়া ইয়েন।

বড় দানের কয়েকটা ব্ল্যাক জ্যাক টেবিল পাশ কাটাল রানা। চোখ খুঁজছে ক্র্যাপ্স্ গেম। ওখানে থাকবে জুয়াড়ীদের ভিড়। কিছু দূর যেতেই একদিকে দেখল, পুরনো আমলের জুয়ার মেশিন। ঘুরছে রুপালি ভারী বল। শব্দ তুলছে ঠং-ঠং। কেউ জিতলে দপ-দপ করে জ্বলছে নিয়ন বাতি। যারা ওখানে আটকে গেছে, এমন দৃষ্টিতে মেশিন দেখছে, যেন ওখানেই আছে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যের সমাধান। ওর দিকে কারও নজর নেই, সবার চেহারা দেখে নিল রানা।

'প্যাচিনকো?' পরামর্শের সুরে বলল কেউ।

ঘুরে তাকাল রানা।

খোলা একটা মেশিনের দিকে ইশারা করছে দুর্দান্ত এক সুন্দরী।

'আরিগেটো,' ধন্যবাদ দিল রানা, 'তবে আপাতত নয়।'

প্যাচিনকো হল পেরিয়ে পাইগাউ পোকার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল রানা। ডিলারের দিকে এক মিলিয়ন ইয়েন দিতেই পেল স্বচ্ছ একগাদা চিপ্স্। বেশিরভাগ ঠেলল ব্যাটের ডানে। ঝড়ের বেগে এল তাস।

'নাইন,' রানার দিকে তাকাল সুন্দরী ডিলার। কয়েকটা তাস বাটার পর ওর রাখা চিপসের পাশে জমল আরও বেশ কিছু চিপ্স্।

মৃদু হাসল রানা। টেবিল থেকে সরাল না চিপ্স্। অপেক্ষা করছে পরের তাসের জন্যে। এবার পেল ন্যাচারাল নাইন।

এই খেলায় ওটা সেরা তাস। হারাতে পারবে না কেউ। ডিলারের হাতে একটা আট। এক কম বলে হেরে গেছে সে। রানার চিপসের পাহাড় হয়ে উঠল উঁচু।

হারতে বসে হুড়মুড় করে জিততে শুরু করেছে রানা। অন্যদিকে বেট সরিয়ে অনেকগুলো চিপ্ বাজি রাখল ডিলারের ওপর। আসলে প্রতিযোগিতা করছে নিজের সঙ্গেই। পেল একটা চার। ডিলারের হাতে সাত। টেকনিকালি জিতেছে ডিলার, কিন্তু তাতে চিপসের ভাগ পেল রানা।

দ্বিগুণ হয়েছে ওর চিপ্স্। ওগুলো ওর দিকে ঠেলে দিল ডিলার। 'টেবিল লিমিট,' বলল সে। তিন দানে রানা পেয়েছে বাড়তি আট মিলিয়ন ইয়েন।

চিপসের পাহাড়ের দিকে তাকাল রানা। বিরক্ত হয়ে ভাবল, কপাল কাকে বলে, যখন জিততে চাই, হাজির হয় বাজে তাস, আর এখন হারতে চাইছি প্রাণপণে!

ছোট-বড় দানে খেলতে লাগল রানা। ভাবছে, দেখা যাক ভাগ্য মন্দ করা যায় কি না। প্রতি দানে মোটা অঙ্কের ইয়েন উপহার দিতে লাগল ডিলারকে। পরের দানের তাস হাতে পেতেই রানা টের পেল, কাঁধে টোকা দিয়েছে কেউ। নখ ম্যানিকিয়োর করা। ঘুরে তাকাল রানা। প্যাচিনকো লাউঞ্জের সেই সুন্দরী। প্যাচিনকো হল থেকে চলে এসেছে পিছু নিয়ে।

'আপনি খুব ভাগ্যবান,' বলল ডিলার মেয়েটা।

মৃদু হাসল রানা। চারপাশে চাউর হয়েছে, দারুণ কপাল নিয়ে এসেছে এক লোক।

'ভালই লাগছে খেলা,' বলল রানা। সুন্দরীর জন্যে ওর দিকে মনোযোগ কম দেবে সবাই। কমবে বিপদ। তা ছাড়া, মিশে যেতে পারবে অন্যদের সঙ্গে। চোখ রাখতে পারবে সবার ওপর।

পরের দানে হারল রানা, খুশি। কিন্তু এরই ভেতর যা পেয়েছে, সেসব হেরে তারপর ধার নিতে সময় লাগবে।

নতুন বাজি ধরল রানা। চোখ ঘুরছে ঘরের চারপাশে। কোথাও নেই ওরে চিচিওয়া। কিছুক্ষণ পর একটু দূরের এক টেবিলে দেখল একজনকে। সে আছে পিট বসের সামান্য আড়ালে। তবে ওই মুখ ভুলবে না রানা। আরও নিশ্চিত হতে ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে চোখ কুঁচকে মেয়েটাকে দেখল রানা।

'স্যর, আপনি আবারও জিতেছেন,' বলল ডিলার।

'তাই?' বিড়বিড় করল রানা। দেখছে পিট বসের পাশের মেয়েটাকে।

মাস্টার শিমেযুর সেই তরুণী বডিগার্ড!

পরনে এখন অভিজাত পোশাক, হাতে সরু সিগার।

রানা বুঝে গেল, হাতের তাসের ওপর দিয়ে চারপাশে চোখ রেখেছে হিনা। ক্যাসিনোয় তার উপস্থিতির কারণে যে-কোনও সময়ে মহাবিপদে পড়বে সোহেল আর ও!

আঠারো

নিয়ন লাইট ক্লাবের ওপরতলায় প্রাইভেট সুইটে দাঁড়িয়ে আছে বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটন। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত কাঁচের দেয়াল ভেদ করে দেখছে নিচতলার লড়াইয়ের এরিনা। ওখানে জড় হচ্ছে একদল দর্শক। নিজেও হুয়াং খুশি হবে লড়াই দেখতে পেলে। কিন্তু আগের কাজ আগে। চুকিয়ে দিতে হবে ওরে চিচিওয়ার প্রাপ্য।

ঘুরে খুনির দিকে তাকাল লো হুয়াং। তার মনে হলো অসুস্থ বোধ করছে লোকটা। 'তুমি ঠিক আছ তো, ওরে? নাকি

এটাই তোমার ছদ্মবেশ?'

'আহত ছিলাম, মাত্র সুস্থ হয়ে উঠছি,' বলল প্রেতাত্মা। 'সেজন্যেই চাই আরও টাকা।'

কথা শেষ হতে না হতেই ভীষণভাবে শিউরে উঠল সে। চেহারা বিকৃত হলো রাগী বুলডগের মত। তিরতির করে কাঁপছে ডান গাল। কাঁচা হলুদের মত হলদে চোখ। ঘামে চকচকে ত্বক।

তাকে ছোবল তোলা গোখরা বলে মনে হলো লো হুয়াঙের। নরম সুরে বলল, 'একটু পর পাবে প্রাপ্য টাকা। নতুন কাজও নিতে পারো হাতে। তাতে পাবে এর দশ গুণ টাকা। দায়িত্ব বেশি হলেও ঝুঁকি সে কাজে অনেক কম।'

'শালার গুষ্ঠি মারি তোমার কাজের,' ঘেউ করে উঠল ওরে। 'গত কাজটা করতে গিয়ে মরেই যাচ্ছিলাম। এবার টাকা দিয়ে দাও। চলে যাব।'

'লুকিয়ে পড়ে সুবিধা হবে না তোমার,' বলল লো হুয়াং।

'কী বলতে চাও?'

'ওই দুর্গে ছিল এমন একজনের কাছ থেকে তোমার চেহারার বর্ণনা পেয়েছে ফেডারেল পুলিশ,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'সহজেই খুঁজে বের করবে। আর তখন শত শত খুনের দায়ে দেরি না করে ঝুলিয়ে দেবে তোমাকে।'

'ক্-কী? তুমি তা হলে বলে দিয়ে...'

'আরে, আমি কেন বলতে যাব? বুঝতে পারছ না যে, তোমার কাছে সাহায্য চাইছি!'

'তা হলে ওরা জানল কী করে?'

'তুমি নিজেই তো বলেছ, বেঁচে গেছে কেউ কেউ।'

অপমানে লাল হলো ওরের গাল। পরক্ষণে রাগ ও অসুস্থতার জন্যে হয়ে গেল ফ্যাকাসে।

'এবার শোনো আমার কথা, ওরে,' বলল হুয়াং, 'বাকি জীবন চোরের মত লুকিয়ে বেড়ালে শেষে তোমাকে ফকির

হতে হবে। অথচ, তোমার যা যোগ্যতা, থাকার কথা রাজার হালে। আর সেই টাকা দেয়ার কথাই বলছি। তাতে নতুন করে শুরু করতে পারবে জীবন। থাকবে নতুন পরিচয়। কেউ জানবে না আগে কে ছিলে তুমি।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল লো হুয়াং। দু'আঙুলের ফাঁকে রেখে বাড়িয়ে দিল ওরের দিকে।

ক'সেকেণ্ড দ্বিধা করে ছোঁ মেরে কাগজটা নিল জাপানি খুনি। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল, আঁকা হয়েছে ওরই চেহারা। ঠোঁটের ওপরে পুরনো ক্ষত। নিচে উল্কির ড্রইং। একদম ওরটার মতই!

রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল ওরে। ফড়াৎ করে টেনে ছিঁড়ল কাগজটা। ওটা মুচড়ে ছুঁড়ে মারল লো হুয়াং লিটনের মুখ লক্ষ্য করে।

স্বাভাবিক চেহারায় কাঁধ ঝাঁকাল চিনা বিলিয়নেয়ার। 'পুলিশের কাছে ওটার কপি আছে।'

'তাতে কিছুই যায় আসে না।'

'যায় আসে, ভাল করেই জানো তুমি,' কড়া সুরে বলল হুয়াং, 'অর্থাৎ, তোমার সময় শেষ। প্রেতাত্মা হিসেবে বেশি দিন টিকবে না আর। লুকিয়ে পড়তে হবে চোরের মত। তারচেয়েও খারাপ কথা, নেই তোমার কোনও বন্ধু। কেউ সাহায্য করবে না। শেষ ভাড়াটে খুনির জীবন। একাকী মরবে কোথাও। আমি কিন্তু তোমাকে দিতে চাই নতুন সুযোগ। সে সুযোগটা নেবে কি না, তা তোমার ব্যাপার। যদি একটা কাজ নাও, এমন ব্যবস্থা করব, আইন ছুঁতে পারবে না তোমাকে।'

'কী কাজ? সোনার বাসনে এনে দিতে হবে কারও কাটা মাথা?'

'যে ফাঁস করেছে তোমার ছবি, তাকে নিজের স্বার্থেই খুন করবে তুমি,' বলল বিলিয়নেয়ার। 'তবে আমি জানতে চাই হারিয়ে যাওয়া এক তলোয়ারের তথ্য।'

'তলোয়ার?'

'নিশ্চয়ই শুনেছ হঞ্জো মাসামিউনের কথা?'

'অবশ্যই,' বলল ওরে, 'জাপানের সবচেয়ে নামকরা তলোয়ার। ...তো? ওটা তো হারিয়ে গেছে আজ থেকে বহু বছর আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে। ধরে নেয়া হয় ওটা চুরি করেছে আমেরিকানরা, অথবা...'

'ওসব ভুল কথা,' বলল লো হুয়াং, 'আসলে কী হয়েছে ভাল করেই জানি। যুদ্ধের শেষে আমেরিকান সেনাবাহিনী নির্দেশ দিয়েছিল, যাতে সব অস্ত্র তাদের কাছে জমা দেয় জাপানিরা। এমন কী বাদ দেয়া চলবে না আনুষ্ঠানিক তলোয়ারও। তাতে রেগে গেল ধনী জাপানিরা। ঠিক করল লুকিয়ে রাখবে বাপ-দাদার অস্ত্র। কিন্তু জাপানের ভবিষ্যৎ ভেবে আমেরিকানদের সঙ্গে হাত মেলালেন ইয়েমাসা টোকাগায়া। নইলে সর্বনাশ হতো এ দেশের। ঠিক হলো, অস্ত্র আমেরিকানদের হাতে তুলে দেবেন তিনি। সেগুলোর ভেতর ছিল বিখ্যাত চোদ্দটা তলোয়ার। হঞ্জো মাসামিউনেও ছিল। ঠিক হলো, টোকিও পুলিশ স্টেশনে জমা হবে এসব তলোয়ার। পরে গোল্ডি বিলমোর নামের এক সার্জেন্ট সংগ্রহ করল ওগুলো। হারিয়ে গেল চোদ্দটা তলোয়ার। আর দেখা গেল না কোথাও। কেস খতম। কিন্তু আমেরিকানদের রেকর্ড অনুযায়ী: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপানে গোল্ডি বিলমোর নামে তাদের কোনও সৈনিক, নাবিক বা বিমানবাহিনীর কেউ ছিল না।'

'তার মানে মিথ্যা বলেছে কেউ,' বলল ওরে।

'ঠিক,' বলল হুয়াং, 'কিন্তু মিথ্যা বলল কে? আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে মনে হচ্ছে আমেরিকানদের কাঁচকলা দেখিয়ে ওগুলো আগেই সরিয়ে ফেলেছিল কেউ।'

চোখ সরু করে বিলিয়নেয়ারকে দেখল ওরে।

বড়শিতে গেঁথে গেছে হাঙর, বুঝল হুয়াং। এবার খেলিয়ে

তুলতে হবে ডাঙায়। জাপানের অত্যন্ত সম্মানের অস্ত্রগুলো রয়ে গেছে এ দেশেই, অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে চাইছে খুনি লোকটা। জাপানের সব তলোয়ারবাজ স্বপ্ন দেখে, একবার নিজ হাতে নেবে হঞ্জো মাসামিউনে! এভাবেই পেইন্টাররা স্পর্শ করতে চায় পিকাসো বা ভ্যান গগের ছবি। স্কাল্পটাররা ধরতে চায় মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডের হাত। অথচ কোনওটাই থাকে না হাতের নাগালে। কিশোর বয়স থেকেই অস্ত্র আর ঠাণ্ডা লোহা নিয়েই কারবার ওরের। যদি ছুঁতে পারে হঞ্জো মাসামিউনে, সেটা হবে ওর জীবনের সেরা প্রাপ্তি।

'কী ধরনের তথ্য পেয়েছ তুমি?'

'হাউস অভ পিয়ার্সে অভিজাত সবাইকে গোপন এক প্রতিজ্ঞা করান টোকাগাওয়ার পরিবার। আর সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে তাঁদের হয়ে কাজ করেন ইয়েমাসা টোকাগায়া। তাঁদের গল্প কিন্তু অন্যরকম।'

'বলতে থাকো।'

'ইয়েমাসা টোকাগায়া চান আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলেমিশে চলতে, কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্যরা খুশি ছিলেন না। তাই তৈরি করেন নকল তলোয়ার। একেবারে শেষসময়ে এটা টের পেলেন ইয়েমাসা, ফলে পরিবারে তৈরি হলো গৃহযুদ্ধের পরিবেশ। নিজেরা লড়াই করে খুন হলেন ক'জন। তখন ইয়েমাসা বুঝলেন, এসব তলোয়ার যে শুধু বংশের গর্ব, তা নয়, গোটা জাপানের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীক। ভবিষ্যতে হয়তো আবারও মাথা তুলে দাঁড়াবে জাপানিরা। তাই তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন, আবারও যুদ্ধের কথা ভাবলে শিউরে ওঠেন তিনি। তবে জাতীয় এসব তলোয়ার দেশের মানুষের কাছে থাকাই উচিত। লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। যাতে ওগুলোর কারণে আবারও যুদ্ধের ডাক দিতে না পারে এ জাতি। তাঁর এই চিঠি পাঠিয়ে দেয়া হলো হাউস অভ পিয়ার্সে। ফলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পথেই গায়েব হলো তলোয়ার। বদলে রাখা

হয় চোদ্দটা নকল। তাতে বোকা বনল না কেউ। তবে প্রচার করে দেয়া হলো আমেরিকান সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট গোল্ডি বিলমোরের কাহিনী।'

'আর কোথায় গেল এসব তলোয়ার?' জানতে চাইল ওরে।

'টোকাগায়ার চিঠি পেয়ে দূরের এক মন্দিরে ওগুলো লুকিয়ে রাখলেন এক শিনটো যাজক।'

খুব বিরক্ত হলো প্রেতাত্মা। 'যুদ্ধের অস্ত্র গেল সাধুর হাতে? ছিহ্!'

'এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

'কোন্ মন্দিরে? কোথায়? জাপানে তো হাজার হাজার মন্দির।'

বড় করে দম নিল লো হুয়াং লিটন। 'কখনও প্রকাশ করা হয়নি কোন্ মন্দিরে আছে এসব তলোয়ার। তবে সে সময়ে টোকাগায়া পরিবার বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত ফুজি মাউন্টেনের টিলাময় এলাকায় একটা মন্দিরকে। খুব গোপন মন্দির। নিজেরা তো আর রাখতে পারতেন না, তাই অমন জায়গাতেই রেখেছেন জাতীয় অমূল্য সম্পদ। তলোয়ার তুলে দেয়া হয়েছে মন্দিরের সাধুদের হাতে, যাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে স্রষ্টার।'

মাথা দোলাল ওরে। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। 'পরে কেন প্রকাশ পেল না এই তথ্য? আজও হঞ্জো মাসামিউনের জন্যে পাগল হয়ে আছে একদল লোভী ট্রেযার হান্টার।'

'আমি দেখেছি এমন এক রেকর্ড, যেটার কথা জানে না বেশিরভাগ মানুষ,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'সরকারি রেকর্ড। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালে জাপানি গোয়েন্দারা ধারণা করে, কোথায় আছে এসব তলোয়ার। কিন্তু তখন পুরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে জাপান আমেরিকার ওপর।'

শ্যাম্পেনের গ্লাস নিল হুয়াং। 'ওয়াশিংটনের দেয়া ঋণ

নিয়ে নতুন করে দেশ গড়ছে জাপান সরকার। হুড়মুড় করে আমেরিকায় বিক্রি হচ্ছে জাপানের তৈরি জিনিসপত্র। রপ্তানির সুযোগ পেয়ে জাপানি সমাজে গজিয়ে উঠেছে নতুন ধনিক শ্রেণীর ব্যবসায়ী। এদিকে রাশান ভালুক বা চিনা ড্রাগন থেকে দেশটাকে আগলে রেখেছে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ, রণবিমান ও হাজার হাজার সৈনিক। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে চুপ মেরে গেল সরকার। কোনওভাবেই নষ্ট করা চলবে না আমেরিকা আর জাপানের বর্তমান সম্পর্ক। এসব তলোয়ার পেলে হঠাৎ গজিয়ে উঠবে জাপানি জাতীয়তাবোধ। গোটা দেশটাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে শোগান পরিবারগুলো। তা ছাড়া, টোকাগায়া পরিবারকে না জড়িয়ে তলোয়ার উদ্ধার করার উপায় নেই। কাজেই চুপ করে থাকল জাপান সরকার। আমলাদের লাখো ফাইলের নিচে চাপা পড়ল হঞ্জো মাসামিউনে আর অন্যসব স্বনামধন্য তলোয়ার। মুছে ফেলা হলো প্রতিটি তথ্য ও প্রমাণ।'

'তুমি জেনে বলছ তো?' জানতে চাইল ওরে।

'পুরোপুরি নিশ্চিত নই,' বলল হুয়াং, 'তবে এসব তলোয়ার সাধুদের কাছে না থাকলে, ধরে নিতে পারো আর কখনও পাওয়া যাবে না। তলোয়ারের সঙ্গে রয়ে গেছে একটা ডায়েরি। ধারণা করা হয়, ওটা এসেছে মাসামিউনে আর তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছ থেকে। ওটায় লেখা আছে, কীভাবে মেশাতে হবে ধাতু। নইলে তৈরি হবে না ও ধরনের তলোয়ার।'

কথাটা মেনে নিয়েছে ওরে। তাতে হুয়াং উঠেছে আরও সতর্ক। 'আগে তো শুনিনি তুমি তলোয়ার কালেক্ট করো? হঠাৎ এত আগ্রহ কেন?'

'তোমার প্রশ্নের জবাব দেব না,' গম্ভীর মুখে বলল লো হুয়াং, 'তবে ধরে নাও, আমি চাই আমেরিকান খপ্পর থেকে বেরিয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করুক আমার মায়ের

দেশ। আর তার ফলে কল্পনাও করতে পারবে না, কত টাকা পাবে তুমি। নতুন করে সাজিয়ে নেবে জীবন। চিরকালের জন্যে মাফ করে দেয়া হবে তোমার সব অপরাধ।'

'চাপা মারার আর জায়গা পাও না,' বিরক্ত হয়ে বলল ওরে। 'আগে যে টাকা পাই, সেটা দিয়ে দাও, বিদায় হই।'

কাঁধ ঝাঁকাল লো হুয়াং লিটন। বলে দিয়েছে যা বলার। পকেট থেকে নিল ছোট একটা ডিস্ক। ওটা ক্যাসিনোর চিপের চেয়ে একটু বড়। ব্রাসের। অষ্টভুজ। ওজনে বেশ ভারী। একদিকে খোদাই করা ড্রাগন, অন্যদিকে সংখ্যা।

'তোমার প্রাপ্য,' বলল বিলিয়নেয়ার। 'এই ক্যাসিনোর যে-কোনও টেবিলে গিয়ে এটা দেখালে যে-কোনও অঙ্কের চিপ্ দেবে তারা। খেলতে পারো যত খুশি। অথবা এটা নিয়ে চলে যেতে পারো অ্যাকাউন্ট সেকশনে। তুমি চাইলে ওরা দেবে আমেরিকান ডলার বা ইউরোপিয়ান যে-কোনও দেশের ব্যাঙ্ক নোট। যেগুলো বেশি চলে, বড় অঙ্কের নোট নিলে বয়ে নেয়া সহজ হবে। তবে, পরে যদি মনে হয় ভুল করেছ, ডিস্কের ওসব সংখ্যায় ফোন দেবে আমাকে। সেক্ষেত্রে নতুন চুক্তির জন্যে আলাপ করব আমরা।'

জানালার পাশের টেবিলে ডিস্ক রাখল লো হুয়াং লিটন।

সামনে বেড়ে সোনালি চাকতি নিল ওরে। মনে মনে বুঝতে চাইছে প্রস্তাবের ওজন। লোকটার কথা সত্যি হলে তা দারুণ লোভনীয় একটা ব্যাপার। রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল। জীবনটা আপাতত সত্যিই অন্ধকারময় মনে হচ্ছে তার।

একবার হুয়াংকে দেখল প্রেতাত্মা। তারপর জানালার কাঁচ ভেদ করে তাকাল নিচে। বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। ফিসফিস করে বলল, 'আরে, শালা! দাঁড়া!'

'তোমাকেই ঠিক করতে হবে কী করবে।'

কিন্তু হুয়াঙের প্রস্তাব নিয়ে ভাবছে না ওরে। সোজা চেয়ে আছে একতলা নিচে একজনের দিকে। 'না, ওই শালা এল

কোত্থেকে!'

লো হুয়াং লিটনকে পাশ কাটাবার সময় টেবিল থেকে ওয়াইনের গ্লাস তুলে বাড়ি মেরে ওটার বাউল ভেঙে নিল উন্মাদটা। মামাত ভাইকে থামাবে ভেবেও পরক্ষণে সতর্ক হলো বিলিয়নেয়ার। প্রেতাত্মাকে ঠেকাবার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

ডিস্ক পকেটে পুরেই ঝড়ের বেগে সুইট ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরে চিচিওয়া। পেছনে দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা।

উনিশ

পুরো একঘণ্টা ঘুরে ক্লাবের চারপাশ বুঝে নিয়েছে সোহেল, এখন ফিরছে পিয়ানোর অ্যালকোভের দিকে। আপাতত কোথায় যেন গেছে পিয়ানিস্ট। একাই সবাইকে মুগ্ধ করতে চাইছে বেহালাবাদক।

আশপাশে কোথাও রানাকে দেখল না সোহেল। সুন্দরী এক ওয়েট্রেসের কাছ থেকে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে বসল লাউঞ্জ চেয়ারে। ভিড়ের দিকে পিঠ, কিন্তু পিয়ানোর চকচকে গা থেকে আসছে পেছনের প্রতিবিম্ব। ওদিকে না চেয়েও সবই দেখছে ও।

কেউ পাশ কাটাবার সময় দেখে নিচ্ছে মুখ। আশা করছে যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবে রানা। কিন্তু একমিনিট পর অন্য কাউকে দেখল সোহেল। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওর দিকেই আসছে লোকটা। হাতে কী যেন!

ধরা পড়েছে, বুঝল সোহেল। চেয়ার ছেড়ে না উঠে শান্ত রাখল নিজেকে। কাছে পৌঁছে গেছে খোদ শয়তানের মত দেখতে জাপানি। একেবারে শেষসময়ে চেয়ারে কাত হয়েই ওরে চিচিওয়ার মুখে গ্লাসের শ্যাম্পেন ছুঁড়ল সোহেল। অন্ধ হয়েছে জাপানি আততায়ী। ভাঙা গ্লাস সাঁই করে নামাল সোহেলের ঘাড় লক্ষ্য করে। কিন্তু একপাশে সরে চেয়ারের পুরু ফোমে গেঁথে গেল ও। তাতে রক্ষা নেই, ডানহাতে ওর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে হেডলক করল ওরে। সোহেলের উন্মুক্ত গলা লক্ষ্য করে নামল গ্লাস।

কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

কেউ কেউ পিছিয়ে গেছে কয়েক পা।

পেছন থেকে হামলা করেছে লোকটা। বিপদে পড়েছে সোহেল, দু'হাতে সরাবে ওরেকে, সে উপায় নেই। কিন্তু ওর প্রতিক্রিয়া নিখুঁত। বাম বাহু তুলে ঠেকিয়ে দিল ভাঙা গ্লাসের কাঁচের ছোরা। টাইটেনিয়াম বাহুতে লেগে আরও ঠুঁটো হলো ওটা। একইসময়ে ওরের কবজি ধরে অন্যহাতে ঘাতকের মাথার তালুর ওপর নামাল শ্যাম্পেনের গ্লাস।

কাঁচ ভাঙতেই ওরের কালো চুলের অরণ্য থেকে দরদর করে নামল রক্ত। প্রচণ্ড রাগে চিৎকার ছাড়ল আততায়ী। সোহেলের হাত থেকে ঝটকা দিয়ে ছুটিয়ে নিল হাত। এবার কণ্ঠনালীতে গাঁথবে অর্ধেক ভাঙা গ্লাস। কিন্তু তার চেয়ে অনেক দ্রুত সোহেল। ওরেকে নিজের দিকে টান না দিয়ে গ্র্যাণ্ড পিয়ানোতে পা বাধিয়ে নিজেই ছিটকে গেল পেছনে।

চেয়ারের ওপরের অংশ গুঁতো দিল ওরের পেটে। টলমল করে পেছাতে গিয়ে চিত হয়ে আছাড় খেল লোকটা। খটাং শব্দে মেঝেতে পড়েছে চেয়ার। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে ছেড়ে দেয়া বাঁকা স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়াল সোহেল। ওর বাম পায়ের লাথি লাগল ওরের চোয়ালে। প্রেতাত্মার হাঁ করা মুখ থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত ও লালা।

কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাপানি ঘাতক। জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করেছে রক্তাক্ত ঠোঁট।

চোখে চোখ রেখে হাতের ইশারায় কুকুরকে ডাকছে এমন সুরে বলল সোহেল, 'আ-আ চু-চু!'

ষাঁড়ের মত তেড়ে এল চিচিওয়া। সোহেল ভেবেছিল ল্যাং মেরে মেঝেতে ফেলবে তাকে। কিন্তু গরিলার মত ওকে জড়িয়ে ধরল ঘাতক। মেঝেতে হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন। ওপরে পড়েছে আততায়ী। কিন্তু গড়ান দিয়ে তার বুকে উঠে এল সোহেল। ডানহাতি ঘুষি মারল শত্রুর বাম গালে।

স্লিপার হোল্ডে ধরতে চাইল ওরে, কিন্তু তার পেটে ঠাস্ করে নামল সোহেলের কনুই। মুক্ত হয়ে ভাবতে শুরু করেছে এবার কী করবে, এমনসময় ওকে জাপ্টে ধরল বেশ ক'জন। তুলে নিল চ্যাংদোলা করে। চারপাশ থেকে ছুটে এসেছে ক্যাসিনোর সিকিউরিটি টিম। একই অবস্থা ওরে চিচিওয়ার।

হাত-পায়ের জঙ্গলের মাঝ থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিতে চাইল সোহেল। কিন্তু তখনই ওর পেটে লাগল শক্তিশালী বিদ্যুতের টেইযার। হঠাৎ নিজেকে হালকা মনে হলো ওর।

লবি থেকে সরিয়ে নিচ্ছে ওরে আর সোহেলকে। অবাক হয়ে ওদেরকে দেখছে দর্শকরা। একটু দূরে মস্ত এক হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে বেহালাবাদক।

ঝুলতে ঝুলতে যেতে যেতে ধমক দিল সোহেল, 'আরে, হাঁদা, মুখে গুয়ের নীলমাছি ঢুকবে, মুখটা বন্ধ কর!'

হুঁশ ফিরল বাদকের। সবাইকে শান্ত করতে হাতে তুলে নিল বেহালা।

পেছনের এক করিডোরে এনে বাক্সের ঘরের মেঝেতে ধুপ্ করে ফেলা হলো সোহেলকে। কংক্রিটের চারদেয়ালে কোনও জানালা নেই। দরজা লোহার তৈরি।

'ওই শালা কই?' তিক্ত সুরে জানতে চাইল সোহেল, 'এটা কোনও বিচার হলো?'

জবাব না দিয়ে ধুম্ শব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল সিকিউরিটি টিমের লোকগুলো।

সোহেলের মতই চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওরে চিচিওয়াকে। যারা বন্দি করেছে, জানেও না কাকে ধরেছে। প্রথম সুযোগে এক পা ছুটিয়ে নিয়ে হাঁটু দিয়ে জব্বর এক গুঁতো দিল সে এক গার্ডের পেটে। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ককাতে লাগল লোকটা। তাতে ওরের পিঠে টেইযার ছোঁয়াল আরেক গার্ড। অবশ হয়ে গেল ঘাতক। একটা ঘরে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হলো মেঝেতে। এতে আরও রেগে গেল প্রেতাত্মা। পড়ে থাকল চুপ করে। ভাবছে: দাঁড়া, শালারা, এমন টাইট দেব না... মরার আগে বাপ ডাকবি আমাকে!

কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর উঠে বসল ওরে। ওর চোখ খুঁজছে অস্ত্র, কিন্তু ঘরে তেমন কিছুই নেই। রয়ে গেছে শুধু সোনালি চাকতি। ক্যাসিনোর নামকরা ও সম্মানিত গ্রাহকদের দেয়া হয় এই চিপ।

ওরে চিচিওয়া জাপানি বলেই বোধহয় দরজা বন্ধ করে চলে যায়নি সিকিউরিটির লোক। তার ওপর খুনিটার হাতে এখন সোনালি চিপ দেখে বিস্মিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। নরম হাতে ওরেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল দু'জন মিলে। বসিয়ে দেয়া হলো একটা চেয়ারে।

সিকিউরিটির লোক কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ঘরে ঢুকল দু'জন। প্রথমজন গোখারো নাগিনো। ইয়াকুযার মাঝারি পর্যায়ের নেতা, নিয়ন লাইট ক্যাসিনো ঠিকভাবে পরিচালনা করা তার কাজ। দ্বিতীয়জন বিলিয়নেয়ার লী হুয়াঙ লিটন।

বিশ

প্রায় আসবাবপত্রহীন ঘরে চিচিওয়াকে দেখে রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল ইয়াকুযা নেতা গোখারো নাগিনো। মাঝবয়সী লোক সে, চওড়া দুই কাঁধ, দশ বছরেরও বেশি ইয়াকুযার হয়ে চালাচ্ছে এই ক্লাব; এ সময়ে হতে দেয়নি বড় কোনও ঝামেলা। যারা চেয়েছে বেঈমানি করতে, বা করেছে ঘাড়-ত্যাড়ামি, টোকিও উপসাগরের নিচে সিমেন্ট ভরা ড্রামে এখন শুয়ে আছে তারা। অথচ, আজ যা হলো, উঁচু পর্যায়ের নেতাদের কাছে হেঁট হয়ে যাবে তার মাথা।

খুন নাগিনোর কাছে নতুন কিছু নয়। তবুও জ্বরাক্রান্ত ওরের হলদে চোখ দেখে শিউরে উঠল সে। প্রেতাত্মা সম্পর্কে যা শুনেছে, তার অর্ধেক সত্য হলেও এই লোক জাপানের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খুনি। এমন কী ইয়াকুযা নেতারাও বাধ্য না হলে খুন করে না, অথচ খুনের আগে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করে ওরে চিচিওয়া। তা যে শুধু টাকার জন্যে, তা নয়, কষ্ট দিতে পারলে আনন্দিত হয় সে।

'আমার ক্লাবে ঝামেলা সহ্য করব না,' বলল নাগিনো।

'আমার ধারণা, গোলমালের উপযুক্ত কারণ আছে আমাদের বন্ধু ওরে চিচিওয়ার,' বলল লো হুয়াং।

'আপনার বন্ধু,' শুধরে দিল নাগিনো। 'বেশ কয়েক বছর আগেই সংগঠন থেকে সরে গেছে সে।'

তিক্ততা বোঝাতে মেঝেতে রক্তাক্ত থুতু ফেলল ওরে।

'আবার সংগঠন!' বিড়বিড় করল।

'আমার বোধহয় উচিত তোমাকে রিঙে ঢুকিয়ে দেয়া, যাতে শেষ করতে পারো নিজের কাজ,' বলল নাগিনো।

'তাই করো,' সায় দিল ওরে।

মাঝ থেকে বাধা দিল লো হুয়াং, 'যার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, সে আসলে কে?'

'চিনতে পারোনি?' ফোঁস তুলল ওরে, 'যাদের খুন করতে পাঠালে, তাদেরই একজন সে।'

'এসব কী বলছ তোমরা?' বলল নাগিনো। 'ওই লোক তো বাংলাদেশের জাহাজ ব্যবসায়ী!'

খিঁকখিঁক করে হাসল ওরে। 'কচুর ব্যবসায়ী! ওই লোক এসেছে আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে। খোঁজ নিলে জানবে সে হয়তো সিআইএর এজেন্ট!'

'এজেন্ট? সিআইএ?' খাবি খেল ইয়াকুযা নেতা। 'ওই লোক এখানে এল কেন?'

'আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করতে চাইল লো হুয়াং। 'ওরের কথা ঠিক হলে, এই ক্যাসিনো নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই তার।'

'তা হলে কী চায় সে?'

'ওরেকে চিনে ফেলেছে ওরা। তাই এখানে এসেছে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'ওরা?' বিস্মিত হলো নাগিনো। 'একজনের বেশি?'

'দুর্গের মত এই জায়গায় একা ঢুকবে কে?'

আবারও রেগে গেল ইয়াকুযা নেতা। ওরের দিক থেকে ঘুরে তাকাল লো হুয়াং লিটনের দিকে। 'আপনিই নিয়ে এসেছেন এই বদ্ধ পাগলটাকে। আপনার কারণেই ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। আপনার পিছু নিয়েই এখানে ঢুকেছে ওই লোক। আগে থেকে বলেননি, তাই সতর্ক ছিলাম না। আমার বোধহয় উচিত আপনাদের দু'জনকেই খুন করা।'

‘শুধু ওই লোকটাকে খুন করে ফেলে দাও তোমার কোই পণ্ডে, তাতেই হবে,’ বলল ওরে। ‘আরও ভাল হয় কাজটা আমাকে করতে দিলে।’

‘না,’ মাথা নাড়ল হুয়াং, ‘আগে জানতে হবে লোকটা একা এসেছে কি না।’

‘তা জানা অসম্ভব,’ বলল নাগিনো, ‘স্বাভাবিক কারণেই এই ক্লাবে কোনও ভিডিয়ো ক্যামেরা রাখা হয় না।’

‘ওই লোককে পিটিয়ে ওর পেট থেকে বের করো সব,’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওরে।

নিজ এলাকায় ভয়ানক প্রেতাত্মার প্রকোপ দেখে খুব নাখোশ হয়েছে গোখারো নাগিনো। খুন করতে অতিরিক্ত আগ্রহী লোক এই ওরে। অথচ, দরকার না হলে জল ঘোলা করে না তারা। কড়া গলায় বলল ইয়াকুযা নেতা, ‘ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের দু’জনকেই ক্লাব থেকে বের করে দিই। ওই ব্যাটা যদি তোমার পেছনেই এসে থাকে, তোমাকে বের করে দিলে সে বা তার সঙ্গের অন্যরাও বেরিয়ে যাবে।’

‘সঙ্গে যাবে ক্লাবের অনেক তথ্য,’ বলল লো হুয়াং। ‘শুধু তাই নয়, তাদের কাছে প্রমাণ রয়ে যাবে, কারা আসে আর কী করে। অবাক হব না সব তথ্য পুলিশের কাছে গেলে।’

‘পুলিশ নিয়ে চিন্তা নেই,’ গর্বের সঙ্গে বলল নাগিনো, ‘আজ বিদেশি যারা এসেছে, ঘাড় ধরে সবাইকে বের করে দেব।’

‘আরও ভাল বুদ্ধি দিতে পারি,’ বলল লো হুয়াং। ‘ওই বাদামি বাঁদরটাকে ঢুকিয়ে দিন লড়াইয়ের রিঙে। পারলে বাঁচার চেষ্টা করুক। ছবি তুলে টাঙিয়ে দিন ক্লাবের সব জায়গায়। একা থাকলে দারুণ লড়বে। আর সঙ্গে কেউ এলে, বাঁচাতে চাইবে ওকে। তখন অনায়াসে আপনার লোক ধরবে সে বা তাদেরকে। তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।’

একুশ

একগাদা চিপ্ নিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। টেবিল ঘুরে চলে গেল বিজ্ঞানী শিমেযুর তরুণী বডিগার্ড হিনার পেছনে। নিচু গলায় বলল, 'বলো তো, তোমার মত লক্ষ্মী একটা মেয়ে এখানে কী করছে? নাকি জিজ্ঞেস করে দোষ করে ফেললাম?'

ওর কথা শুনে আড়ষ্ট হয়েছে মেয়েটার পিঠ।

'কার্ড দেব?' জানতে চাইল ডিলার।

জবাব দিল না হিনা।

'কার্ড দেব, মিস?'

'তোমার হাতে ষোলো,' বলল রানা।

ব্ল্যাকজ্যাক খেলছে হিনা। মন দিল খেলায়। হাতের ইশারায় জানাল আরেকটা কার্ড চাই। লাল রাজার কারণে ওর হলো সব মিলিয়ে ছাব্বিশ।

চিপ্গুলো আদায় করে নিল ডিলার।

'খেলা বাদ দাও,' বলল রানা, 'কথা আছে।'

উঠে রানাকে ঘেঁষে রওনা হলো হিনা। একবারের জন্যে চোখে চোখ রাখেনি।

ওর পাশে হাঁটছে রানা। 'আমরা কি আড়ি নিয়েছি?'

'আপনি কিন্তু আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন,' বলল হিনা।

'কীভাবে?'

কড়া চোখে ওকে দেখল মেয়েটা। 'আপনি কীভাবে জানলেন আমি এখানে আছি?'

'ছোট্ট একটা পাখি বলেছে। ...কী করছ এখানে?'

'এটা আমার বাড়ি,' বলল হিনা। 'আবার বলতে পারেন আমার জেলখানা।'

মেয়েটার কনুই ধরে নিজের দিকে ঘোরাল রানা। 'আসলে কী বলতে চাইছ?'

'ছোটবেলায় আমাকে কিনে নিয়েছে ইয়াকুযা সিণ্ডিকেট,' স্পষ্ট উত্তর দিল হিনা। 'জাপানে এটা অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। বহু মানুষ আছে, যারা আসলে ক্রীতদাস। আমি নাগিনোর দাসী, কাজেই যা বলবে, তাই করতে হবে। তবে আমার আছে লড়াই করার ন্যাক। সাত বছর বয়স থেকেই শিখেছি সামুরাই যোদ্ধাদের মার্শাল আর্ট। সুযোগ পেয়ে যোগ দিয়েছিলাম মহান বিজ্ঞানী শিমেযুর দলে। আমাকে মানুষের সম্মান দেন তিনি। তাই ওই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা ফিরেছি এখানে।'

'দুর্গে হামলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এদের?' জানতে চাইল রানা।

'হয়তো গোখারো নাগিনো জেনে গিয়েছিল নতুন পরিবার বেছে নিয়েছি,' বলল হিনা, 'তাই চরম শাস্তি দিয়েছে। সত্যিকারের গুরু ছিলেন মহান বিজ্ঞানী, আমার থেকেই আমাকে আড়াল করেছিলেন। আজ তিনি নেই, তাই নেব শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ। সেজন্যে মরতেও আপত্তি নেই আমার।'

সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরার কাহিনীর সঙ্গে এর কথায় মিল নেই। ওকে পুরো বিশ্বাস করল না রানা। তবে দেখল, মেয়েটার চোখে সত্যিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

'গোখারো নাগিনো ক্যাসিনো চালায়?' নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বলল রানা।

মাথা দোলাল হিনা। 'সম্পত্তি হারালে বা কেউ কিছু কেড়ে নিলে খেপে ওঠে এরা, প্রতিশোধ নেয়। ভেবেছিলাম

আমি মুক্ত মানুষ। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, কখনও স্বাধীন হব না। তাই ঠিক করেছি, শত্রু খতম করেই শেষ হোক জীবন।' মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আপনার ঠিক হচ্ছে না আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো। এরপর যা করব, সেজন্যে আপনাকেও খুন করতে পারে ওরা।'

কাছেই হাজির হয়েছে একদল অতিথি।

এরইমধ্যে দেরি করেছে সোহেলের সঙ্গে দেখা করতে, তাই আরেকটু পর গেলেও ক্ষতি নেই, হিনাকে নিয়ে ওপরতলায় যাওয়ার র‍্যাম্পে উঠল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'মন দিয়ে শোনো, তুমি কিন্তু মস্ত ভুল করছ। গতকাল পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। দুর্গে যারা হামলা করেছে, তারা আগে ছিল ইয়াকুযা, কিন্তু পরে দলত্যাগ করেছে। তোমাকে ফেরত পেতে, বা প্রতিশোধ নিতে খুন করা হয়নি বিজ্ঞানী শিমেযুকে। ওখানে গিয়েছিল, যাতে দরকারি কিছু তথ্য না পাই আমরা।'

রানার চোখে চেয়ে কথাগুলো নিয়ে ভাবছে হিনা।

'মিথ্যা বলছি না,' বলল রানা, 'তোমার দোষে খুন হননি বিজ্ঞানী। সাগরের এক সমস্যার কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করি আমরা। ফলে হামলা হয় দুর্গে। জরুরি ওই তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ভূমিকম্প আর যি-ওয়েভের।'

চোখ সরু করল হিনা। 'ক্যাসিনোর লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছি। জানি সব গোপন খবর, সেগুলো প্রকাশ পাবে সেটা চায় না এরা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাকে চিনলে প্রথম সুযোগেই খুন করত। খামোকা নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নিচ্ছ।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করব, কি করব না, বুঝতে পারছি না।'

'ট্যাক্সিতে চেপে যাওয়ার পথে কথাগুলো ভেবে দেখো,' বলল রানা। 'এবার সোজা বেরিয়ে যাও ক্যাসিনো ছেড়ে।'

'কিন্তু যাব কেন?'

'নইলে হয়তো তোমাকে চিনে ফেলবে এরা।'

ওপরতলায় পৌঁছে গেছে ওরা। একটু দূরেই লবিতে পিয়ানোর অ্যালকোভ। কোথাও নেই সোহেল। বাজনা বাদ দিয়ে সটকে পড়েছে বাদকরা। ব্যস্ত হয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে ক'জন স্টাফ। চেয়ার সোজা করছে একজন। রানা বুঝে গেল, হাতাহাতি হয়েছে এখানে। ইয়ারবাড কানে গুঁজে ক'জন অতিথির সঙ্গে কথা বলছে সিকিউরিটির চারজন লোক।

'সোজা হাঁটো,' হিনার হাত ধরে অ্যালকোভ পেরিয়ে উল্টো দিকে চলল রানা।

'আমার না চলে যাওয়ার কথা?' বলল মেয়েটা।

পেছন ফিরে তাকাল না রানা। 'আপাতত কোথাও যাচ্ছ না। বেরোতে গেলেই ধরা পড়বে।'

হল ধরে হনহন করে হেঁটে চলল ওরা। একতলা নিচে নেমে মিশে গেল ক্যাসিনোর অতিথিদের মাঝে। নানান স্ক্রিনে রানা দেখল, আপডেট হচ্ছে লড়াইয়ের লিস্ট। অতিথিরা বেছে নেবে কার ওপর বাজি ধরবে।

মোখলেসুর রহমান নামটা দপ-দপ করে জ্বলছে স্ক্রিনে। পাশেই সোহেলের মুখ। নিচে লেখা: ফাইট ওয়ান, ফার্স্ট বাউট অভ ইভেনিং। নিচে ফুটে আছে কয়েকটা সিম্বল।

বিকেলের প্রথম লড়াই শুরু হবে সোহেলকে দিয়েই।

'এসব সিম্বল কীসের?' জানতে চাইল রানা।

'বুঝিয়ে দিচ্ছে, লড়াই অস্ত্র হাতে,' বলল হিনা, 'নানচাকু, লাঠি, হাফ-স্টাফ এসব। তিন মিনিট করে হবে সাতটা বাউট। অথবা, যতক্ষণ পড়ে না যায় কেউ। হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণের সুযোগ নেই।'

একটু আগেও রানা ভাবছিল, কীভাবে ওরে চিচিওয়াকে খুঁজে তার পকেটে রাখবে কয়েন। এখন ভীষণ শুকিয়ে গেছে ওর গলা। নিচু গলায় বলল, 'তুমি কি জরুরি একটা কাজে

আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'

'কী করতে হবে?'

'ওরে চিচিওয়ার হাতে খুন হওয়ার আগেই সরিয়ে নিতে হবে আমার বন্ধু সোহেলকে।'

বাইশ

ভিড়ের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে হিনা আর রানা, এমনসময় দপ্ করে জ্বলে উঠল এরিনার ফ্লাডলাইট।

'লড়াই হবে কতক্ষণ পর?' জানতে চাইল রানা।

'আর বিশ মিনিট,' বলল হিনা।

ক্যাসিনোয় ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রায় সবাই, যে যার চিপ্ গুছিয়ে নিয়ে চলেছে লড়াই দেখতে।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে চলেছে রানা। হিনা একটু পিছিয়ে পড়তেই বলল, 'আমার পাশে থাকো।'

'এরিনায় গেলে বিপদে পড়বেন,' বলল হিনা, 'ওরা চাইছে আপনি ওখানে যান।'

'না গিয়ে উপায়ও নেই,' বলল রানা। 'তবে ওরা অত সহজে ধরতে পারবে না। আমাদের প্রথম কাজ হবে চোখের আড়ালে সরে যাওয়া।'

দূরে গোপন এক দরজা খুলতেই ওদিক থেকে বেরিয়ে এল এক ককটেল ওয়েট্রেস, হাতে ড্রিঙ্ক ভরা ট্রে।

'বাড়ির পেছনদিক,' বলল রানা, 'সব হোটেলে থাকে।'

হিনাকে নিয়ে ওদিকে চলল ও। দরজা থেকে কিছুটা দূরে

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। অপেক্ষা করছে। একটু পর আবারও খুলে গেল দরজা। বেরোল আরেক ওয়েট্রেস। রানা বা হিনার দিকে না চেয়ে যাচ্ছে একটা টেবিলের দিকে। দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগেই ওদিকের করিডোরে ঢুকল রানা ও হিনা।

সার্ভিস করিডোর। দেয়ালে রঙের পোচ নেই। একটু দূরের দরজার ওদিকে ড্রিঙ্ক স্টেশন। আগের ঘরটা লকার রুম। করিডোরের বাঁক থেকে এল পায়ের আওয়াজ। দ্রুত পায়ে লকার রুমে ঢুকল রানা ও হিনা। পেছনে আটকে নিল দরজা।

হাই-হিলের খট-খট তুলে করিডোরের দূরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ। নিচু গলায় হিনাকে বলল রানা, 'তুমি এসেছিলে প্রতিশোধ নিতে। কী করবে ভেবেছিলে?'

অভিজাত ড্রেসের ছোট্ট এক পকেট থেকে চামড়ার পাউচ বের করল হিনা। ওটা থেকে নিল প্লাস্টিকের ভায়াল। ঢাকনি খুলতেই দেখা গেল কয়েকটা সাদা বড়ি।

'বিষ,' বড়ি বের করে বলল হিনা। 'ধীরে ধীরে মরবে। তার আগেই ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম। কেউ জানত না কে করেছে কাজটা।'

'দাও, জরুরি কাজে লাগবে,' বলল রানা।

ভায়ালের ভেতর বড়ি রেখে ওটা ওর হাতে দিল হিনা। 'ভাবছেন কাজে লাগবে?'

'একে-৪৭ তো পাব না, এগুলোই ভরসা,' বলল রানা। 'এবার লাগবে ওয়েট্রেসের পোশাক।'

'আপনাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে,' বলল হিনা।

'আত্মবিশ্বাস না থাকলে সফল হওয়া কঠিন,' বলল রানা, 'গিয়ে দেখা করব ক্লাব ম্যানেজারের সঙ্গে। আশা করি আমাদের দিকটা দেখবে সে। তবে তার সঙ্গে দেখা করার আগে লকার থেকে নিয়ে পরো ককটেইল সার্ভার ইউনিফর্ম।'

কয়েকটা লকার খোলার পর বামেরটায় ওয়েট্রেসদের পোশাক পেল হিনা। যাতে পোশাক পাল্টাতে গিয়ে লজ্জা পেতে না হয় মেয়েটাকে, তাই ঘুরে দাঁড়াল রানা। ঘাঁটতে লাগল একের পর এক লকার। কয়েকটা দেখার পর পেল দরকারি বোতল। পকেটে রেখে দিল। পোশাক পাল্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল হিনা, 'আপনি পোশাক পাল্টে নেবেন না?'

'আপাতত না,' বলল রানা।

'কিন্তু আপনার সাদা কোট তো ধরিয়ে দেবে,' বলল মেয়েটা। 'দেখলেই ছুটে আসবে...'

'আমিও তো তা-ই চাই,' বলল গম্ভীর রানা।

এরিনার নিচে লকার রুমে আনা হয়েছে সোহেলকে। পরতে হবে মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতার পাতলা আলখেল্লা। দেখানো হলো অ্যাথলেটিক কয়েকটি গিয়ার।

হাতির মত এক লোকের কাছে জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'বর্মটর্ম নেই? মধ্যযুগীয়?'

আরও গম্ভীর হলো প্রহরীরা। ক্লাব ম্যানেজার গোখারো নাগিনো বলেছে, পোশাক পরা শেষ হলে এরিনায় নেবে লোকটাকে। তেড়িবেড়ি করলে চ্যাংদোলা করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে ওখানে।

উপায় নেই দেখে দুই পিসের মার্শাল আর্ট ইউনিফর্ম পরল সোহেল। ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকে ভি আকৃতির নেক-কলার। প্যান্টের কোমরে ইলাস্টিক ব্যাণ্ড। হামলা করতে বা তা ঠেকাতে ওকে দেখানো হলো কয়েকটা অস্ত্র। একটা নানচাক্কু নিয়ে সাঁই-সাঁই করে ডানে ও বামে ঘুরিয়ে নিল সোহেল। প্র্যাকটিস করেছিল ছোটবেলায়। ভাল করেই জানে, ঠিকভাবে ব্যবহার না করলে শত্রুর বদলে ওরই বারোটা বাজাবে জিনিসটা। ঠিক করল, নেবে না নানচাক্কু।

বদ্ধ দরজার ওদিক থেকে এল উত্তেজিত দর্শকের চিৎকার। আওয়াজ একবার বাড়ছে, আবার কমছে। জাপানি ভাষায় লাউড স্পিকারে বলা হচ্ছে: একটু পর শুরু হচ্ছে প্রথম বাউট।

'অ্যাই, সময় হয়েছে,' ধমকে উঠল এক গার্ড।

সোহেলকে ঠেলে নিয়ে চলল তারা। একজন খুলল দরজা। প্রতিযোগীকে দেখে বিকট শব্দে গর্জে উঠল দর্শকরা। ওপর থেকে আলো পড়ল সোহেলের ওপর।

পেছন থেকে ঠেলে র‍্যাম্পে তোলা হলো ওকে। উঠে এসে বৃত্তাকার এরিনা দেখল সোহেল। চারপাশে ছয় ফুট উঁচু দেয়াল। বুলফাইটের রিঙের মতই, তবে কাঠের তক্তার তৈরি মেঝে। জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ।

'খয়েরি দাগ দেখে অনেক বাড়ল সাহস,' বিড়বিড় করল সোহেল। ওর দিকের প্রহরীকে বলল, 'আমার ওপরেই বাজি ধরো। জিতলে অনেক টাকা পাবে। আমাকে অর্ধেক দিলেই হবে।'

জবাব না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে আছে লোকটা।

ওদিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল সোহেলের। দেয়ালের সরু ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মস্তবড় এক দানব!

লোকটা দৈর্ঘ্যে হবে ছয় ফুট দশ ইঞ্চি। ঘাড় থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত থোকা থোকা পেশি! বাইসনের মত শক্তিশালী কাঁধ ও ঘাড়! মুচড়ে রাখা দড়ির মত পেট! কোমরের পর গাছের গুঁড়ির মত দুই পা!

'ওরেব্বাপ্‌স্‌!' বিড়বিড় করল সোহেল, 'তোমাকে দোষ দেব না। আরে, শালা, আমি নিজেই তো নিজের ওপর বাজি ধরব না!'

খল-খল করে হেসে উঠল পেছনের গার্ড। গলা শুকিয়ে গেছে সোহেলের, চট্‌ করে দেখল চারপাশ। বুকের ভেতর কে যেন বলল, 'ভয় নেই, কাছেই থাকবে রানা। তুই শুধু যতক্ষণ

পারিস টিকে থাক্।'

দানবের দিকে আবার তাকাল সোহেল। লোকটা ভারী। নড়াচড়ায় ধীর হবে। চট্ করে ধরতে পারবে না ওকে। এটাই বোধহয় ভাল হলো, মার্শাল আর্ট এক্সপার্ট প্রতিযোগী হলে প্রজাপতির মত এসে হামলা করত।

পেছন থেকে পিঠে ঠেলা দিয়ে রিঙের মাঝে পাঠানো হলো ওকে। বলা হলো অস্ত্র বেছে নিতে। একটা পোক্ত চেহারার লাঠি নিল ও। এমনই একটা দিয়ে কমোডো ড্রাগনের ওপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। খাটো দুটো লাঠি নিল জাপানি হারকিউলিস।

একটা বেসুরো ট্রাম্পেট বাজতেই শুরু হলো বাউট।

দু'হাতে লাঠি বাগিয়ে তৈরি হলো সোহেল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওর দিকে আসছে দানব। কয়েকবার পেটে খোঁচা মেরে তার গতি কমিয়ে দিল সোহেল।

প্রথম দুটো গুঁতো পাঁজরে খেয়েও পাত্তা দিল না দানব। ভাব দেখে মনে হলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে সোহেল নামের মাছিটাকে। তৃতীয় খোঁচার সময় পাল্টা হামলা করল সে। গতি তার রকেটের মত। অত বিশাল লোক এভাবে তুমুল বেগে হামলা করবে, ভাবা যায়নি। বামহাতের লাঠি সাঁই করে নামল সোহেলের লাঠির ওপর। গতি এতই, খটাং শব্দে মেঝেতে লাগল ওর লাঠি। একইসময়ে সামনে বেড়ে সোজা সোহেলের মাথার তালু লক্ষ্য করে ডানহাতের লাঠি নামাল দানব।

ঝট্ করে নিচু হয়ে সরে মাথার ওপরে বাতাস কাটার সাঁইই শব্দ শুনল সোহেল। হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকরা। মুখে হাত চাপা দিয়েছে মেয়েরা। পিছিয়ে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোহেল। নিচু গলায় বলল, 'এত তাড়া কীসের? মাথা চুরমার করার আগে ওদেরকে একটু খেলা দেখতে দাও!'

নিরেট পাথরের মত চেহারা দানবের। মুখে নেই সামান্য হাসি। ভুরুও কোঁচকাল না। তেড়ে এল মেইল ট্রেনের মত।

মেঝেতে শুয়েই দানবের দু'পায়ের মাঝে লাঠি ভরে বেমক্কা মোচড় দিল সোহেল। অপ্রত্যাশিত হামলায় হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় মেঝেতে পড়ল লোকটা।

শত্রুকে আহত না করেই তার অস্ত্র সরাতে চাইল সোহেল। ওর লাঠির বাড়ি খেয়ে দানবের ডানহাত থেকে ছিটকে গেল খাটো লাঠি। ওটা মিসাইলের মত তৃতীয় সারির সিটের দিকে আসছে দেখে প্রাণের ভয়ে সরে গেল কয়েকজন দর্শক।

এদিকে বাড়তি সময় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দানব। বুঝে গেছে, চাইলে তার মাথা ফাটাতে পারত অর্ধেক সাইযের লোকটা।

আবারও মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাজল বেসুরো ট্রাম্পেট।

প্রথম রাউণ্ড শেষ।

সিটে গিয়ে বসল দানব। নিজের কোণে ফিরল সোহেল। অবাক চোখে ওকে দেখছে গার্ডরা। এক বোতল পানি নিয়ে ছিপি খুলে চুমুক দিল সোহেল। দু'ঢোক খাওয়ার পর অবশিষ্ট ঢালল মাথা ও বুকে। যতটা পারা যায় বিশ্রাম নিতে হবে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল।

প্রথমবারের মত দর্শকদের ভালভাবে দেখছে। খুব কাছেই তারা। বৃত্তাকার এরিনা ঘিরে ওপরে গেছে সারি সারি সিট। ওকে দেখছে অন্তত এক হাজার নিষ্ঠুর পুরুষ ও নারী। খালি নেই একটা সিট।

চোখে পড়ল না রানার পরিচিত মুখটা। প্রতিটি দরজায় একাধিক সশস্ত্র গার্ড। সিটগুলোর মাঝেও রয়েছে তারা। ফাইটিং এরিনায় ঢোকার উপায় নেই ওর প্রাণের বন্ধুর। গলা আরও শুকিয়ে গেল সোহেলের। বোধহয় এরইমধ্যে ধরা পড়েছে রানা। সেক্ষেত্রে বাঁচবে না ওরা। তবুও বুকের মাঝে কে যেন বলল, 'দেখিস, রানা ঠিকই আসবে। মরতে দেবে না

তোকে।'

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! লড়াইয়ের জন্যে নতুন করে মানসিক প্রস্তুতি নিল সোহেল।

কয়েক মুহূর্ত পর বাজল ট্রাম্পেট।

শুরু হচ্ছে দুই নম্বর রাউণ্ড।

সিট ছেড়ে বিড়বিড় করল সোহেল, 'রানা, দোস্ত, যা করার তাড়াতাড়ি! লড়ে বেশিক্ষণ টিকব না কিংকঙের সঙ্গে!'

তেইশ

বিলাসবহুল সুইটের জানালার পুরু কাঁচ ভেদ করে নিচের এরিনায় চোখ রেখেছে লো হুয়াং লিটন। লাঠি হাতে ভালই লড়ছে সোহেল আহমেদ। নিচ থেকে আসছে উত্তেজিত দর্শকদের চাপা গর্জন। টেবিল থেকে অপেরা গ্লাস তুলে চোখে লাগাল বিলিয়নেয়ার। কোথাও নেই বিশৃঙ্খলা। বোধহয় বাঙালিটাকে উদ্ধার করতে আসবে না কেউ।

'সন্দেহ হয় কাউকে?' জানতে চাইল নাগিনো।

'এখনও না,' বলল লো হুয়াং।

'তা হলে আপনার কথামত তাদেরকে খুঁজে বের করা যাচ্ছে না,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল গোখারো নাগিনো।

অপেরা গ্লাস রেখে পায়চারি শুরু করল বিলিয়নেয়ার। বাঙালিটা এখানে এসেছে বলে দমকা হাওয়ায় ফুৎ করে নিভে গেছে তার সাহসের কুপি। বলা হয়েছিল, খুন হয়েছে দুর্গের সবাই, অথবা হাসপাতালে মারাত্মকভাবে আহত। কিন্তু

একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে এই লোক। এজন্যে এখন মনে হচ্ছে, মস্তবড় বিপদে আছে সে।

এ বিষয়ে কী জানে খুলে বলল নাগিনোকে। তারপর বলল, 'দারোয়ানের বর্ণনা অনুযায়ী, আপনি খুঁজবেন মাসুদ রানা নামের এক লোককে। পরনে সাদা ডিনার জ্যাকেট। তার বন্ধু এরিনার এই লোক। এদের সম্পর্কে যা জেনেছি, বন্ধুকে বিপদে ফেলে ভেগে যাবে না এরা।'

বাঁদরের মত ভেংচি কাটল নাগিনো। 'বাদ দিন। প্রাণের ভয় এমনই জিনিস, বিপদের সময় মনের জানালা দিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায় সব সাহস। মাসুদ রানা ভালই জানে, ধরা পড়লে মরবে। তাই চেষ্টা করছে ক্লাব ছেড়ে পালিয়ে যেতে।'

'আপনার লোক নিশ্চয়ই ঠেকাবে,' বলল লো হুয়াং।

'অবশ্যই,' বলল নাগিনো। 'ভরসা রাখুন আমার ওপর। ওদের উপায় নেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার।'

মাথা দোলাল লো হুয়াং। 'আমি তা হলে বিদায় নেব। পরে কী হয় আমাকে জানাবেন।'

'আপনি এখনই চলে যাচ্ছেন?'

বিলিয়নেয়ার বুঝতে পারছে, কাজটা কাপুরুষের মত হয়ে যাচ্ছে, তবে ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই ভাল। এসবের সঙ্গে সে জড়িত তা প্রকাশ পেলে সর্বনাশ হবে। কেঁচে যাবে পুরো প্ল্যান। সেক্ষেত্রে নিজেদের আড়াল করতে তাকে অকাতরে বলি দেবে চিনের পলিটিকাল নেতারা। 'রয়ে গেলে আপনার কী লাভ? আপনি নিজেই তো বলেছেন: ওদের উপায় নেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার।'

নিজের প্যাঁচে পড়ে বিরক্ত বোধ করল নাগিনো। 'কোনও গোলমাল হলে যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে, সেটা মাথায় রাখবেন,' হুমকির সুরে বলল সে।

'আপনি আপনার নিজের অবস্থান ভুলে গেছেন,' বলল লো হুয়াং। 'ইয়াকুযা সিণ্ডিকেটে আপনার চেয়ে অনেক ওপরের

নেতাদের সঙ্গে আমার ওঠাবসা। বছরের পর বছর তাদেরকে নানানভাবে সাহায্য করেছি।' অনুমতি না নিয়েই দরজার নবে হাত রাখল সে। 'সোহেল আহমেদের সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে সে বা তাদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন। তা যদি না পারেন, অন্তত গায়েব করে দেবেন ওই বাঙালিটাকে।'

রাগে লাল হয়েছে গোখারো নাগিনো, তবে বাধা না দিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'সঙ্গে করে নিয়ে যান পাগলটাকে। আর কখনও এখানে তাকে আনবেন না।'

দরজা খুলে ওরেকে ইশারা করল বিলিয়নেয়ার। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা দু'জন।

এবার কী করবে ভাবছে বিচলিত নাগিনো। অপেরা গ্লাস তুলে এরিনার চারপাশে চোখ বোলাল। হাজারখানেক লোকের ভেতর এমন কেউ নেই, যাকে সন্দেহ করবে। দুরবিন নামিয়ে খালি গ্লাসের দিকে তাকাল সে। তখনই সুইটে ঢুকল এক ওয়েট্রেস।

'স্কচ,' ক্লান্ত সুরে বলল নাগিনো। পুরু গদিওয়ালা আরামদায়ক চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে।

নতুন গ্লাসে ড্রিঙ্ক দিল মেয়েটা।

তার দিকে না চেয়েই গ্লাস তুলে ঢকঢক করে গলায় স্কচ ঢালল নাগিনো। গলা ও বুক পুড়িয়ে পেটে গেল কড়া মদ। একটু শান্ত হলো ইয়াকুযা নেতার মন। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নতুন করে দেখল লড়াই। প্রথম রাউণ্ডের মতই দ্বিতীয় রাউণ্ড। মাস্তুলের মত উঁচু দানবটা হামলা করছে, আর নানাদিকে সরে বাঁচতে চাইছে বাঙালিটা। আনমনে বলল নাগিনো, 'লো হুয়াং ঠিকই বলেছে। ব্যাটা ভাবছে কেউ এসে উদ্ধার করবে ওকে।'

'তা হলে উচিত হবে না ওকে হতাশ করা,' নাগিনোর পেছন থেকে বলল কেউ।

রিভলভিং চেয়ারে ঘুরে গেল ইয়াকুযা নেতা।

দাঁড়িয়ে আছে বাদামি ত্বকের যুবক। পরনে সাদা ডিনার

জ্যাকেট। একেই খুঁজছে তারা! মৃদু হাসছে সে, হাতে অস্ত্র নেই।

'ও, তা হলে তুমিই মাসুদ রানা।'

'তাতে কোনও ভুল নেই,' একটা সিটে বসে পড়ল রানা।

'এখানে ঢুকলে কী করে?'

'সহজেই,' হাসিটা অমলিন রানার। 'তোমার বেশিরভাগ লোক গেছে আমাকে খুঁজতে, তাই করিডোর ফাঁকা। তোমার গার্ডটাকে অজ্ঞান করে চলে এলাম দেখা করতে।'

'নিরাপত্তার জন্যে গার্ড লাগে না আমার,' ডেস্কের মাঝের ফাঁকা অংশ থেকে নাকবোঁচা রিভলভার নিয়ে রানার নাকে তাক করল নাগিনো।

অলসভাবে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত ওপরে তুলল রানা। চোখে ভয় নেই। মুখে হাসি। কিন্তু হেরে যাওয়া লোকের মুখে এমন হাসি থাকে না। 'আমি হলে ভুলেও ট্রিগারে চাপ দিতাম না।'

'জানি, গুলি করলেই বেশি খুশি হতে,' বলল নাগিনো। 'কিন্তু মরবে তোমরা টোকিও উপসাগরের নিচে ডুবে।'

'তার আগে আমার কথা শুনে নাও,' বলল রানা। 'যে-কোনও সময়ে অস্থির হবে তোমার হৃৎপিণ্ড। সব ধমনী ফেটে দরদর করে বেরোবে রক্ত। এমন কী রোমকূপ থেকেও।'

'কী বলতে চাও?'

'তুমিও বাঁচবে না,' গম্ভীর হলো রানা, 'ভাবতে পারো, আমরা দু'জন লাইলি-মজনুর মত, বাঁচলে বাঁচব একসঙ্গে, নইলে কেউই নয়। মরতে চাও না বাঁচতে? ঠিক করতে হবে তোমাকেই।'

'মিথ্যা বলে বোকা বানাতে চাও?' কড়া চোখে ওকে দেখল নাগিনো। 'ইয়াকুযা জয়েন্টে এসব চলে না।'

পকেট থেকে খালি প্লাস্টিকের ভায়াল নিয়ে আস্তে করে লোকটার দিকে ছুঁড়ল রানা। বামহাতে ওটা ক্যাচ ধরল

নাগিনো। আঠার মত কিছু লেগে আছে ভায়ালের গায়ে।

'ভেতরে ছিল হেপারিন,' বলল রানা, 'শক্তিশালী রক্ত তরলকারী ওষুধ। ইঁদুরের বিষের মত বলতে পারো। মদের সঙ্গে গিলে ফেলেছ ফেটাল ডোয। নিচে এরিনায় তোমার যে লোকটা লড়ছে, তার তিন গুণ আকারের দৈত্যও খতম হবে। অ্যালকোহলের কারণে ড্রাগসের স্বাদ বোঝোনি। কিন্তু জিভে তো তিতা ভাব টের পাওয়ার কথা।'

জিভ দিয়ে দাঁত স্পর্শ করল নাগিনো। বাজে একটা গন্ধ পেল। ভাল করেই জানে, কী কাজ করে ইঁদুরের বিষ। আগে ব্যবহার করেছে শত্রুর ওপর।

'গরম লেগে ওঠার কথা,' বলল রানা। 'লাফাতে শুরু করবে তোমার হৃৎপিণ্ড। এখনও শুরু হয়নি?'

গরম হয়ে উঠছে মুখের ত্বক, বুঝল নাগিনো। আগের চেয়ে জোরে চলছে হৃৎপিণ্ড। ঘামছে ভুরু। কড়া সুরে বলল সে, 'জান নিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারবে না।'

এক ভুরু উঁচু করল রানা। 'তুমি নিজে আমাকে বাইরে দিয়ে এলে ঠেকাবে না কেউ। কাজটা করতে চাও কি না, সেটা তোমার ব্যাপার। ক্লাব থেকে বেরিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হ্যাণ্ডশেক করব। তখনই হাতের তালুতে পাবে অ্যান্টিডোট।'

'অথবা, গুলি করে মারব তোমাকে, তারপর সার্চ করে নেব ওষুধ,' রিভলভারের হ্যামার তুলল নাগিনো।

'তুলনাহীন বুদ্ধি,' বলল রানা। হাতের তালু খুলল ও। ওখানে কয়েক রঙের পাঁচটা নানান আকার ও আকৃতির বড়ি। 'এগুলোর ভেতর একটা অ্যান্টিডোট। কিন্তু ভুল হলে অন্য বিষের কারণে আরও তাড়াতাড়ি মরবে।'

চোখ সরু করল গোখারো নাগিনো। বুঝতে পারছে না, কেন তার ওপর আজ এত খাপ্পা স্রষ্টা! ইয়াকুযাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটির মাঝে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা। অন্তত পঞ্চাশজন সশস্ত্র লোক খুঁজছে তাকে। অথচ ক্লাব ম্যানেজারের টেবিলটা

উল্টে ফেলেছে লোকটা!

'রিভলভারটা মেঝেতে রেখে পা দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দাও,' হঠাৎ করেই কড়া সুরে বলল রানা।

মাথা নাড়ল নাগিনো। প্রাণপণে ভাবছে, নিশ্চয়ই উপায় আছে কোনও না কোনও!

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বেশি দেরি হলে কিন্তু কাজ করবে না অ্যান্টিডোট।'

বন্যার মত ছাপিয়ে ওঠা ভয়কে জয় করতে চাইল গোখারো নাগিনো। কিন্তু কাজটা অসম্ভব। পুরনো ঝরঝরে গাড়ির মত ধক-ধক করছে হৃৎপিণ্ড। মুখ ভিজে গেছে ঘামে। জ্যাকেটের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে মেঝেতে রিভলভার রাখল সে। লাথি মেরে পাঠিয়ে দিল রানার কাছে। 'কী করতে হবে? সরিয়ে নেব সিকিউরিটি টিমের সবাইকে?'

রিভলভারটা তুলে নিল রানা। 'সন্দেহ করবে ওরা।'

'তা হলে কী করব?'

'প্রথম কথা, মোবাইল ফোন দাও,' জানাল রানা, 'আমারটা তোমাদের লকারে। তোমার পরের কাজ সাহায্য করা। যাতে এরিনা থেকে সরাতে পারি আমার বন্ধুকে। তবে তা করব পুরনো আমলের স্টাইলে। তুমি-আমি হাতে-হাত মিলিয়ে কাজে নামব।'

চব্বিশ

বেসুরো ট্রাম্পেট বাজতেই শুরু হলো চতুর্থ রাউণ্ড।

সোহেল দেখল, আগের মত তেড়ে না এসে অপেক্ষা করছে দানব। এগোলে এক ঘুষিতে খতম করবে ওকে। ব্যাটা হয়তো ক্লান্ত। অথবা, ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলেই নতুন এই কৌশল।

প্রতিপক্ষের চোখে তাকাল সোহেল।

এগোতে হাতের ইশারা করছে দানব।

মাথা নাড়ল সোহেল।

তাতে খাটো লাঠি বাতাসে দুলিয়ে আবারও ইশারা করল দৈত্য।

এবারও জায়গা থেকে নড়ল না সোহেল।

চালমাত অবস্থা।

দৈত্য এগোতেই একপাশে সরল সোহেল। বৃত্ত তৈরি করে ঘুরতে লাগল ওরা। হামলায় যাচ্ছে না কেউ।

শিস দিচ্ছে দর্শকরা। ধৈর্য হারালে গালি দেবে।

এরিনার ভেতর পরিবেশটা থমথমে।

হঠাৎ সোহেলের পায়ের নিচে কাত হয়ে ওপরে উঠতে লাগল মেঝে। হাইড্রলিক জ্যাক খাড়া করছে বৃত্তের বাইরের দিক। মাঝের অংশ স্থির। এবার লড়তে হবে ছোট ওই জায়গায়। সরে যাওয়ার উপায় নেই।

মেঝের বাইরের দিক ওপরে উঠছে দেখে চওড়া হাসল দানব। ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল মাঝের বৃত্তে।

পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কাত হলো মেঝে। প্রায় বসে মেঝেতে একহাত রেখে তাল সামলাতে চাইল সোহেল। কিন্তু মেঝে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি খাড়া হতেই পিছলে যেতে লাগল পা।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকরা। আশা করছে চাল কুমড়োর মত গড়িয়ে গিয়ে দানবের খপ্পরে পড়বে সোহেল।

যে-কোনও সময়ে ভারসাম্য হারাবে বুঝে, বাধ্য হয়ে উঠে দৌড় শুরু করল সোহেল। সরাসরি যাচ্ছে না দানবের দিকে। বাড়ছে নেমে যাওয়ার গতি। খাড়া পারে যেভাবে কাত হয়ে

ছোটে দ্রুতগামী গাড়ি, সেভাবে ছুটে দানবটাকে এড়াতে চাইল সোহেল।

ওকে লক্ষ্য করে পা ঘুরিয়ে লাথি হাঁকাল দৈত্য। তবে পা টপকে গিয়ে না থেমে তার মাথার চাঁদিতে একটা ঘুষি বসাল সোহেল।

ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল দানব।

ঘুরে হামলা করতে চাইল সোহেল, কিন্তু তখনই কয়েক ধাপে নেমে গেল মেঝে।

হাইড্রলিকের হিসহিস গর্জন একটু দেরিতে শুনেছে সোহেল। খুলে দেয়া হয়েছে বড় কোনও ভাল্‌ভ্‌। তক্তা সমান হতেই তাল হারিয়ে ধুপ করে মেঝেতে পড়ল ও। বেদম ব্যথা পেয়েছে মাথায়। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে ভাবল, অন্যায় হচ্ছে ওর প্রতি। মুখ তুলে দেখল উঠে তেড়ে আসছে দৈত্য।

সোহেলের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে লাঠি কেড়ে নিল সে। পরক্ষণে সাঁই করে চালাল মাথা লক্ষ্য করে। দু'হাতে মাথা বাঁচাতে চাইল সোহেল। খটাং করে লাঠি নামল টাইটেনিয়ামের বাহুর ওপর। পরক্ষণে পিছলে লাগল মাথার পাশে।

ওর মনে হলো, রাবারের মত নরম হয়ে গেছে দু'পায়ের পেশি। বুকে কে যেন বলল, 'উঠে দৌড়া! নইলে খুন হবি!' কানের ভেতর ভনভন আওয়াজ।

উঠে বসতে গিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল সোহেল। রেফারি নেই যে সময় গুনে বলবে, ও হেরে গেছে। ছাত থেকে আসছে চোখ ধাঁধানো আলো। তারই মাঝে কালো একটা গহ্বর।

সেকেণ্ডের জন্যে উজ্জ্বল আলোকে আড়াল করল দৈত্য। খাটো লাঠির বাড়িতে ফাটিয়ে দেবে সোহেলের মাথা। কিন্তু তখনই বেজে উঠল বেসুরো ট্রাম্পেট। ঘুরে নিজের সিটের দিকে চলল দানব।

'সৌজন্যবোধ আর বীরত্ব এখনও হারিয়ে যায়নি পৃথিবী

থেকে,' বিড়বিড় করল সোহেল। মেঝেতে পড়ে রইল চুপ করে। পায়ে পেতে হবে শক্তি। তখনই ওপর থেকে কী যেন পড়ল ওর পেটে।

জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল সোহেল।

হলদেটে।

মাঝে ফুটো।

পাঁচ ইয়েনের কয়েন!

সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয় জাপানে।

মুহূর্তে মন ভাল হয়ে গেল সোহেলের।

কাছেই কোথাও আছে রানা!

আবারও ছাতের দিকে তাকাল সোহেল।

তখনই দপ্ করে নিভে গেল চারপাশের সব বাতি।

পঁচিশ

'দড়ির আরেক মাথা ওর হাতের কাছে ফেলো,' বলল রানা।

ওর পাশে ক্যাটওঅকে দাঁড়িয়ে আছে হিনা ও গোখারো নাগিনো। এইমাত্র নিভিয়ে দেয়া হয়েছে নিচে তাক করা সব বাতি। মৃদু বাতি জ্বলছে ওপরের ক্যাটওঅকে।

রেলিঙে বেঁধে নেয়া হয়েছে দড়ির একমাথা, অন্য অংশ সরাসরি সোহেলের পাশে ফেলল হিনা। 'দেখতে পাবেন কি না কে জানে! মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। খুব জোরে আছাড় খেয়েছেন।'

রানা দেখেছে, চোখের কাছে কয়েন নিয়েছে সোহেল।

দুই-এ-দুই মেলাতে দেরি হবে না ওর।

'ওই লোক উঠলেই অ্যান্টিডোট দেবেন,' কাঁপা গলায় বলল নাগিনো।

'ক্লাব থেকে বেরোবার আগে না,' বলল রানা।

টানটান হলো দড়ি। দুটো ঝাঁকি খেল ওটা। সোহেল জানিয়ে দিয়েছে, ও তৈরি।

'এবার টেনে তুলতে হবে,' বলল রানা।

তিনজন মিলে হাত লাগাল ওরা। একেকবারে একফুট করে উঠছে সোহেল। মেঝে থেকে বহু ওপরে ক্যাটওঅক। রানা বুঝল, মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে, তাতে অন্তত দু'মিনিট লাগবে সোহেলকে তুলতে।

অর্ধেক দড়ি তোলার পর থেমে গেল নাগিনো। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্যাটওঅকে। দু'হাতে চেপে ধরল বুক। ঘামছে দরদর করে। 'ওই অ্যান্টিডোট না দিলে মরে যাব!'

'দড়ি টেনে তোলো!' ধমক দিল রানা।

'বড়ি না দিলে আর পারব না। মরে যাচ্ছি!'

তিনজনের কাজ করছে হিনা আর রানা মিলে।

'আমার বন্ধু উঠলেই বড়ি পাবে, হাত লাগাও!' তাড়া দিল রানা।

কিন্তু পাগল হয়ে উঠল জাপানি ডাকাত। খামচে ধরল রানার কলার, বামহাত ভরল ওর পকেটে। বড়ি এখনই চাই। কাত হয়ে রেলিঙে পড়ল ওরা দু'জন। হাত থেকে দু'ফুট দড়ি বেরিয়ে গেল রানার। নেমে যাচ্ছে সোহেল। প্রাণপণে আবারও দড়ি ধরল ও। ওকে সাহায্য করতে চাইছে হিনা।

'অ্যান্টিডোট!' প্রাণপণে চেঁচাল নাগিনো।

জবাব না দিয়ে বামহাতের ধাক্কায় তাকে সরাল রানা। পরক্ষণে বুকে জড়িয়ে নিল দুই পাক দড়ি। পাছায় কষে লাথি মেরে ফেলতে চাইল ওকে ক্যাটওঅক থেকে। কিন্তু প্রাণের ভয়ে রেলিঙে পা বাধিয়ে নিয়েছে দস্যু। রানা ভেবেছিল তার

ওজনে সরসর করে উঠবে সোহেল। কিন্তু মাঝপথে আটকা পড়েছে ওর বন্ধু।

ওপরের আলোয় পকেট থেকে কমলা ট্যাবলেট বের করল রানা। 'এই যে, তুমি এগুলো চাইছ।'

'প্লিয, দাও,' কাতর সুরে বলল নাগিনো।

'তার আগে একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'ওরে চিচিওয়াকে টাকা দিয়েছে কে?'

'এসব কী বলছ?'

এক পা পিছিয়ে গেল রানা। ভাব দেখে মনে হলো ট্যাবলেট ছুঁড়ে ফেলবে নিচের অন্ধকারে।

'একমিনিট!' অনুনয় করল নাগিনো, 'টাকা দিয়েছে হুয়াং।'

'পুরো নাম কী?'

'লো হুয়াং লিটন।'

'সে কি ইয়াকুযা?'

'না,' মাথা নাড়ল নাগিনো, 'চাইনিয ব্যবসায়ী। অনেক বড়লোক।'

সময় নেই, তবুও জিজ্ঞেস করল রানা, 'ব্যবসায়ী কেন ভাড়া করছে খুনিকে?'

'জানি না।'

সোহেলের দিকের দড়ি টানতে শুরু করল রানা। 'সত্যি বলো। নইলে পোঁদে এক লাথ্ মেরে নিচে ফেলব।'

'সত্যিই বলছি, কিরে!' হাউমাউ করে উঠল নাগিনো। 'ভাই আমার... লক্ষ্মী ভাই... আমার ট্যাবলেট!'

অনেক নিচ থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো মারছে গার্ডরা। বুঝতে চাইছে, কেন হঠাৎ নিভল ফ্লাডলাইট। সওয়াল জবাবের সময় নেই আর। রেলিঙের বাইরে হাত নিয়ে ট্যাবলেট ফেলল রানা। 'এরিনায় পাবে সব। রওনা হয়ে যাও নিচে।'

পরক্ষণে জাপানি ডাকুর পাছায় মাঝারি এক লাথি বসিয়ে

দিল রানা। দড়ির মধ্যে জড়িয়ে নেমে চলেছে ভারী লোকটা। এদিকে উঠে আসছে সোহেল। থ্যাপ আওয়াজ তুলে এরিনার মেঝেতে নামল নাগিনো। ব্যস্ত হয়ে উঠল দড়ি থেকে ছুটতে। তার চাই কমলা সব ট্যাবলেট।

ওদিকে সোহেলকে ধরে ক্যাটওঅকে তুলে নিল রানা ও হিনা।

'আমি কি ঠিক দেখেছি, না ভুল?' বলল সোহেল, 'সাঁই সাঁই করে নেমে গেল হোঁৎকা এক লোক?'

'নরকের কীট,' বলল রানা। 'পৃথিবীতে নেমেছে।'

'কিন্তু ওই নরকের কীট ছিল বেরোবার টিকেট,' দুঃখিত স্বরে বলল হিনা।

চোখ পিটপিট করল সোহেল। 'নিচের ওই কিংকং মাথায় জোরে বাড়ি দিয়েছে। নইলে তুমি এখানে কেন, হিনা?'

'পরে সব বলব,' জানাল রানা। 'এবার অন্যদিকে সরাতে হবে সবার চোখ। দে তোর বামের ওই এক্সটিংগুইশার।'

লাল ট্যাঙ্ক তুলে রানার হাতে দিল সোহেল। জিনিসটা ড্রাই কেমিকেলের আগুন নির্বাপক। কটার পিন খুলে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে ক্যাটওঅক থেকে ওটা ফেলল রানা। ওদের মনে হলো স্লো মোশনে রওনা হয়েছে জিনিসটা। মুখ থেকে বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়ার মত ভেপার। এরিনার মেঝেতে পড়ে বোমার মত আওয়াজ তুলল লাল সিলিণ্ডার।

'আগুন!' জাপানি ভাষায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল হিনা। 'আগুন!'

ঘন ভেপারের মাঝে উন্মত্ত হয়ে উঠল কিছু ফ্ল্যাশলাইট। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়ার মত কেমিকেল। ভীষণ ভয়ে বিশৃঙ্খল হলো দর্শকরা। হৈ-চৈ, ধাক্কা-ধাক্কি করে নানাদিকের দরজার দিকে ছুটল তারা।

'এবার, চল্,' তাড়া দিল রানা।

ক্যাটওঅক শেষে অ্যাকসেস ডোর দিয়ে মেইনটেন্যান্স

টানেলের ওয়াই আকৃতির জাংশনে পৌঁছুল ওরা। বামে বাঁক নিয়ে পৌঁছুল আরেকটা দরজার সামনে। ওটা খুলতেই বেরিয়ে এল রাতের অন্ধকারে।

এদিকে জ্বেলে দেয়া হয়েছে ক্লাবের প্রতিটি বাতি। নানাদিকের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোচ্ছে লোকজন। এরই ভেতর মেইন গেটের দিকে রওনা হয়েছে কয়েকটা গাড়ি।

'তুমি কি গাড়ি এনেছ?' হিনার কাছে জানতে চাইল রানা।

'না, তবে চুরি করতে পারব।'

মেইন গেটের দিকে তাকাল রানা। হুলুস্থূল চলছে ওদিকে। রাস্তা আটকে দিয়েছে গার্ডরা।

'ওদিকে যাওয়া যাবে না,' বলল রানা। 'প্রতিটা গাড়ি চেক করে তারপর ছাড়বে। গোপনে বেরোতে হবে এখান থেকে। এসো। চল্, সোহেল!'

ক্লাব ভবন থেকে সরে অন্ধকার বাগানে ঢুকল ওরা।

'এদিকে ক্যামেরা থাকলে ধরা পড়ব,' বলল সোহেল।

'সিকিউরিটি অফিসে ক্যামেরা স্ক্রিনে চোখ রাখার মত কেউ নেই,' বলল রানা, 'তবুও দেরি না করে দেয়াল টপকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'তারপর কী করব?' জানতে চাইল হিনা।

'কোনও গাড়ি থামিয়ে চেপে বসব,' বলল রানা।

'বেন্টলি হলে ভাল হয়,' মতামত জানাল সোহেল।

'আমার মনের কথা।' মৃদু হাসল রানা।

বাগান পেরিয়ে বারো ফুট উঁচু লোহার বেড়ার কাছে পৌঁছুল ওরা। নাগিনোর কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন পকেট থেকে নিয়ে মুখস্থ নম্বরে কল দিল রানা। পুলিশের সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা কল রিসিভ করতেই বলল, 'রানা বলছি, আছি ক্লাবের পশ্চিম দেয়ালের কাছে। ওদিকে রাস্তা। এসে তুলে নিতে পারবেন?'

'আসছি,' বললেন হিমুরা, 'ক্লাব থেকে একটার পর একটা

গাড়ি বেরোচ্ছে। ভেতরে কী হয়েছে?'

'এখান থেকে সরে জানাব,' বলল রানা।

গলা উঁচিয়ে বলল সোহেল, 'দেরি করবেন না, নইলে খুন হব।'

ফোনে রানা শুনল বেন্টলি গাড়ির ইঞ্জিনের জোরালো গর্জন। রওনা হয়েছেন পুলিশ অফিসার। টপকে যাওয়ার জন্যে রটআয়ার্নের বেড়ার দিকে হাত বাড়াল ও।

খপ্ করে ওর হাতটা ধরল সোহেল। 'না, দোস্ত, ইলেকট্রিফায়েড!'

ঝোপ থেকে কয়েকটা তার গেছে ক্রসবারে।

'তৃতীয় তার বোধহয় সেন্সরের। বেড়া স্পর্শ হলেই ওরা জানবে আমরা কোথায় আছি।' ক্লাব বিল্ডিঙের দিকে তাকাল রানা। ওদিক থেকে এল কয়েকটা কুকুরের তর্জন। খোলা বাগানে ঘুরছে কিছু ফ্ল্যাশলাইট। 'আগে হোক পরে হোক, ধরা পড়ব।'

'কারেন্ট শর্ট করতে পারবি?' জানতে চাইল সোহেল।

দুর্বল দিক খুঁজতে গিয়ে ক'সেকেণ্ড ব্যয় করল রানা, তারপর বলল, 'সুযোগ নেই।'

'ওরা আসছে,' বলল হিনা।

শোনা গেল হিমুরার বেন্টলি গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। বাঁক নিয়ে অ্যাকসেস রোড ধরে ছুটে এল উজ্জ্বল সাদা হেডলাইট। আবারও ফোনকল দিল রানা। 'আমরা আছি ইলেক্ট্রিফায়েড বেড়ার এদিকে। আপনি বেড়ার নিচের ইঁটের দেয়াল ভাঙলে ওই পথে ক্রল করে বেরোব।'

কাছে চলে এসেছে বেন্টলি। দূরে নেই কুকুর ও সিকিউরিটির লোক।

'আপনাদের দেখতে পেয়েছি, সরে দাঁড়ান,' বললেন হিমুরা।

বাগানের দিকে পিছিয়ে গেল রানা, সোহেল ও হিনা। গতি

কমল বেন্টলির, বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে সোজা ছুটে এল ইঁটের দেয়াল লক্ষ্য করে। আরও বাড়ছে গতি।

ক'সেকেণ্ড পর তিন টনি হাতুড়ির মত দেয়ালে লাগল ভারী বেন্টলি। বেঁকে গেল লোহার বেড়া। আরও অনেক জরুরি এক কাজ হলো তাতে, বেন্টলি তৈরি করেছে ইঁটের দেয়ালের মাঝে দু'ফুটি ফোকর।

হেডলাইটের আলোয় চারপাশে ভাসছে হলদেটে ধুলো। বাগান থেকে এল ফ্ল্যাশলাইটের আলো। সিকিউরিটির লোক চেইন খুলে নেয়ায় হুঙ্কার ছেড়ে রানাদের দিকে ছুটে এল হিংস্র কুকুরের পাল।

'জলদি!' তাড়া দিল রানা।

ভাঙা দেয়াল থেকে নাক পিছিয়ে নিল বেন্টলি। খসে পড়ল দু'একটা ইঁট। হিনার পর পর ক্রল করে ওদিকে গেল সোহেল। পরক্ষণে ডাইভ দিয়ে বেরোল রানা। বেন্টলির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে সোহেল ও হিনা। আটকে নিয়েছে দরজা। সামনের দরজা খুলে রানা উঠতে না উঠতেই দেয়ালের ফোকর গলে হাজির হলো ক'টা বিশাল কুকুর। ওগুলোর নাকের ওপর ধুম করে দরজা বন্ধ করল রানা। কাঁচের ওদিকে সাদা ঝিকঝিকে ক্ষুরধার দাঁত। তাগাদা দিল ও, 'চলুন, রওনা হওয়া যাক!'

অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে দিলেন হিমুরা। বনবন করে একই জায়গায় চাকা ঘুরিয়ে নুড়িপাথর ছিটকে রওনা হলো বেন্টলি। তৈরি হলো ধুলোর ঘন মেঘ। পেছনে পড়ে রইল উত্তেজিত কুকুর ও একদল সিকিউরিটি গার্ড।

'ওয়ান ওয়ে রোড নয় তো?' জানতে চাইল সোহেল।

'ভাববেন না,' বললেন হিমুরা, 'সামনেই সেকেণ্ডারি হাইওয়ে। সামনের পথ খোলা।'

পেছনের টিন্টেড কাঁচের ভেতর দিয়ে পেছনে তাকাল রানা।

'কাউকে দেখছি না,' বলল সোহেল।

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখেছেন হিমুরাও। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'অবাক কাণ্ড! প্যাসেঞ্জার নামিয়ে গেলাম সুটকোট পরা দু'জন, ফেরত পেলাম তিনজনকে। একজনের পরনে আবার পায়জামা। ব্যাপারটা কী, মিস্টার আহমেদ, আপনি কি কারও প্রেমিকাকে চুমু দিয়েছেন? নইলে এত ঝামেলা কীসের?'

'কোনও মেয়েকে চুমু দেয়ার সুযোগ পেলাম কই,' জানাল গম্ভীর সোহেল।

'সুপারইন্টেণ্ডেন্ট, পরিচয় করিয়ে দিই, ও হিনা,' বলল রানা, 'হিনা, ইনি জাপানি ফেডারেল পুলিশ অফিসার উবোন হিমুরা। উনি তোমাকে খুঁজছেন।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল মেয়েটা। চুপ করে আছে।

মৃদু হাসছেন হিমুরা। 'বুঝলাম, আজ বহু কিছুই ঘটেছে।'

'তা ঠিক,' বলল সোহেল।

রানা সংক্ষেপে জানাল, প্রথমে জুয়ায় দশ মিলিয়ন ইয়েন জিতে নেয়ার পর পেয়েছে সুন্দরী তরুণীকে, তারপর নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে প্রিয় বন্ধুকে। শেষে কুকুর ও গার্ডদের তাড়া খেয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে উঠেছে এই গাড়িতে।

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না,' বলল সোহেল, 'তবে এ-ও ঠিক, প্রতিদিন এসবই করে ছেলেটা। মিথ্যাও বলে না।'

একবার সোহেল ও রানার ছেলেমি দেখে মুচকি হাসি ফুটল হিনার মুখে। নরম সুরে বলল, 'আরেকটা কথা ভুলে গেছেন রানা, আমরা বিষ খাইয়ে দিয়েছি [illegible] পদের এক ইয়াকুযা নেতাকে।'

'তাতে আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা আরও কমল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল।

'সত্যি তো আর বিষ দিইনি,' বলল রানা। 'লকার রুমে ছিল এক বোতল ক্যাফেন পিল। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা কাজ

করতে হলে ওই জিনিস না খেয়ে উপায় থাকে না ক্লাবের বয় আর ওয়েট্রেসদের। পাঁচটা বড়ি গুঁড়ো করে গোখারো নাগিনোর ড্রিঙ্কে ফেলেছি। ক্যাফেনের তোড়ে লোকটার মনে হয়েছে যে-কোনও সময়ে বন্ধ হবে হৃৎপিণ্ড।'

'তবুও প্রতিশোধ নিতে পারে,' সতর্ক করলেন হিমুরা।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'নইলে ওকে বলতে হবে যে আমাদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

মাথা দোলালেন হিমুরা। 'দেখা যাক কতটা কাঁপে ইয়াকুযা সংগঠন। তাতে পুষিয়ে গেল কি না সেটাও বুঝতে হবে। এই গাড়ি মেরামত করতে কিন্তু বহু টাকা লাগবে।'

সিরিয়াস হলো রানা। 'আমরা জেনেছি দুর্গে হামলার পেছনে কে দায়ী। এক চাইনিয ব্যবসায়ী। নাম লো হুয়াং লিটন।'

চট্ করে ওকে দেখলেন পুলিশ অফিসার। 'লো হুয়াং লিটন?' গলার আওয়াজ খাদে নেমে গেছে তাঁর। 'তাই? সর্বনাশ! আপনারা বোধহয় ভুল জেনেছেন।'

'নিজ কানে শুনেছি,' বলল রানা। 'ওই লোকই দুর্গে হামলা করতে বলেছিল ওরে চিচিওয়াকে।'

'এর কোনও অর্থ বুঝতে পারছি না,' বললেন হিমুরা।

'কে লো হুয়াং লিটন?' জানতে চাইল সোহেল।

'হাই-টেক ম্যাগনেট,' বললেন অফিসার, 'বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এয়ারক্রাফট ও মেশিনারি পার্টস্ তৈরি করেন। চিনের হাজারো ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করেন আধুনিক সব রোবটিক সিস্টেম। জোর গলায় বলেন, চিন আর জাপানের উচিত শত শত বছরের সন্দেহ ও তিক্ততা পেছনে ফেলে একসঙ্গে কাজ করা। উঁচু পর্যায়ের লোক। মাঝে মাঝেই মিটিং করেন চিন-জাপানের হোমরাচোমরাদের সঙ্গে। তাঁর তো খাতির রাখার কথা নয় ইয়াকুযাদের সঙ্গে!'

'সেক্ষেত্রে তার কথা কেন বলবে মাঝারি পদের এক

ইয়াকুযা নেতা?' বলল রানা।

'বোধহয় ডাহা মিথ্যা বলেছে,' বললেন হিমুরা। 'প্রাণের ভয়ে।'

'নামের বেশিরভাগ অংশ চিনা, শেষাংশ পশ্চিমা,' বলল সোহেল। 'হঠাৎ করে ওই নাম মনে পড়ার কথা নয়।'

'গত কিছু দিনে বারবার খবরে এসেছেন,' বললেন হিমুরা, 'গতরাতে অংশ নেন স্টেট ডিনারে। এক সপ্তাহ পর উদ্বোধন করছেন নাগাসাকিতে নতুন প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি। ওখানেই নতুন চুক্তি হবে জাপান ও চিনের। সেখানে উপস্থিত থাকবেন তিনি।'

'তা হলে ভাবছেন টিভিতে লো হুয়াং লিটনকে দেখেছে বলে চট্ করে ওই নাম বলেছে নাগিনো?'

'হতে পারে।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। ভীষণ বিপদ হলে সত্যি কথা বলে মিথ্যুক লোক। তা করে বাঁচার জন্যে। ওই মুহূর্তে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল নাগিনো।'

চুপ থাকলেন হিমুরা। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। তবে সেক্ষেত্রে এটা খুব খারাপ খবর। এর মানে, শেষ হয়ে গেছে আমাদের তদন্ত।'

'তদন্ত শেষ কেন?' জানতে চাইল সোহেল।

'লো হুয়াং লিটন আমার নাগালের বাইরে,' বললেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট। 'দুই দেশের নাগরিকত্ব আছে তার। ওপর মহলে অসংখ্য ক্ষমতাশালী বন্ধু। একে বন্ধুর অভাব নেই, তার ওপর হাজারো কোটি ডলার। তাঁকে বলতে পারেন আনঅফিশিয়াল ডিপ্লোম্যাট। অত উঁচু মাপের কারও বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গেলে লাভ হবে না। পুলিশের ওপর মহলের অফিসাররা চুপ করিয়ে দেবেন আমাকে। বাধ্য করা হবে পাহাড়ি নির্জন কোনও গ্রাম পাহারা দিতে।'

‘তার মানে, ছোঁয়া যাবে না তাকে,’ বলল সোহেল।

থমথমে মুখে মাথা দোলালেন হিমুরা। ‘মিথ্যা নয়।’

‘কিন্তু ওরে চিচিওয়া তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিলে?’ বলল সোহেল। ‘তা হলেও কি আপনার সুপিরিয়ররা দ্বিধা করবেন লো হুয়াং লিটনের বিরুদ্ধে নামতে?’

‘হয়তো তদন্ত করবেন তাঁরা,’ বললেন হিমুরা, ‘কিন্তু আগে চাই চিচিওয়াকে। আমরা জানিও না দেখতে কেমন সে। আর আজ যা হলো, এরপর সে বাতাসে মিলিয়ে যাবে।’

‘ট্র্যাকিং নেটওঅর্ক চালু করলেই পাবেন তাকে,’ বলল সোহেল, ‘তার পকেটে আছে আপনার দেয়া কয়েন।’

সবার চোখ চলে গেল ওর দিকে।

রানাকে বলল সোহেল, ‘তুই যখন জুয়া খেলছিস ক্যাসিনোয়, আমি তখন কাজে ব্যস্ত।’

‘কিন্তু তুই না তখন এরিনায়?’

‘নাহ্, ছিলাম লবিতে।’

‘তখনই আপনাকে চিনে ফেলেছিল কেউ,’ আন্দাজ করল হিনা।

‘হ্যাঁ, চিনেছিল,’ বলল সোহেল। ‘স্বয়ং ওরে চিচিওয়া! ওকে খুঁজে নেয়ার আগেই ব্যাটা নিজে চড়াও হলো আমার ওপর। তখনই ওর শার্টের পকেটে ঢুকেছে কয়েন। সৌভাগ্যের জিনিস, না ফেলে থাকলে অনায়াসেই অনুসরণ করতে পারবেন অফিসার হিমুরা।’

মৃদু মাথা দোলাল রানা। ‘কাজের কাজ করেছিস।’

‘তা হলে এবার ধরতে পারব তাকে,’ বললেন হিমুরা।

‘আমরা কোনও সাহায্যে আসব?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না, এরই ভেতর অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন,’ বললেন পুলিশ অফিসার। ‘ওরে চিচিওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজ রাতে আরেকটু হলে আমার কারণে খুন হতেন। এবার সঙ্গে ক’জন বিশ্বাসী অফিসারকে নিয়ে খুঁজে নেব ওকে।’

'বেশ,' বলল রানা। 'আশা করি মিস্টার হুয়াঙের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বাধা দেবেন না?'

মাথা নাড়লেন হিমুরা। 'তা করব না। তাঁকে পাবেন নাগাসাকিতে। পরশু সাগরতীরে তাঁর ফ্যাসিলিটিতে বক্তৃতা দেবেন। সতর্ক থাকবেন। বিলিয়নেয়ার, তার ওপর দু'দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বন্ধুর অভাব নেই তাঁর। সত্যি ওরেকে ভাড়া করে থাকলে, যা ভেবেছি তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক মানুষ তিনি।'

ছাব্বিশ

মেইন ডেকে ভিড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটছে তানিয়া। চারপাশে গাদা করে রাখা লাগেজ, বাদ পড়েনি প্যাসেজওয়ে। বেশিরভাগ যাত্রী হতদরিদ্র, সাধ্য নেই ভাড়া নেবে কেবিন। অবশ্য বুদ্ধিমানরা দল তৈরি করে কিনেছে টিকেট। একেকটা কেবিন ইঁদুরের খুপরির মত, সেখানে বসেছে ছয় থেকে আটজন।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা। ওসাকা থেকে পুব চিন সাগর পাড়ি দিয়ে শাংহাই-এর দিকে চলেছে প্রকাণ্ড ফেরি।

আজ সকালের আকাশ ধূসর ও বিষণ্ণ। বাইরে ঝরছে হিমঠাণ্ডা বৃষ্টি। তাই নিচের বদ্ধ পরিবেশে রয়ে গেছে বেশিরভাগ যাত্রী। ওপরের ডেকে কেউ নেই।

পথ খুঁজে নিয়ে ওদের কেবিনে ফিরে তানিয়া দেখল, শরীরের তুলনায় অনেক ছোট ডেস্কে বসে আছে আসিফ।

তানিয়া জানতে চাইল, 'কী অবস্থা?'

ঝুঁকে চার্ট দেখছে আসিফ। ঠিক করছে ভবিষ্যৎ পযিশন। 'এখন জানি কোথায় আছি। ভাবছিলাম হঠাৎ কোথায় গেলে।'

'হারিয়ে গিয়েছিলাম,' বলল তানিয়া। 'তারপর স্মৃতির সাহায্যে ফিরলাম। সাইন সব চাইনিয। কোথাও ইংরেজি নেই।' স্বামীর হাতে কাগজের গরম কাপ ধরিয়ে দিল ও।

'কফি?'

'গ্রিন টি,' বলল তানিয়া। 'আর কিছু নেই।'

হতাশার ছাপ পড়ল আসিফের চোখে।

'গ্রিন টি শরীরের জন্যে ভাল,' বলল তানিয়া।

মাথা দোলাল আসিফ। 'ওপরের কী হাল?'

'ওপরের ডেকে কেউ নেই,' জানাল তানিয়া। 'বরফের মত ঠাণ্ডা পরিবেশ।'

'আমাদের জন্যে ভাল,' মাথা দোলাল আসিফ। 'যা ভেবেছি, তার চেয়েও কাছে পৌঁছেছি টার্গেট এরিয়ার। এবার জাগাতে হবে দাঁড়কাকের সিস্টেম।'

'সময় লাগবে না।' ল্যাপটপের সামনে বসল তানিয়া। ওদিকে কেবিনের জানালা খুলল আসিফ। দমকা হাওয়ার তাড়া খেয়ে বেরিয়ে গেল ভাপসা গরম।

'নোনা হাওয়া পেলে আবার কফি লাগে নাকি?' বলল তানিয়া।

'আমার মত লোকের লাগে,' বলল আসিফ। জানালার পাশে থেমে লাগেজ থেকে বের করল গুটিয়ে রাখা কেবলের বাণ্ডিল। ওটার শেষমাথায় মুচড়ে বসাল ওঅটারপ্রুফ ট্র্যান্সমিটার। জানালা দিয়ে বাইরে ফেলল কেবল। জাহাজের গায়ে চুমু দিয়ে দমকা হাওয়ায় দুলে সাগরে গিয়ে পড়ল ওটা।

'ট্র্যান্সমিটার পানিতে,' বলল আসিফ। 'প্রার্থনা করো, যাতে জানালা দিয়ে উঁকি না দেয় কেউ। কালো কেবল দেখলে ভাববে, জাহাজের বাইরে ওটা কী করছে।'

'ভেবো না, সবাই ভেতরে, জানালার ধারেকাছে যাবে না এই বৃষ্টিতে,' বলল তানিয়া। 'আমি ট্র্যান্সমিট করতে তৈরি।'

'ঠিক আছে।'

কি-বোর্ডে টোকা দিল তানিয়া। সিগনাল পাঠিয়ে দিল দাঁড়কাকের কাছে। তাতে জেগে উঠল রোভ। ক'সেকেণ্ড পর পাল্টা দিল সিগনাল। কমপিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠল রিমোট কমাণ্ড অপশন। যে-কেউ ভাববে ওটা ভিডিয়ো গেমের ডিসপ্লে। রয়েছে ভার্চুয়াল কন্ট্রোল ও ডায়াল। সেগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে রোভের ওঠা-নামার গতি ও ক্যামেরা। স্ক্রিনের একপাশের ডিসপ্লে থেকে জানা যাবে ম্যাগনেটোমিটার ও অন্যান্য সেন্সরের রিডিং।

'সব সিস্টেমের বাতি সবুজ,' বলল তানিয়া, ''জাহাজ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি ওটাকে।'

বাটন টিপতেই অফ হলো ইলেকট্রোম্যাগনেট, ফেরির খোল থেকে খসে পড়ল রোভ। ঘুরন্ত প্রপেলার থেকে দূরে সরল ওটা, তারপর বাঁক নিয়ে নামতে লাগল সাগরতল লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ শুধু দেখা গেল বিক্ষুব্ধ পানি, তারপর জাহাজের কাছ থেকে সরে শান্ত পানিতে পৌঁছুল রোভ।

'নতুন কোর্স?' জানতে চাইল তানিয়া।

'প্রায় সরাসরি দক্ষিণে টার্গেট এরিয়া,' চার্ট দেখল আসিফ, 'কোর্স ধরো ওয়ান-নাইন-ওয়ান।'

কি টিপে কোর্স ও ডাইভ অ্যাংগেল ঠিক করল তানিয়া। এবার নিজ কাজ করবে রোভ। ওর নিজের আর কিছু করার নেই। তিন মাইল দূরে টার্গেট যোন। ওখানে পৌঁছুতে লাগবে প্রায় বাইশ মিনিট।

'নিশ্চয়ই চার্জ করে তারপর দিয়েছ ব্যাটারি?'

মৃদু হাসল আসিফ। 'এয়ারপোর্টে ওটা নেয়ার সময় আমার প্রথম কাজই ছিল ব্যাটারি দেখে নেয়া।'

চুপচাপ অপেক্ষা করল ওরা। নির্দিষ্ট গতি তুলে

অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগরতলে চলেছে রোভ। মাঝে মাঝে একটা দুটো ইন্সট্রুমেন্ট চেক করছে তানিয়া। কিছুক্ষণ পর অস্বাভাবিক কিছু দেখল ও। 'এটা চেক করে দেখো।'

ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকল আসিফ। 'কী দেখব?'

'রোভের স্পিড এগারো নট। কিন্তু পযিশন মার্কার দেখাচ্ছে মাত্র সাত নট। সামনে থেকে আসছে জোরালো স্রোত।'

'তা হওয়ার কথা নয়,' চার্টের দিকে তাকাল আসিফ। 'আমাদের বর্তমান লোকেশন, আর বছরের এ সময়ে স্রোত যেমন, তাতে পেছন থেকে রোভটাকে দক্ষিণে ঠেলবে।'

'অথচ সামনে থেকে আসছে চার নটিকাল বেগের স্রোত,' বলল তানিয়া।

'এর কারণ আমরা হয়তো গত চারঘণ্টা দক্ষিণের বদলে শিপিং লেনের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। নিচের প্রোফাইলের কী হাল?'

আরেকটা কি টিপল তানিয়া। স্ক্রিনে ফুটে উঠল রোভের নিচের সাগরতলের গ্রাফিক ডিসপ্লে। 'রুটির মত সমতল।'

'তা হলে আমার *পার্বত্য এলাকা থিয়োরি* মার খেয়ে যাচ্ছে,' বলল আসিফ।

'আমরা এখনও টার্গেট যোন থেকে ক'মাইল দূরে।'

মাথা নাড়ল আসিফ। 'নিচে পার্বত্য রেঞ্জ থাকলে সেডিমেন্ট লেয়ার ফাটিয়ে উঠবে টিলার মত ঢিবি। তা হলে আগেই ওপরে উঠবে সাগরের মেঝে।'

রিডআউট দেখছে তানিয়া। কোথাও ওঠেনি সাগরের মেঝে। 'দেখা যাক টার্গেট যোন। ওখানে অস্বাভাবিক কিছু না দেখলে তখন অন্য কথা ভাবা যাবে।'

'কী ভাবব? ভাবারই তো সুযোগ নেই।' হতাশ হয়ে গেছে আসিফ।

এক হাতে চা-র কাপ নিল তানিয়া, অন্যহাতে টিপল কি-

বোর্ড। দেখছে সব রিডিং। ভার্চুয়াল টপোগ্রাফি, ওঅটার টেম্পারেচার ও স্যালিনিটি লেভেল। তিন ধরনের গ্রাফের ডিসপ্লে দেখাচ্ছে কমপিউটার। কিন্তু সেসব উল্টোপাল্টা ডেটা দেখে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছে তানিয়া-আসিফ দু'জনেই।

'যন্ত্রপাতি নষ্ট হলো?' চায়ের কাপ টেবিলে রাখল তানিয়া।

'এমন ভাবছ কেন?'

'টেম্পারেচার প্রোফাইল অনুযায়ী, রোভ আরও নেমে যেতেই বাড়ছে সাগরের তাপমাত্রা।'

তানিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে স্ক্রিন দেখল আসিফ। 'হয়তো কোনও থার্মোক্লাইনের ওপর দিয়ে গেছে রোভ।'

'না, তেমন কিছু দেখিনি,' বলল তানিয়া। 'খুব ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রা। প্রতি সত্তর ফুটে এক ডিগ্রি করে। এ থেকে মনে হচ্ছে, সাগরে মিশছে প্রচুর পরিমাণে গরম পানি।'

'লবণের পরিমাণ কেমন?' জানতে চাইল আসিফ।

কি টিপে স্ক্রিনে আরেকটা সেন্সর রিডিং আনল তানিয়া। 'তাপমাত্রার চেয়েও বিদঘুটে অবস্থা স্যালিনিটির। রোভ নিচে যাচ্ছে, আর কমছে সাগরের লবণ!'

'কিন্তু এটা হতে পারে না। সেন্সর প্রোব ডায়াগ্নস্টিক রিপোর্ট দেখো। হয়তো যন্ত্রপাতি নষ্ট।'

রোভের সেন্সর ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করতে শেখানো হয়নি তানিয়াকে। দূর থেকে যন্ত্রপাতি মেরামত দূরের কথা! 'ববি মুরল্যাণ্ড হয়তো কিছু করতে পারতেন,' বলল তানিয়া। 'আমাকে শুধু শেখানো হয়েছে কীভাবে চালাতে হবে রোভ।'

'ওটাকে এক শ' ফুট ওপরে তোলো,' বলল আসিফ।

'তাতে কী লাভ?'

'সেন্সর ভুল তথ্য দিলে আগের মতই বাড়বে তাপমাত্রা,' বলল আসিফ। 'কিন্তু যদি এমন হয় যে এসব রিডিং ঠিকই আছে, তো পাব ইনভার্টেড টেম্পারেচার প্রোফাইল। সেক্ষেত্রে

জানব আবারও ঠাণ্ডা হচ্ছে পানি।'

'ভাল বুদ্ধি,' মাথা দোলাল তানিয়া। ডাইভ অ্যাংগেল পাল্টে ওপরে তুলছে রোভ। 'কমে যাচ্ছে তাপমাত্রা, বাড়ছে লবণ। ঠিকভাবেই চলছে সেন্সর। ...এবার কী করব?'

'আগের কোর্স ধরে চলো,' বলল আসিফ।

সন্তুষ্ট হলেও অবাক লাগছে তানিয়ার। অ্যাডজাস্ট করল ডাইভ প্রোফাইল। নামছে রোভ। পাঁচ শ' ফুট গভীরতায় ওটাকে নিল তানিয়া। কাছ থেকে দেখছে বিস্তৃত এলাকা। নিচু গলায় বলল, 'এখনও সমতল।'

'অবাক কাণ্ড,' বলল আসিফ। 'ইস্ত্রি করা শার্টের চেয়েও মসৃণ।'

'তা হলে তৈরি হচ্ছে না মাউন্টেন রেঞ্জ,' বলল তানিয়া, 'কিন্তু তাপমাত্রা আর লবণের তথ্য একটা আরেকটার উল্টো। এর কী ব্যাখ্যা দেবে?'

'আপাতত ব্যাখ্যা নেই,' আবারও চার্ট দেখল আসিফ। 'প্রায় পৌঁছে গেছি শিমেযুর ভূমিকম্প এলাকায়। এবার যেতে হবে পশ্চিমে।'

কি টিপে রোভের গতি ঠিক করল তানিয়া। পাল্টে গেল রিডআউট। 'নতুন কিছু হচ্ছে।'

'টিলা বা ঢিবি?' আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'না, সামনে গভীর খাদ। নিচে মনে হচ্ছে ক্যানিয়ন।'

চার্টে দেখানো হয়েছে ওই এলাকা সমতল। সাগরের মেঝে ছুঁয়ে চলেছে রোভ। সামনেই ভি আকৃতির চওড়া খাদ। ওটা তীরের মত, ডগা তাক করা শাংহাই-এর দিকে।

'খাদে নেমে দেখো কী আছে।'

ভি আকৃতির ক্যানিয়নের দিকে রোভ নিল তানিয়া। 'বাড়ছে তাপমাত্রা। কমছে লবণাক্ততা।'

যুক্তির বাইরে ঘটছে এসব। মিঠা পানির চেয়ে ঘন হয় লবণাক্ত পানি, তাই সাগরতলে গভীর খাদ বা ক্যানিয়নের দিকে

নামে। পাহাড়ি রেঞ্জের গ্লেসিয়ারের ক্ষেত্রেও নিচে থাকে লবণাক্ত পানি।

সব সাগরের নিচেই আছে এসব লবণভরা পুকুর বা স্রোত। ওগুলোকে ওশনোগ্রাফাররা বলেন সাগরতলের নদী। সাগরের অন্য পানির সঙ্গে মোটেই মিশ খায় না।

ক্যানিয়নে দাঁড়কাক নামতেই বাতি জ্বালল তানিয়া। ক্যামেরায় দেখল চারপাশে সেডিমেন্ট। যেন আকাশ থেকে পড়ছে তুষার কণা।

'এক হাজার ফুট,' বলল তানিয়া।

'দাঁড়কাকের গভীরে নামার ক্ষমতা কতটুকু?'

'তিন হাজার ফুট,' বলল তানিয়া। 'কিন্তু তৈরি করেছেন ববি মুরল্যাণ্ড, ধরে নিতে পারো ছয় হাজার ফুট পর্যন্ত কিছুই হবে না ওটার।'

সোনার রিডিং থেকে ওরা দেখছে সরু হচ্ছে ক্যানিয়ন।

'উঠে আসছে তলদেশ,' বলল তানিয়া। 'পুরো ঘুরে দেখতে চাও?'

'পয়সা দিচ্ছে এজন্যেই,' বলল আসিফ। 'নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করাই ভাল।'

দাঁড়কাকের নতুন কোর্স ঠিক করল তানিয়া। একটু পর বলল, 'এগোতে হচ্ছে জোরালো স্রোত ঠেলে। নামছি পাঁচ ডিগ্রি অ্যাংগেল ধরে। নিচে যেতে ব্যবহার করছি থ্রাস্টার।'

'স্রোত উঠে আসছে ক্যানিয়ন থেকে?'

মাথা দোলাল তানিয়া। 'বুঝলাম না কেন এমন হচ্ছে।'

সোনার স্ক্যানে কী যেন দেখাতে চাইল আসিফ। 'ওটা কী?'

দাঁড়কাকের গতিপথ সামান্য বদলে নিল তানিয়া। ক্যানিয়নের নিচে ঢিবির মত কী যেন। ওদিকে এগোতে গিয়ে লড়ছে রোভ। ওদের মনে হলো, তুমুল বেগের বাতাসের বিরুদ্ধে লড়ছে উড়ন্ত কোনও পাখি। আরও কাছে যাওয়ার পর

দেখল ঢিবিটা কোন্ আইসক্রিমের মত। ওটার ওপর দিয়ে যেতেই আরেক দিকে ছিটকে সরে গেল রোভ।

ঘুরে আবারও ওদিকে যাবার আগেই সামনে পড়ল আরেকটা ঢিবি। একটু দূরে তৃতীয়টা। তলদেশে আছে আরও বহু।

‘এগুলো কী?’ আনমনে বলল তানিয়া।

‘বোধহয় জানি,’ বলল আসিফ, ‘এগোতে থাকো।’

এঁকেবেঁকে চলল রোভ। সামনে বিস্তৃত হয়েছে ক্যানিয়ন। মেঝেতে দেখা গেল অন্তত এক ডযন ঢিবি।

‘একটার খুব কাছে যাব,’ বলল তানিয়া।

ফুল পাওয়ারে ঢিবির চূড়ায় উঠছে রোভ। ঠিকভাবে কাজ করছে ক্যামেরা। চূড়া থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে পলি মাটি। দেখাচ্ছে আগ্নেয় ছাইয়ের মত।

‘পাতাল উষ্ণপ্রস্রবণ,’ জানাল আসিফ, ‘উঠছে তীব্র বেগে।’

‘ভূ-তাপীয়?’

‘অবশ্যই।’

‘চূড়ায় উঠে দেখি,’ বলল তানিয়া। ‘আন্দাজ করা যাবে কী পরিমাণ পানি উঠছে। স্যাম্পলও নিতে পারব।’

‘ভাল হয়,’ বলল আসিফ।

চূড়ার দিকে রোভ তাক করল তানিয়া। কিন্তু কয়েক ফুট যেতেই ছিটকে ওঠা পানির স্রোতে পড়ল দাঁড়কাকে। ঝটকা দিয়ে উঠতে গিয়ে পরক্ষণে কাত হয়ে মেঝের দিকে চলল রোভ। স্রোত এতই জোরালো, গ্রীষ্মকালীন হাওয়ায় ভর করা পাতলা কাগজের মত উড়ে গেছে ভারী যন্ত্র।

ছিটকে ওঠা পানি থেকে রোভ সরে আসায় আবারও নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল তানিয়া। ‘পানির তাপ প্রায় দুই শ’ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।’ আরেকবার রিডিং দেখল। ‘স্যালিনিটি যিরো।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল আসিফ।

‘আগে কখনও এই জিনিস দেখিনি।’

‘মিড-আটলান্টিক রিজ?’ মনে করিয়ে দিল তানিয়া। ‘কালো ধোঁয়ার মত।’

‘এক নয়,’ বলল আসিফ, ‘ওগুলো থেকে বেরোয় নানা বিষাক্ত পদার্থ। সেসব আগ্নেয়গিরির আবর্জনা। কিন্তু নিচের ওই পানি ঠাণ্ডা করে খেতে পারবে, কোনও ক্ষতি হবে না।’

‘গরম রাখলে কফি তৈরি করতে পারবে।’ হাসল তানিয়া।

‘এতক্ষণে ভাল কথা বলেছ,’ বলল আসিফ। ‘যাওয়ার পথে কয়টা কোন্ আইসক্রিম দেখলে?’

‘অন্তত পঞ্চাশটা,’ বলল তানিয়া।

‘আরও আছে কি না দেখতে হবে।’

আবারও ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে চলল দাঁড়কাক। পরের বিশ মিনিটে দেখা গেল শতখানেক পানি উৎক্ষেপক ঢিবি। সামনে বোধহয় রয়েছে আরও অনেক।

‘লোহার পরিমাণ বাড়ছে পানিতে,’ ম্যাগনেটোমিটার দেখছে তানিয়া। ‘তবে যে-কোনও সময়ে হারাব সিগনাল।’

‘ম্যাক্সিমাম ট্র্যান্সমিশন রেঞ্জের কাছে পৌঁছেছে রোভ,’ বলল আসিফ। ‘এবার হারিয়ে যেতে পারে।’

কোর্স ঠিক করল তানিয়া। কমেছে ইমেজ ট্র্যান্সমিশনের পিক্সেল। ছবি হয়ে উঠছে ঝাপসা। একবার জমাট বেঁধে আবারও পরিষ্কার হলো দৃশ্য।

‘থামো,’ সতর্ক করল আসিফ।

‘হঠাৎ করেই উঠছে ক্যানিয়নের মেঝে,’ জানাল তানিয়া।

ক্যামেরার দৃশ্য ফ্রিয হয়েও আবার পরিষ্কার হলো, পরক্ষণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচের পলিমাটিতে আছড়ে পড়ল রোভ।

‘যাহ্, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল,’ মাথা নাড়ল আসিফ।

কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করে রোভ তুলতে চাইছে তানিয়া। ‘কপাল ভাল কোনও আরোহী নেই।’

পলির মাঝে রোভ গেঁথে যাওয়ায় চারপাশের পানি এখন কাদাটে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য কিছুক্ষণ পর রিসেট হলো লিঙ্ক। চালু হলো ক্যামেরা। প্রথম দৃশ্যেই দেখা গেল ধাতব জঞ্জাল।

'নিচে কাজ করেছে কারা যেন,' বলল আসিফ।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সায় দিল তানিয়া। দেখা গেল মুচড়ে যাওয়া স্টিলের পাইপ ও প্লেটিং। অতীতে যা-ই করা হোক, এখন চাপা পড়েছে প্রায় সব।

বাতি জ্বেলে নানাদিকে ক্যামেরা তাক করছে তানিয়া। চালু করল ভিডিয়ো। তাতে ওরা দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। আনমনে বলল তানিয়া, 'একটা হাত।'

ক্যামেরার দিকে তাক করা ফ্যাকাসে সাদা হাত। যেন বছরের পর বছর ধোলাই হয়েছে। মনে হলো না মানুষের। নিখুঁত। চকচকে। হাতের শেষে স্টিলের তৈরি আঙুল।

'ইন্টারেস্টিং,' বিড়বিড় করল আসিফ।

পলি মাটিতে আটকা পড়েছে রোভ, তবে ওর্টার থ্রাস্টার সরিয়ে দিচ্ছে কাদা। ক'মুহূর্ত পর ওরা দেখল একটা কাঁধ... তারপর কাদার মাঝে একটা মুখ। যেন তৈরি সাদা কাঁচের। যে-কারও মনে হবে ওটা অ্যাথেনা থেকে খুঁড়ে তোলা কোনও মূর্তি।

'সুন্দরী,' মন্তব্য করল আসিফ।

'ও একটা মেশিন,' আপত্তি তুলল তানিয়া।

'মেশিনও সুন্দর হতে পারে।'

মাথা দোলাল তানিয়া। আসিফের কথা ঠিক। তবে এই মেশিনটা প্রায় মানুষের মতই দেখতে। নড়াচড়া করলে মনে হতো সত্যিকারের মানবী। মুখটা বিষণ্ন। ওপর দিকে চেয়ে আছে খোলা চোখ, যেন একদিন কেউ উদ্ধার করবে তাকে।

আর কিছু দেখার আগেই হঠাৎ হারিয়ে গেল সিগনাল। চিরকালের জন্যে সাগরতলে রয়ে গেল ওদের রোভ।

সাতাশ

বেইজিঙের আকাশ গাঢ় ধূসর, ঝরঝর ঝরছে পেঁজা তুলোর মত ধবল তুষার। তিয়েনানমেন স্কয়্যার পার হয়ে হাঁটছে যেইন নিং। একটু দূরেই ফারের হ্যাট ও গাঢ় সবুজ আলখেল্লা পরে মাও সেতুঙের সমাধি পাহারা দিচ্ছে চিনা সৈনিকরা।

তাদের পাশ কাটাবার সময় পুরনো কৌতুক মনে পড়তেই হাসল যেইন নিং। ওই সমাধিতে সৈনিক আছে চোর-ডাকাত ঠেকাতে, নাকি আটকে রাখতে চেয়ারম্যান মাও-এর ভূতটাকে?

পরের কথাই ঠিক। আড়াই দশকেরও আগে হারিয়ে গেছে মাও-এর কমিউনিযম। চিন এখন দুনিয়া-সেরা উদ্যমে ভরা পুঁজিবাদী দেশ। নিং-এর দৃষ্টিতে আপাতত এ দেশ এমন হলেও ভবিষ্যতে জয় করে নেবে গোটা পৃথিবী।

নামকরা এক জায়গা পাশ কাটাল যেইন নিং। ওখানে নিঃসঙ্গ এক প্রতিবাদী রুখে দাঁড়িয়েছিল বলে তাকে পিষে দেয় মাও সেতুঙের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ট্যাঙ্ক। কোথাও নেই মানুষটার নামে কোন স্তম্ভ। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ শান্তিপ্রিয়, মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে রয়ে গেছে সে চিরকালের জন্যে।

স্কয়্যারের পশ্চিমে যেইন নিঙের গন্তব্য। ওটা বিশাল দালান। তিন ধাপের সিঁড়ি বেয়ে আকাশ-ছোঁয়া মার্বেল কলামের মাঝ দিয়ে গ্রেট হল অভ দ্য পিপল-এ ঢুকল বৃদ্ধ।

চওড়ায় হাজার ফুটেরও বেশি এ দৈত্যাকার ভবন, সামনে

থেকে শুরু করে পেছন দিক পর্যন্ত ছয় শ' ফুট। মস্ত ছাত প্রায় দু'মিলিয়ন স্কয়্যার ফিটের— আমেরিকার ক্যাপিটল বিল্ডিং, ব্রিটেনের ওয়েস্টমিন্স্টার বা ওয়াশিংটন ডি.সি.-র মলের স্মিথসনিয়ান মিউযিয়ামের চেয়েও বড়।

গ্রেট হল অভ দ্য পিপল-এর বুকে আছে প্রমাণ আকারের কয়েকটি অডিটোরিয়াম, এক শ'র বেশি অফিস, কনফারেন্স রুম ও ওঅর্ক এরিয়া। চাইনিয কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দালানের দক্ষিণে যেইন নিংকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বিলাসবহুল অফিস। ক্ষমতাশালী মানুষ, তাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল গার্ডরা। বিনা দ্বিধায় পেরোল সে চেকপয়েন্ট। করিডোর শেষে দেখল তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো এক বন্ধু।

'হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল, বহু দিন পর দেখা,' অফিসের দরজায় থামল যেইন নিং।

'একটা খবর দিতে এসেছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটাকে সতর্কবাণীও বলতে পারেন।'

চাইনিয কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর প্রচণ্ড ক্ষমতা যেইন নিং-এর। তবে পার্টির কেউ কেউ মনে করেন, ভবিষ্যতেও চিনের অর্থনৈতিক গতি এমনই হবে। তাই দরকার নেই বাড়তি প্রচেষ্টার। অবশ্য, নিং মনে করে, ওসব লোকের ধারণা নেই মহাচিনের রাশ টেনে ধরেছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা।

'সতর্কবাণী?' বলল নিং। 'তা কি ব্যক্তিগত? নাকি অন্য কোনও বিষয়ে?'

'দুটোই,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'আমাদের বোধহয় ভেতরে গিয়ে আলাপ করা উচিত।'

দরজা খুলে অফিসে ঢুকল যেইন নিং। অ্যাডমিরালকে নিয়ে বাইরের অফিস পার হয়ে প্রবেশ করল ব্যক্তিগত কক্ষে। এ কামরার একপাশে হটহাউস। ঝুলন্ত টবে নানান গাছ ও লতা। অন্যপাশে প্রাচীন আসবাবপত্র। টেবিলে গাদি করে রাখা পুরনো সব বই।

নরম গদিওয়ালা চেয়ারে বসতে ইশারা করল নিং। অ্যাডমিরাল যেং বসতেই তাঁকে পাত্তা না দিয়ে দেখল প্রিয় গাছগুলোকে। দুঃখিত স্বরে বলল, 'গরম ওদের জন্যে ভাল নয়। শুকিয়ে যায় পাতা। তবে ঠাণ্ডাও খারাপ।'

'আমাদের মতই সমস্যা,' বললেন অ্যাডমিরাল। একটু বিরতি নিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি কখনও অবসরে যাওয়ার কথা ভেবেছেন?'

টব থেকে শুকনো পাতা নিয়ে ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলল নিং। 'আমার মত মানুষের অবসরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। দায়িত্ব পালন করতে করতেই একসময়ে বিদায় নেব। মারা যাব অথবা খুন হব।'

'ঠিক, খুন হব বড় ভুল করলে,' হাসলেন অ্যাডমিরাল।

পাল্টা হাসল নিং। ঠিকই বলেছে অ্যাডমিরাল। বড় ধরনের ভুল হলে দ্বিতীয়বার সুযোগ নেই চিনের রাজনৈতিক আঙিনায়। 'আপনি বলছেন সেরকম কোনও ভুল করেছি?'

'গুঞ্জন উঠেছে লো হুয়াং লিটন আর আপনাকে নিয়ে,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'আসলে সবার চোখ এখন আপনাদের পুব চিন সাগরের অপারেশনের ওপর।'

'তো?' মাথা নাড়ল নিং। 'ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এক বছর আগে।'

'তা ঠিক,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'এবং তারপর আপনার অনুরোধ পেয়ে এক বছর ধরে পাহারা দিচ্ছি ওই এলাকা। জানি না, আপনার লোক ওখানে কী করেছে, তবে অনেকের চোখ এখন ওদিকে। নানান প্রশ্ন তুলছে তারা।'

'আসলে কী বলতে চান, অ্যাডমিরাল?'

'প্রথমেই বলব ফিশারির কথা। বাঁচতে হলে এক শ' পাঁচ কোটি লোকের চাই প্রচুর খাবার। আমাদের ফিশিং ফ্লিট পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। দুনিয়ার প্রায় সব সাগরে মাছ ধরছে হাজার হাজার ট্রলার। আর চিনের পুব সাগর ছিল সবচেয়ে

উর্বর এলাকা। এখন আর তা বলতে পারবে না কেউ। আপনার এক্সপেরিমেন্ট শুরু হওয়ার পর প্রতি মাসে কমেছে মাছ উত্তোলন। বন্ধ্যা হয়েছে ওই সাগর। ওখানে যারা ট্রলার নিয়ে মাছ ধরত, জোরেশোরে অভিযোগ তুলছে তারা।'

'জেলেদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না আমাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল নিং, 'তা ছাড়া, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট ছিল সাগরতলে। বলতে পারেন ডিপ-সি মাইনিং। আপনি এটা ভাল করেই জানেন। আমরা কোনওদিক থেকেই সাগরের ইকোসিস্টেমের ক্ষতি করিনি। তবে শাংহাই শহরের দশ হাজার ফ্যাক্টরির দূষণের ফলে এমন হতেই পারে। এক বছর আগের ছোট্ট এক অপারেশনের জন্যে নয়।'

এ জবাবই পাবেন ভেবেছেন অ্যাডমিরাল হ্যাং যেং। 'আপনি কি বন্ধ করেছিলেন ওই অপারেশন?'

'আমার তো তা-ই ধারণা।'

'তা হলে কেন আমাদের নিষিদ্ধ এলাকায় গোপনে ঢুকল আমেরিকান সাবমারসিবল?'

কথাটা শুনে হোঁচট খেল নিং। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ওই একই প্রশ্ন আমিও তুলতে পারি, অ্যাডমিরাল। আপনারই দায়িত্ব, যাতে ওদিকে কেউ ঘুরঘুর না করে। ...কবে হয়েছে এমন?'

'আজ সকালে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমাদের চেনা আমেরিকান এক ফ্রিকোয়েন্সি থেকে দেয়া হয়েছে কোডেড শর্ট রেঞ্জ ট্র্যান্সমিশন। তার ওপর আমাদের সোনার বয়া থেকে জানা গেছে, ওদিকে গোপনে গেছে কোনও ভেসেল। তবে ওটা কোথায় আছে বোঝার আগেই হারিয়ে যায়।'

রাগ ছাপিয়ে দুশ্চিন্তা আসতেই নিং বলল, 'কী করে আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে ওদিকে গেল আমেরিকান সাবমেরিন?'

'ওটা নেভাল ভেসেল ছিল না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'খুব

ছোট সিগনেচার। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেই সাবমেরিন।'

'তার মানে, কোনও জাহাজ থেকে নামিয়েছে, অথবা ফেলা হয়েছে বিমান থেকে,' বলল নিং। 'আমি আবারও জানতে চাইব, ওটাকে ঠেকানো গেল না কেন?'

ব্যর্থতার জন্যে অন্যায়ভাবে অভিযোগ হানা হচ্ছে, টের পেলেন অ্যাডমিরাল হ্যাং যেং। 'আমি এটা বলতে পারি, কমরেড, আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নাক গলাতে আসেনি কোনও আমেরিকান এয়ারক্রাফ্ট্ বা ভেসেল। তবে আমরা জানি, গোপনে ওখানে গেছে কোনও রোভ।'

বড় করে দম নিল নিং। এখনও বন্ধুই আছে অ্যাডমিরাল, নইলে নিজে এসে এসব বলত না। মিথ্যা বলার কারণ নেই। সিকিউরিটি ফোর্সের দোষে চিনা এলাকায় আমেরিকানরা ঢুকলে, নিজেদেরকে রক্ষা করতে এ ধরনের রিপোর্ট পুড়িয়ে ফেলত অ্যাডমিরাল। বা মুছে দিত সব ডেটা। 'আপনি তা হলে বলছেন ওই এলাকায় আমেরিকান কোনও জাহাজ নেই?'

'না, নেই।'

জবাব পেয়েছে নিং। পুরনো বন্ধুর দিকে অভিযোগের আঙুল তাক করার আগে উচিত ছিল সতর্ক হওয়া। সূত্র দিয়েছে অ্যাডমিরাল। ওই সাবমারসিবল ছোট। অপারেট করা হয়েছে কোনও জাহাজ থেকে। আশপাশে ছিল না কোনও আমেরিকান জাহাজ বা সাবমেরিন। অর্থাৎ, ওই রোভ ছিল নুমার। গত দু'এক দিন আগে ওই সংস্থা থেকে জাপানে এক জিয়োলজিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গেছে এক বাঙালি জিয়োলজিস্ট, তার স্ত্রী এবং আরও দু'জন। তবে তারা নুমা এজেন্ট নয়। চারজনই ছিল বাংলাদেশি।

তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে লো হুয়াং। অথচ বলেছিল, মারা গেছে তারা। এবার নিজেই ব্যবস্থা নেবে নিং।

উঠে হাতের ইশারা করল সে। আপাতত মিটিং শেষ। 'খুবই খুশি হয়েছি নিজে থেকে এসে সতর্ক করেছেন, অ্যাডমিরাল। এটা বলতে পারি, সাগরের নিচে এমন কিছু নেই, যেটা দেখে বা পেয়ে সন্দেহ করবে নুমা। আমাদের পক্ষ থেকে আমেরিকান সরকারকে জানানো হবে, তাদের সংস্থা বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছে চিনের এলাকায়।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল হ্যাং যেং। 'সতর্ক থাকবেন, নিং। এই দেশ আর আগের মত নেই। বিত্তের সঙ্গে এসেছে ক্ষমতা। আর ওই বিত্ত এসেছে গত পঁচিশ বছরে। বদলে গেছে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি। এখন পার্টির ভেতর যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ভিন্ন একটি গ্রুপ, আপনি জানেন। হয়তো আপনাদের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী ওরা। অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণেই দিতে হচ্ছে এই মূল্য।'

অ্যাডমিরাল সতর্ক করছে, পরিষ্কার বুঝল যেইন নিং। অর্থনৈতিক রেললাইনে তুমুল বেগে ছুটছে এ দেশ। হঠাৎ যেন ছিটকে পড়ে না যায়, সেজন্যে যে-কোনও ব্যবস্থা নেবে চিনের বর্তমান বিত্তশালী মোগলরা। অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই তাদের। নিং-এর প্ল্যান সফল হলে যে শুধু তীব্র বেগে ছুটবে চিনের ট্রেন, তা-ই নয়, মাইলের পর মাইল উন্মুক্ত রেললাইন দেখবে সবাই।

সহস্রবারের মত আবারও ভাবল নিং: তা-ই হবে, তবে প্রথমে দমাতে হবে বড় সব হুমকিগুলোকে।

আটাশ

ফেরির ওপরের ডেক থেকে শাংহাই বন্দর দেখছে আসিফ রেজা। দূর দিগন্তে হারিয়ে গেছে অত্যাধুনিক মেট্রোপলিস। নানাদিকে রঙিন নতুন বাড়ি। শহরের বুক চিরে গেছে হাই-স্পিড ট্রেনের লাইন, চওড়া সব রাস্তা। শাংহাই ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে আসিফের... যদি নামতে পারে জাহাজ থেকে।

'হঠাৎ থামল কেন?' জানতে চাইল তানিয়া।

বন্দরের ডক থেকে এক মাইল দূরে থেমেছে ফেরি। ওদেরকে পাশ কাটাচ্ছে একের পর এক মালবাহী জাহাজ। কোনওটা যাচ্ছে বন্দরে, আবার কোনওটা যাচ্ছে সাগরে। দু'ঘণ্টা আগে ফেরিতে উঠেছে পাইলট, তারপর রাজহাঁসের মত সাগরে বসে দুলছে ফেরি।

'ব্যাপারটা বুঝছি না,' বলল আসিফ, 'ফেরির ইঞ্জিন চলছে। ওঠেনি মেইনটেন্যান্স ক্রু। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর শাংহাই। পাইলট হয়তো অপেক্ষা করছে ডকে ভিড়তে।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, এই থেমে যাওয়াটা স্বাভাবিক কিছু নয়,' বলল তানিয়া।

সায় দিয়ে মাথা দোলাল আসিফ।

ডেকে উঠে নিচু গলায় আলাপ করছে কয়েক শ' যাত্রী। বেশিরভাগই ফিরছে শাংহাই শহরে। দ্বিধা বা দুশ্চিন্তা নেই জাপানিস ব্যবসায়ী ও বিদেশি টুরিস্টদের মনে।

একটা ধূসর প্যাট্রল বোট আসতে দেখল সবাই। ওটায়

রয়েছে মেশিনগান, ছোট কামান ও ভয়ঙ্করদর্শন মিসাইল র‍্যাক। পতাকা চিনা নেভির।

'মনে হচ্ছে না বন্দরের কর্তৃপক্ষ।' আসিফের হাত ধরল তানিয়া। 'চলো, কেবিনে ফিরে কিছু খেয়ে নিই।'

'তাই ভাল,' বলল আসিফ। 'তা ছাড়া, কেবিনে জরুরি কাজও আছে।'

কাঁধে ব্যাকপ্যাক তুলে ভিড় এড়িয়ে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকল ওরা। সরু সিঁড়ি বেয়ে নামল নিচের ডেকে। করিডোর ধরে হেঁটে পৌঁছে গেল ওদের কেবিনের কাছে। তখনই ইন্টারকমে শুনল ঘোষণা। প্রথমে প্রচার করা হলো চিনা ভাষায়, তারপর জাপানি ভাষায়, এরপর ইংরেজিতে। 'যাত্রীগণ, ফিরে যান যে যার কেবিনে। পাসপোর্ট এবং মালামাল চেক হবে। তৈরি থাকুন।'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। 'লুকিয়ে পড়তে হবে, অথবা নামতে হবে ফেরি থেকে।'

দরজা খুলে কেবিনের ছাতে গুঁতো না খেয়ে ভেতরে ঢুকল ও। পিছু নিল তানিয়া। 'মনে হয় না কেবিনে থাকা ঠিক হবে।'

'চট্ করে সারতে হবে একটা কাজ,' জানালার পাশে পৌঁছে নিচের সাগর দেখল আসিফ। 'আমাদের কপাল ভাল, প্যাট্রল বোট ফেরির ওদিকে।' তানিয়াকে হাতের ইশারায় কটের পায়া দেখাল ও। 'ট্র্যান্সমিশন কেবল ওখানে বাঁধো।'

'সাঁতার কেটে তীরে উঠব?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'বাধ্য হলে,' বলল আসিফ, 'হাত লাগাও। বেশি সময় পাব না।'

নিচের ডেকে মেইন হ্যাচের কাছে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছেন ফেরির ক্যাপ্টেন, নার্ভাস। দেখছেন গ্যাংওয়ে নামিয়ে দেয়া হলো প্যাট্রল বোটের ডেকে। আটকে গেল লক। ফেরিতে উঠল বিশজন সৈনিক। পেছনে ক'জন অফিসার ও

সিভিলিয়ান পোশাক পরা এক লোক।

কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে যে আটকে দিয়েছে ফেরি, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি ক্যাপ্টেন। ভাল করেই জানেন, বাড়তি কথা বললে বিপদে পড়বেন। এতেই সন্তুষ্ট, বেআইনী কোনও মাল নেই তাঁর ফেরিতে।

সৈনিক ও অফিসারদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা পোশাক পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। সুট আরামদায়ক হলেও স্টাইলিশ নয়, কুঁচকে আছে। এগোতে গিয়ে ভারসাম্য টলে যাওয়ায় ধরলেন রেলিং। উঠে এলেন ফেরিতে। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল সৈনিক ও অফিসাররা। নরম সুরে ক্যাপ্টেনকে বললেন বৃদ্ধ, 'আমার নাম যেইন নিং।'

আরও নার্ভাস হলেন ক্যাপ্টেন। অত্যন্ত জরুরি কোনও কারণ দেখা না দিলে বন্দরের পুরনো ফেরিতে ওঠে না পার্টি অফিশিয়ালরা। প্রথম প্যাট্রলে বের হওয়া ক্যাডেটের মত অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। মাথার চুল বেয়ে সরসর করে কপালে নামছে ঘাম। 'আমার সৌভাগ্য যে এ ফেরিতে পা রেখেছেন, মন্ত্রী মহাদয়। আপনার যে-কোনও নির্দেশের জন্যে আমি তৈরি। আজ কী করতে পারি পার্টির জন্যে?'

দয়ালু হাসল নিং। 'দুশ্চিন্তা করবেন না, ক্যাপ্টেন। শুধু দেখুন, যাতে ফেরি থেকে কেউ নেমে যেতে না পারে। আপনার দুই যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে আমার লোক।'

কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে ওটা ক্যাপ্টেনের হাতে দিল মন্ত্রী যেইন নিং। ওখানে হলদে রঙে হাইলাইট করা দুটো নাম। ক্যাপ্টেন আগে কখনও এসব নাম শোনেননি। পার্সারকে ডাক দিলেন তিনি। জানা গেল ওই দু'যাত্রীর কেবিনের নম্বর। 'আমি নিজে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি,' মন্ত্রীকে বললেন ক্যাপ্টেন।

তিন ডেক ওপরে উঠে এল সবাই। হাঁটছে মেইন করিডোর ধরে। গটগট করে হাঁটছেন ক্যাপ্টেন। পেছনেই

সৈনিক ও অফিসাররা। বিস্মিত চোখে তাদেরকে দেখছে সাধারণ যাত্রীরা। ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছে পথ ছেড়ে।

একবার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন। পেছনে এখন তিনভাগের একভাগ সৈনিক। অন্যরা বোধহয় আটকে দিয়েছে জাহাজ থেকে নামার সব পথ।

দু'পাশের কেবিনের দরজায় সাঁটা নম্বর দেখতে দেখতে চলেছেন ক্যাপ্টেন। একটু পর থামলেন নির্দিষ্ট কেবিনের সামনে। 'এই যে, এটাই,' সরে দাঁড়ালেন তিনি।

এক অফিসারের দিকে ইশারা করল যেইন নিং। তাতে দরজার আরেকপাশে থামল সৈনিকরা। হাতে উদ্যত সাবমেশিন গান ও ব্যাটন। পিছিয়ে গেল মোষের মত এক সৈনিক, তারপর দৌড়ে গিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারল দরজার হ্যাণ্ডেলের ওপর। মড়াৎ করে ভাঙল তালা। দৌড়ে ব্যাটন হাতে ভেতরে ঢুকল দুই সৈনিক।

এল না কোনও প্রতিরোধ।

কেবিন সার্চ করতে লাগল সৈনিকরা। খুঁজে দেখল ছোট্ট বাথরুম আর ক্লসিট।

একটু পর কেবিন থেকে বেরোল এক সৈনিক। 'কেউ নেই, স্যর।'

এবার ছোট্ট কেবিনে পা রাখল যেইন নিং। পিছু নিলেন ক্যাপ্টেন। তচনচ হয়েছে কেবিন। উল্টে পড়ে আছে আসবাবপত্র, মেঝেতে দু'জনের বুটজুতো, পোশাক ও দুটো ব্যাকপ্যাক। তাড়াহুড়া করে পালিয়ে গেছে যাত্রীরা।

খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কালো একটা সরু কেবল। সোজা গেছে কেবিনের জানালার পর্দার ওদিকে। কেবলে হাত রেখে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরাল নিং। মুচড়ে ভাঙা হয়েছে হালকা অ্যালিউমিনিয়ামের ফ্রেম। নিচের সাগরে উঁকি দিল ক্ষমতাশালী মন্ত্রী।

ক্ষয়-ক্ষতি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'জানালা খুলত মাত্র আট

ইঞ্চি।'

'ঠিক। বেরোবার তুলনায় বেশ ছোট ছিল,' বলল যেইন নিং।

বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। জাহাজ থেকে বন্দরের কালচে সাগরে নেমেছে কেবল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কী হয়েছে। অফিসারদের উদ্দেশে বলল নিং, 'ওরা পানিতে নেমেছে। বোট নিয়ে সার্চ করবে। পালাতে যেন না পারে।'

'তীর এক মাইল দূরে,' জবাবে বলল এক অফিসার। 'স্রোত খুব জোরালো। তার ওপর বছরের এ সময়ে পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। সাঁতরে তীরে উঠতে গেলে ডুবে মরবে।'

মাথা নাড়ল যেইন নিং। 'এরা নুমার লোক। প্রশিক্ষিত ডাইভার। মাইলের পর মাইল সাঁতরাতে পারে। তা ছাড়া, তাদের সঙ্গে হয়তো থাকবে দরকারি ইকুইপমেন্ট, যেমন কম্প্যাক্ট রিব্রিদার বা অক্সিজেন বটল। এদেরকে ছোট চোখে দেখতে যাওয়া মস্তবড় ভুল হবে। আমি চাই তীরে টহল দেবে পুলিশের লোক। প্রয়োজনে সার্চ করার জন্যে যে-কোনও পরিমাণের বোট রেকুইযিশন করতে পারো।'

মন্ত্রীর কথায় বেল্ট থেকে রেডিয়ো নিয়ে নির্দেশ দিতে লাগল এক অফিসার। আরেকবার কেবিন দেখল যেইন নিং, তারপর ব্যাকপ্যাক দ্বিতীয়বার সার্চ করিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে। পিছু নিল সৈনিকরা। কেবিনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ফেরির ক্যাপ্টেন। জানালা দিয়ে আবারও দেখলেন সাগর। কোথাও নেই কোনও সাঁতারু। শুনলেন ফেরির ওদিক থেকে এদিকে আসছে নেভির বোট।

আমেরিকার এজেন্ট... নুমার লোক... প্রশিক্ষিত ডুবুরি... পার্টির বড় মাপের কর্মকর্তা ফেরিতে... বহু বছরের পর এত উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে ক্যাপ্টেনের মনে। ভাবতে লাগলেন এবার কী করবেন। তবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতেই বুঝলেন, মুখ বন্ধ রাখা ভাল। তিনি আসলে কিছুই জানেন না, এমন

ভাব করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উনত্রিশ

ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে জাহাজে বাড়ি মারছে ঢেউ, পরিষ্কার শুনছে তানিয়া। কিন্তু ক'সেকেণ্ড পর শুনল প্যাট্রল বোটের ইঞ্জিনের জোরালো গর্জন। ফেরির বো ঘুরে স্টারবোর্ডে গেল ওটা। ওদিকেই আছে ওদের কেবিনের জানালা দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া কেবল।

আসিফ ও তানিয়া আছে নিচের ডেকে। শেকলের স্তূপ থেকে স্বামীর দিকে তাকাল ও। মৃদু হেসে বলল, 'ভাল বুদ্ধি। জানালায় কেবল দেখে ভাববে নেমেছি সাগরে। নিশ্চয়ই যাচ্ছি তীরের দিকে। ওদিকে খুঁজতে শুরু করবে আমাদেরকে।'

অ্যাংকর চেইন লকার মানেই তেলতেলে, সংকীর্ণ বদ্ধ জায়গা। মেঝেতে শত শত ফুট ভারী চেইন। লোহার ছোট্ট ঘর স্বস্তিকর নয়, তবে লুকিয়ে পড়ার জন্যে চমৎকার।

'সুযোগ পেলে লুকিয়ে পড়তাম কার্গো হোল্ডে, কিন্তু সৈনিক দেখার পর উবে গেছে সে ইচ্ছে,' বলল আসিফ।

আরেকটু হলে কার্গো হোল্ডের কাছে এক দল সৈনিকের সঙ্গে দেখা হতো ওদের, তখনই নোঙর রাখার ঘরের কথা ভেবেছে আসিফ। দেরি না করে এসে ঢুকেছে লকারে, পেছনে ভিড়িয়ে নিয়েছে হ্যাচ। লোহার রেঞ্চ ব্যবহার করে গোঁজ দিয়েছে, যাতে হঠাৎ করে বন্ধ না হয় ল্যাচ।

'সত্যিই সবাই ভাববে কেবিন থেকে সাগরে নেমেছি,' স্ত্রীর

প্রশংসা করল আসিফ। 'তুমি না বললে বুটও খুলতাম না।' দু'পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়ল ও।

তানিয়ার কথায় বুট, ব্যাকপ্যাক ও অন্যান্য প্রায় সবই ফেলে এসেছে ওরা। সঙ্গে আছে শুধু ল্যাপটপ কমপিউটার। ওটা এখন প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে শার্টের নিচে রেখেছে আসিফ।

'লাগেজ নিয়ে সাঁতার কাটে না কেউ,' বলল তানিয়া। 'নির্ঘাৎ ধরা পড়তাম। কপাল ভাল, ঠিক সময়ে সরে আসতে পেরেছি।'

'ওরা কী করছে দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল আসিফ।

মেঝেতে স্তূপ হয়েছে ভারী শেকল। লোহার দেয়ালের গায়ে ফাটলের মত হওসহোল। শেকল ও খোলের পাশ দিয়ে স্টারবোর্ডের অংশ দেখছে তানিয়া। 'স্টার্নের দিকে গেছে। চেক করে দেখছে ফ্যানটেইলের নিচে।'

ক'মুহূর্ত পর জাহাজের পেছন ঘুরে ওদিকে গেল নেভির বোট। এদিকে এগিয়ে আসছে আরেকটা বোট। এরপর তৃতীয়টা। 'আরও সৈনিক,' বলল তানিয়া।

কিছুক্ষণ পর ওরা শুনল আবছা বিস্ফোরণের আওয়াজ। লোহার খোলের জন্যে বিকৃত হয়েছে শব্দ। একটু পর ফাটল আরও বোমা। দূর থেকে দূরে যাচ্ছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কাঁপছে জাহাজের খোল। আসিফ ও তানিয়ার মনে হচ্ছে, ওরা আছে বিশাল কোনও ঢাকের ভেতর।

'কী করছে বুঝতে পেরেছ?' জানতে চাইল তানিয়া।

'মৎস্যশিকার বলতে পারো,' বলল আসিফ। 'সেজন্যে ব্যবহার করছে ডিনামাইট অথবা গ্রেনেড।'

'বোমা মেরে জলের নিচে খুন করবে আমাদেরকে?'

মাথা দোলাল আসিফ। 'শকওয়েভে না মরে উপায় নেই ডুবুরির।'

সাগরের নিচে এক শ' ফুটেরও বেশি দূরে ছড়িয়ে পড়ে

প্রচণ্ড আওয়াজ ও বোমার শকওয়েভ। ফেটে যায় ডুবুরির কানের পর্দা, তৈরি হয় মারাত্মক কংকাশন। কাছাকাছি বোমা বিস্ফোরণ হলে মৃত্যু নিশ্চিত।

পরবর্তী বিশ মিনিট পানির নিচে ফাটল একের পর এক গ্রেনেড। আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর শোনা গেল ফেরির ইঞ্জিনের গর্জন। একমিনিট পর রওনা হলো বিশাল জাহাজ।

'একটু পর ডক করবে,' বলল তানিয়া।

'খুশি হতাম জাপানে ফিরতে পারলে,' বলল আসিফ। 'রাজি আছি এখানে বসে থাকতে। তবে কপাল মন্দ, সবার সঙ্গে আমরাও নেমে যাচ্ছি কি না সেদিকে চোখ রাখবে কর্তৃপক্ষ।'

'আর তারপর যখন দেখবে আমরা নেই, বা সাগরে পাবে না লাশ— তখন?' আসিফের দিকে তাকাল তানিয়া।

'নতুন করে আবারও খুঁজবে ফেরি, এবার তন্নতন্ন করে,' বলল আসিফ। 'এরপর কবে ফেরি আবার ফিরবে ওসাকায়, তারও ঠিক নেই। রয়ে যেতে পারি এখানে, অথবা প্রথম সুযোগে চেষ্টা করতে পারি নেমে পড়তে।'

'আমার ভোট বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে,' বলল তানিয়া। 'হয়তো কোনও পিয়ারে বাঁধবে ফেরি। তখন নিচে ফেলবে নোঙর। তখন জড়িয়ে পেঁচিয়ে মরতে চাই না।'

'নামার সময় লোহার ছোট্ট ঘরে প্রচণ্ড আওয়াজ করবে নোঙর,' বলল আসিফ। 'শেকলের প্যাঁচে পড়ে মরেও যেতে পারি। তবে এখান থেকে বেরিয়ে কার্গো হোল্ডে গেলে? এরই ভেতর ওই জায়গা সার্চ করেছে সৈনিকরা। ভাল দেখে একটা কন্টেইনারে উঠলে কেমন হয়?'

'শুনে ভালই তো লাগছে,' বলল তানিয়া, 'চলো, সেটাই করি।'

নোঙরের লকার ছেড়ে পঁচিশ মিনিট ব্যয় করে কার্গো হোল্ডে পৌঁছুল সতর্ক আসিফ ও তানিয়া। খুঁজে নিল তালা

ছাড়া এক কন্টেইনার। ভেতরে চারভাগের তিনভাগ ভরা চালের বস্তা। কিছু বস্তা সরিয়ে ওদের চারপাশে কন্টেইনারের ছাত পর্যন্ত নকল, উঁচু দেয়াল তৈরি করল ওরা। জাহাজে করে চাল নিলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, তাই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না ওদের।

এবার অপেক্ষার পালা।

একটু পর ডক করল ফেরি। মাল নামাতে এল একদল দক্ষ মজুর। দু'ঘণ্টা পর খুলে আবার আটকে দেয়া হলো কন্টেইনারের দরজা। ফোর্কলিফ্ট্ ভারী কন্টেইনার তুলল ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে। জাহাজ থেকে নেমে গেল যান্ত্রিক দানব। থামল ঘণ্টাখানেক চলার পর।

তানিয়া নিচু গলায় বলল, 'সরে এসেছি অন্তত দশ মাইল। আমরা আছি বোধহয় কোনও গুদামের ভেতর।'

আওয়াজ শোনার জন্যে কান খাড়া করল ওরা।

থমথম করছে চারপাশ।

'চলো, দেখি কোথায় আছি,' বলল তানিয়া।

বস্তা সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কন্টেইনারের কোণে পৌঁছুল আসিফ। আগেই দেখেছে ওখানে আছে ভেন্টিলেশন স্লিট। চাপা স্বরে বলল ও, 'আছি ওয়্যারহাউসে। চারপাশে শুধু সারি সারি কন্টেইনার।'

'আশপাশে কেউ না থাকলে বেরিয়ে যাব।'

ভারী কিছু বস্তা সরিয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করল ওরা। ছাতে জ্বলছে স্বল্প ওয়াটের বাতি।

দেখা গেল না কাউকে।

'প্রথম সুযোগে ঢুকব আমেরিকান কনসুলেটে,' বলল আসিফ, 'ওখান থেকে নুমায় পাঠাব সংগ্রহ করা ডেটা।'

ত্রিশ

কয়েক ঘণ্টা হলো জাপানের পাহাড়ি অঞ্চলে ওরে চিচিওয়ার পিছু নিয়েছেন পুলিশ সুপারইণ্টেণ্ডেণ্ট হিমুরা। সুচারুভাবে কাজ করছে ট্র্যাকিং কয়েন। দারুণ ইলেকট্রনিক্স ডিযাইন, প্রতি ত্রিশ সেকেণ্ড পর একটা করে পাল্স্ পাঠাচ্ছে সেল ফোন ব্যাণ্ডে। সত্যিকারের কয়েন থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব।

জাপানের সেল টাওয়ারের বিশাল নেটওঅর্কের কারণে বহু দূর থেকেও জানা যাবে, যার পিছু নেয়া হয়েছে, কোথায় আছে লোকটা। ইলেট্রনিক কয়েন পাঠাচ্ছে সঠিক জিপিএস কোঅর্ডিনেশন।

সিগনাল অনুযায়ী টোকিও থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে চলেছেন হিমুরা। অনেকক্ষণ পর একটা পেট্রল স্টেশনে থামল ওরে চিচিওয়া। তেল নেয়ার পর ঢুকল রেস্টরুমে। এ সুযোগে তার গাড়ির বাম্পারে দ্বিতীয় ট্রান্স-মিটার প্ল্যান্ট করলেন পুলিশ সুপার।

এখন সিগনাল দিচ্ছে দুটো ট্র্যান্সমিটার, চট করে পালাতে পারবে না লোকটা— একটা খরচ করে ফেললে থাকবে আরেকটা। পিছিয়ে গেলেন হিমুরা। ঠিক করেছেন প্রথম সুযোগেই গ্রেফতার করবেন খুনিটাকে।

তবে বিস্মিত হতে হলো তাঁকে। নতুন করে রওনা হয়ে আরও ওপরের পাহাড়ি এলাকার দিকে চলল ওরে। মনে হলো গন্তব্য ফুজি মাউন্টেনের টিলার দিকে। প্রায় অব্যবহৃত সরু

এক পথে একঘণ্টা চলার পর থামল ওরে চিচিওয়া।

স্যাটেলাইট ইমেজ দেখলেন উবোন হিমুরা। এদিকটা জঙ্গলে ভরা টিলাটক্কর এলাকা। তারই মাঝে হলদে দাগটি বনের মাঝে ছোট একটা গেস্ট হাউস। ওখানে রয়েছে প্রাকৃতিক ওনসেন বা উষ্ণপ্রস্রবণ। ওই পানিতে আছে নানান মিনারেল। কেউ কেউ বলেন, ওখানে গোসল করলে সারবে সব রোগ। কিছুটা দূরে শিনটো মন্দির।

গেস্ট হাউস পাশ কাটিয়ে অন্তত দু'মাইল এগিয়ে তারপর থামলেন হিমুরা। পেরোল আধঘণ্টা, জায়গা থেকে নড়ল না দুই ট্র্যান্সমিটার। মনে সন্দেহ আসতেই ফিরতি পথে চললেন তিনি। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হেঁটে পৌঁছুলেন গেস্ট হাউসের কাছে।

পার্কিং লটে অন্তত বিশটা গাড়ি। আছে ওরে চিচিওয়ার গাড়িটাও। গেস্ট হাউস ভাল ব্যবসা করছে বলে বিস্মিত হলেন না হিমুরা। কাছেই পাহাড়ি উষ্ণ প্রস্রবণ, সামান্য দূরেই শিনটো মন্দির। সত্যিকারের আকর্ষণীয় পাহাড়ি এলাকা। প্রতিবছর জাপানের এদিকে ঘুরতে আসে প্রায় দশ লাখ পর্যটক। অবশ্য, পাহাড়ি ওই মন্দির খুবই ছোট, নির্জন এবং প্রায় অচেনা।

কমপিউটার ঘেঁটে হিমুরা জেনেছেন, সাধারণ মানুষকে ঢুকতে দেয়া হয় না ওই মন্দিরে। বিস্মিত হয়েছেন তিনি, ওরে চিচিওয়ার মত লোক কেন ওখানে যাচ্ছে!

নতুন গাড়িতে চেপে সে চলে গেছে কি না, বোঝার জন্যে ট্র্যান্সমিটারের লোকেশন দেখলেন তিনি।

না, গেস্ট হাউস থেকেই পাল্‌স্‌ পাঠাচ্ছে নিকেল কয়েন।

চিচিওয়া ওখানে আছে নিশ্চিত হয়ে বিশ্বস্ত অফিসারকে কল দিলেন হিমুরা। 'পাহাড়ি মন্দিরের কাছে চিচিওয়া। চলে এসো তোমার সেরা দু'জনকে নিয়ে। আজ রাতেই গ্রেফতার করব তাকে।'

কিছুক্ষণ পর দলের লোক পৌঁছে যাবে। গলা থেকে টাই

আলগা করে অপেক্ষা করতে লাগলেন হিমুরা।

ছোট্ট ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখছে ওরে চিচিওয়া। ওই যে, দেখা যাচ্ছে পার্কিং লটে কেউ নেই। রাস্তাও ফাঁকা।

পর্দা ছেড়ে স্বাভাবিক পোশাক খুলে আলখেল্লা পরে নিল ওরে। বেরিয়ে এল গেস্ট হাউসের পেছন পথ ব্যবহার করে। হাতের ভাঁজে রাখা জ্যাকেটের চোরা পকেট থেকে নিল ছোট একটা কেস। বের করল থ্রোয়িং নাইফ। কেস পকেটে রেখে একবার লুফে নিল ছোরাটা। ঘড়ি দেখল। যথেষ্ট সময় আছে হাতে।

গেস্ট হাউসের পেছনের সরু মাটির পথ গেছে ওপরে মন্দিরের দিকে। একটু দূরেই উষ্ণ প্রস্রবণ। ওখানে পৌঁছে পোশাক ছেড়ে বলকে ওঠা পানিতে নামল সে। তপ্ত, ভেজা পাথরে পিঠ রেখে অপেক্ষায় থাকল।

কিছুক্ষণ পর ওপরের পথে দেখল একজনকে। কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। পরনে সাদা আলখেল্লা। মাথায় কালো হ্যাট। জাপানে বলে কাক টুপি বা কারাসু। যে-কোনও শিনটো সাধুর প্রিয় পোশাক সাদা আলখেল্লা ও কারাসু।

মন্দিরের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁদেরকে সম্মান দিয়ে বলা হয় *শিনসোকু*।

'শিনসোকু,' ভক্তি ভরা সুরে ডাকল ওরে।

ঈশ্বরের নিযুক্ত লোকটি এগিয়ে এলেন তার দিকে।

'মনে হচ্ছিল হয়তো শেষে এলেনই না,' বলল ওরে।

ওর গায়ের রঙিন উল্কি দেখে গম্ভীর হলেন সাধু। 'তো তুমিই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে?'

'জী,' মাথা দোলাল ওরে।

'তুমি চাও সব নিয়ম মেনে পবিত্র হতে,' বললেন বৃদ্ধ।

'আমার চেয়ে বড় পাপী কেউ নেই, শিনসোকু,' বলল

ওরে।

মাথা দোলালেন সাধু। 'ভয় পেয়ো না, দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে যাব না আমি। চেষ্টা করব তোমার সব পাপ দূর করে দিতে।'

'এরই ভেতর গোসল করেছি,' জানাল ওরে, 'এবার কী করতে হবে, শিনসোকু?'

'আলখেল্লা পরে নাও, তারপর পিছু নেবে। পথ দেখিয়ে দেব।'

গরম পানির ঝর্না থেকে উঠে আলখেল্লা পরল ওরে। পায়ে এখন রাবারের স্যাণ্ডেল। বাম হাতের ভাঁজে নিজের পোশাক। চারপাশে জঙ্গল। মাঝ দিয়ে গেছে পাহাড়ি, সরু রাস্তা। শিনসোকুর পিছু নিয়ে হেঁটে চলল সে। পেছনে পড়ে রইল গেস্ট হাউস।

আধমাইল পেরোবার পর দু'পাশে পড়ল বাঁশের ঝাড়। ওটা পেরোবার আগেই পড়ল সিঁদুর রঙা এক দরজা বা টোরি। দু'পাশে লাল-কমলা রঙের খাড়া দুটো খুঁটি। কালো লিন্টেল থেকে ঝুলছে লণ্ঠন। সে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে কুয়াশা ভরা পথ।

প্রথম টোরি পেরোবার পর দ্বিতীয় এবং এরপর তৃতীয় টোরি পেরোল ওরে। এসব দরজা কোনওটা অতি পুরনো, আবার কোনওটা নতুন মনে হলো। প্রতিটি দরজায় খোদাই করা হয়েছে কিছু বংশের নাম। এসব পরিবারের লোক ও মহিলারা সাধুদের মাধ্যমে সাহায্য চেয়েছেন ঈশ্বরের কাছে।

'এ কি সত্যি, একসময়ে টোকাগাওয়া পরিবার সাহায্য করতেন এই মন্দির কর্তৃপক্ষকে?' জানতে চাইল ওরে।

'টোকাগাওয়া?' মাথা নাড়লেন যাজক। 'না, মুখে মুখে কত কথাই ছড়িয়ে পড়ে!'

টিলার ওপরে উঠে এল সাধু ও ওরে। সামনের জমি সমতল। শেষ দরজা পেরোতে দূরে দেখা গেল মন্দিরটা।

সামনে আছে ছোট এক উপাসনালয়। ওই কাঠামোর নিচে প্রার্থনার বেদি। একপাশে পানিতে ভরা বড় চৌবাচ্চা। ওটা পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হলে পাশ কাটাতে হবে পাথরে খোদাই করা ভয়ানক চেহারার দুটো জন্তুকে।

মন্দিরের দিকে পা বাড়াল ওরে। কিন্তু বলে উঠলেন শিনটো সাধু, 'আবারও সাফ করতে হবে শরীর।'

ভীষণ রেগে গেল ওরে। এই শালা নির্দেশ ঝাড়ছে, শেখাচ্ছে ও কী করবে আর কী করবে না!

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, গোসল করেছি।'

'হাত পরিষ্কার খুবই জরুরি,' বললেন শিনসোকু।

সরু এক নালা বেয়ে তিরতির করে নিচের চৌবাচ্চায় পড়ছে পানি। বিরক্ত হয়ে কাপড়চোপড় রেখে হাত ধুতে লাগল ওরে। পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। হাজার গুণে ভাল ছিল নিচের ওই গরম ঝর্না!

পানি থেকে হাত তুলে কড়া চোখে সাধুকে দেখল ওরে। 'আপনাদের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি।'

'মুখও পরিষ্কার করবে,' বললেন শিনসোকু।

কথাটা পাত্তা দিল না ওরে। জ্যাকেটের পকেট থেকে নিল লো হুয়াং লিটনের সোনালি চিপ। ঠিক করেছে ওটা নিজের সঙ্গেই রা[illegible]।

'ওটা কী?' জানতে চাইলেন সাধু।

'এটা আমার পুরনো জীবনের স্মৃতি।'

কড়া মাস্টারের দৃষ্টিতে ওকে দেখলেন সাধু। 'তার মানে আইনের দৃষ্টিতে তুমি অপরাধী।'

অতীত ও ভবিষ্যৎ একইরকম হোক, ভাবল ওরে। নরম সুরে বলল, 'অতীত ভুলে গড়তে চাই নতুন জীবন। আপনার কাজ তো আমার মত মানুষকে সাহায্য করা, তাই না?'

'তা ঠিক,' বললেন শিনসোকু। তুলে নিলেন পানি ভরা বড় একটা ডাবু। ধরিয়ে দিলেন ওরের হাতে। 'পাপ মোচন

করতে হলে আগে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে মুখ।'

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল ওরে। বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলল পানি ভরা ডাবু। এক পা সামনে বেড়ে খপ্ করে ধরল বুড়ো মানুষটার ঢিলা আলখেল্লার ওপরের অংশ।

'তোমার ওপর শয়তান ভর করেছে,' শান্ত স্বরে বললেন শিনসোকু।

'আপনি কিছুই জানেন না,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল ওরে। 'শয়তানের বাপও পালিয়ে যায় আমাকে দেখলে। এবার নিয়ে চলুন মন্দিরে। দেখাবেন কী রেখে গেছে টোকাগাওয়া পরিবারের লোকজন।'

পিছলে সরতে চাইলেন সাধু। কিন্তু তাঁর সাধ্য নেই যে ওরের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন। থমকে থমকে বললেন, 'মন্দিরে চোর-ডাকাতের কাজে লাগবে এমন কিছুই নেই। আছে শুধু জ্ঞান। কিন্তু সেটা তো তুমি চাও না।'

'কী আছে আর কী নেই, সেটা ঠিক করব আমি,' বলল ওরে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন সাধু, কিন্তু তাঁর মাথা ধরে চৌবাচ্চার পাথরের দেয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে দিল ওরে। প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। নড়বেন সে সাধ্য নেই। হ্যাঁচকা টানে তাঁর আলখেল্লার গলার দিকটা সরাল ওরে। বৃদ্ধের গলার সুতলিতে ঝুলছে রিং। ওখানে আছে কয়েকটা চাবি। টান দিয়ে সুতলি ছিঁড়ে রিং মুঠোয় পুরল ওরে।

গলায় ব্যথা পেয়ে কাতরে উঠলেন সাধু। কিন্তু তখনই তাঁর মুখ চেপে ধরল নিষ্ঠুর খুনি। পরক্ষণে দু'হাতে ধরে প্রচণ্ড এক মোচড় দিল সাধুর ঘাড়ে। সামান্য নড়ে উঠে থেমে গেলেন নিরীহ মানুষটা। ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিতেই মাটিতে পড়ল দেহটা। চট্ করে চারপাশ দেখল ওরে। বাঁশের ঝাড়ের মাঝ দিয়ে হু-হু করে বইছে শীতল হাওয়া। এ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

আশপাশে কেউ নেই। সাধুর পোশাক খুলে নিজে পরল ওরে। বেশ টাইট হয়েছে হালকা মানুষটার কাপড়। চেষ্টা করেও মাথায় পরতে পারল না কাক হ্যাট। থুতনিতে আটকে নিল স্ট্র্যাপ। মুচড়ে গিয়ে বেকায়দাভাবে ঝুলতে লাগল কারাসু।

মন্দিরের দিকে পা বাড়াবার আগে চৌবাচ্চার পানিতে উলঙ্গ সাধুর লাশ ফেলল ওরে। বিড়বিড় করল, 'এবার, শিনসোকু শালা, নিজেই তুই গোসল করতে থাক্!'

অপরাধের চিহ্ন মুছে যেতেই ক্যাসিনো থেকে পাওয়া পেতলের চিপ্ জ্যাকেটের পকেটে রাখল ওরে। নিজের পোশাক নিয়ে খাড়া পথে হেঁটে চলল মন্দির লক্ষ্য করে।

পাশে এসে খয়েরি ভ্যান থামতেই খুশি হয়ে উঠলেন পুলিশ সুপার উবোন হিমুরা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট এবং সাদা পোশাকের দুই পুলিশ অফিসার।

'এখনও গেস্ট হাউসে?' জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট।

একটু দূরের টিলা দেখালেন হিমুরা। 'মন্দিরের দিকে গেছে।'

সন্দেহের ছাপ পড়ল লেফটেন্যান্টের চেহারায়। 'ওরের মত লোক মন্দিরে কী করছে?'

'মনে হয় না পাপ মোচনের জন্যে গেছে,' বললেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট।

'স্যার, আপনি শিয়োর ওই লোকই ওরে চিচিওয়া?'

'দু'বার দেখেছি। মিস্টার সোহেলের বর্ণনা করা ওই লোকই।' কাঁধ ঝাঁকালেন হিমুরা। 'জীবিত ধরতে চাই। ঝামেলা হবে মনে হয় না। পাহাড়ে কোনও সিভিলিয়ান নেই।'

মৃদু মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। সঙ্গে আছে পিস্তল এবং শক-স্টিক। লাঠির মত জিনিসটা হাই পাওয়ারের টেইযার।

শক দিলে অবশ হবে যে-কেউ। অন্য দুই অফিসারের কাছে হেকলার অ্যাণ্ড কচ সাবমেশিন গান। প্রায় এমপি ফাইভের মত, তবে ব্যারেল আরও খাটো। মুখোমুখি লড়ার জন্যে উপযুক্ত অস্ত্র।

নিজের পিস্তল বের করলেন হিমুরা। অধৈর্য হয়ে গেছেন অপেক্ষা করতে করতে। চাপা স্বরে বললেন, 'চলো!'

নিঃশব্দে হেঁটে ওনসেন বা উত্তপ্ত ঝর্নার কাছে পৌঁছুলেন তাঁরা। খাড়াই পথে দু'পাশে পড়ল বাঁশের ঝাড়। কিছুক্ষণ পর হাজির হলেন প্রথম টোরির সামনে। হাঁটার গতি না কমিয়ে পৌঁছে গেলেন চৌবাচ্চার কাছে। ওখানে থামলেন।

আরাধনার বেদিতে গুঁজে রাখা হয়েছে হোটেলের আলখেল্লা।

'কিছুক্ষণ আগেও ওটা ছিল ওরের পরনে,' বললেন হিমুরা, 'তার মানে নতুন পোশাক পরে নিয়েছে।'

চৌবাচ্চার পাশ থেকে বলল তরুণ এক অফিসার। 'স্যর, দেখুন!'

অন্য তিন অফিসার গেলেন তার পাশে। চৌবাচ্চায় তাকাতেই দেখলেন পবিত্র করার পানির নিচে লাশ হয়ে শুয়ে আছেন এক সাধু।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হিমুরা। 'কারও মনে সন্দেহ আছে, আমরা পিছু নিয়েছি সাক্ষাৎ শয়তানের?'

'স্যর, এখনও সিগনাল পাচ্ছেন?' জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট।

ট্যাবলেটের ডিসপ্লে দেখলেন হিমুরা। পাহাড়ের আশপাশে সেল টাওয়ার নেই যে সিগনাল পাবেন। বাধ্য হয়ে ব্যবহার করলেন ডিরেক্ট সিকিং মোড। সহজেই ট্র্যাক করতে পারলেন নকল কয়েন। 'মন্দিরে ঢুকেছে।'

খাড়াই পথে দৌড়ে মন্দিরের উঠানে উঠল চার পুলিশ অফিসার। হাট হয়ে খোলা দালানের সদর দরজা। ভেতরের

ঘরে এখানে ওখানে টিমটিম করে জ্বলছে মোমবাতি। পাথরের চুল্লিতে ছোট শিখার আগুন। কোথাও নেই ওরে চিচিওয়া। অন্য কাউকেও দেখা গেল না।

'পরিবেশটা ভাল লাগছে না,' বলল লেফটেন্যাণ্ট। 'চারপাশ অতিরিক্ত নীরব।'

'শিনসোকুরা কোথায় গেলেন?' আনমনে বলল এক অফিসার।

জবাবে কিছু বললেন না উবোন হিমুরা।

এ ধরনের ছোট মন্দিরে অনেক সময় সাধুরা থাকেন না। উপস্থিত হন প্রার্থনার সময়। কিন্তু এখানে মোমবাতি জ্বলছে দেখে বোঝা যাচ্ছে ছিলেন কেউ না কেউ। বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন হিমুরা, আস্তে করে অফ করলেন পিস্তলের সেফটি ক্যাচ। 'খারাপ কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে যাও।'

মাথা দোলাল লেফটেন্যাণ্ট। 'আগে কোন্‌দিকে যাব, স্যর?'

স্ক্যানার চেক করলেন হিমুরা। ডিসপ্লেতে জ্বলজ্বল করছে লাল বিন্দু। 'মন্দিরের পেছনে আছে ওরে। চলো!'

করিডোর ধরে এগোতেই ক'ফুট দূরে একটা দরজার পাশে এক সাধুর লাশ পেল জাপানি পুলিশ অফিসাররা। মৃতদেহ পড়ে আছে রক্তের পুকুরের ভেতর। পরের ঘরে আরও তিনজনের লাশ। তচনচ করা হয়েছে তৃতীয় ঘর। মিলল আরও দু'জন সাধুর মৃতদেহ। অফিসারদের বুঝতে দেরি হলো না, যাকে পাচ্ছে তাকেই খুন করছে চিচিওয়া।

থমকে গিয়ে হাত দিয়ে গলা কাটার ইশারা করলেন উবোন হিমুরা। অর্থাৎ, গুলি করতে হবে দেখামাত্র। জীবিত ধরতে পারলে ভাল, নইলে কিছুই যায় আসে না খুনিটা মরলে। ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই।

সাবধানে এগোল পুলিশ অফিসাররা।

নিঃশব্দে করিডোরের শেষে পৌঁছুলেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট

হিমুরা। হাতের ইণ্ডিকেটরের স্ক্রিন বলছে, বামের ঘরে রয়েছে ওরে চিচিওয়া।

মন্দিরে আসার পর প্রথমবার অচেনা মানুষের নড়াচড়ার শব্দ শুনলেন পুলিশ কর্মকর্তা। ক'সেকেণ্ড লাগল মনস্থির করতে, তারপর সামনে বেড়ে লাথি মেরে বামের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ডেস্কে ঝুঁকে বসে আছে কালো পোশাক পরা কেউ। ঝট্ করে তার দিকে পিস্তল তাক করেও থেমে গেলেন হিমুরা। না, ওই লোক ওরে চিচিওয়া নয়। বয়স্ক এক সাধু।

সরু এক ইলেকট্রিকাল কালো তার দিয়ে চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে। সামনে ডেস্কে ভাঁজ করা সাদা আলখেল্লা। ওপরে বৃত্তাকার ছোট্ট কয়েন। মাঝে ফুটো। উবোন হিমুরার দেয়া ট্র্যাকিং কয়েন।

অনেক দেরিতে সচেতন হলেন পুলিশ সুপারইণ্টেণ্ডেন্ট। পেছনে শুনলেন অস্ফুট আর্তনাদ।

চরকির মত ঘুরে দেখলেন একটা ঝিলিক। একপাশ থেকে চালানো তলোয়ার কচ্ করে কেটে দিয়েছে তাঁর লেফটেন্যান্টের গলা। পরক্ষণে ওই তলোয়ার কাটল আরেক পুলিশ অফিসারের বাহু।

আগেই মেঝেতে পড়ে আছে তৃতীয় অফিসার। বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে থ্রোইং নাইফ।

মাত্র একবার গুলি করতে পারলেন হিমুরা। এক সেকেণ্ড পর বুঝলেন মিস করেছেন তিনি। দেয়ালে বিঁধেছে বুলেট। পিস্তল ধরা হাতের ওপর নামল ঝিলিক দেয়া তলোয়ার। দ্বিতীয়বার ট্রিগার স্পর্শের সুযোগ পেলেন না তিনি। কাটা পড়ল তিন আঙুলের ডগা। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক লাথি তাঁর হাত থেকে উড়িয়ে দিল পিস্তল। ঘরের কোণে গিয়ে পড়ল ওটা।

অস্ত্র ধরতে ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাইভ দিলেন হিমুরা, কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক দ্রুত ওরে চিচিওয়া। পুলিশ

অফিসারের পাঁজরে লাগল প্রচণ্ড লাথি। কাত হয়ে ডেস্কের পাশে পড়লেন হিমুরা। বুঝে গেলেন, প্রাচীন কোনও তলোয়ারের ধারালো ফলা চেপে বসেছে তাঁর গর্দানে।

বরফের মূর্তি হলেন হিমুরা। তাঁর দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে ওরে চিচিওয়া।

যে-কোনও সময়ে খুন হবেন, জানেন হিমুরা। কিন্তু গর্দানে কোপ না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসল ওরে। এমন ভঙ্গিতে তলোয়ার ধরেছে, যেন পিনে আটকে রাখা কোনও অসহায় পতঙ্গ পুলিশ অফিসার হিমুরা।

'এটা খুঁজছ?' ট্র্যাকিং কয়েন নিয়ে দেখাল ওরে।

চুপ থাকলেন হিমুরা। আরেক হাতে শক্ত করে ধরেছেন কাটা আঙুলের ক্ষত। দরদর করে ঝরছে রক্ত। ব্যস্ত হয়ে ভাবছেন, কীভাবে উদ্ধার পাবেন বিপদ থেকে। বুঝতে দেরি হলো না, আগে চাই পিস্তল। একবার ঝাঁপ দিয়ে...

তলোয়ারের মোচড়ে টপটপ করে হিমুরার গর্দান থেকে নামল রক্তের ফোঁটা। হাসল ওরে। 'ভেবেছিলে পিছু নিয়েছ দেখতে পাব না? প্রথম মোড়েই ধরা পড়লে। থামলাম পেট্রল স্টেশনে। দেখলাম আমার গাড়িতে রাখলে বিকন। সত্যি বলছি, বুঝিনি কীভাবে পিছু নিলে। তারপর পেয়ে গেলাম প্রথম কয়েনটাও।'

ছোট্ট চাকতি ঘষল ওরে। 'প্রায় আসলের মতই। তবে তফাৎ আছে। এটা একটু হালকা।'

কয়েনটা উবোন হিমুরার মুখে ছুঁড়ল ওরে।

'খুন করলে করো,' বললেন দুঃসাহসী অফিসার। 'তবে নিজেও বাঁচবে না। সাধু আর পুলিশ খুন করেছ। কোথাও পালিয়ে রক্ষা পাবে না। কর্তৃপক্ষ জেনে গেছে তুমি দেখতে কেমন।'

তলোয়ার দিয়ে হিমুরাকে খুন না করে শক-স্টিকটা বামহাতে নিল ওরে। পরখ করল ওটার ওজন। নরম সুরে

বলল, 'ওরা যখন বুঝবে তুমি কী করেছ, ভুলে যাবে আমার কথা।'

উবোন হিমুরার বুকে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক দিল ওরে প্রথমটা সামলাবার আগেই এল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শক। ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে জ্ঞান হারাচ্ছেন হিমুরা। পরের ক'মিনিট সহ্য করলেন প্রচণ্ড কষ্ট, তারপর তাঁর চোখে নামল ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার।

একত্রিশ

পুরনো আমলের স্যান ফ্রান্সিসকোর মতই নাগাসাকি শহর। একপাশে সাগর, অন্যদিকে পাহাড়। সমতল জমি না পেয়ে পাহাড়ের স্তরে স্তরে বাড়ি তৈরি করেছে বাসিন্দারা। অত্যন্ত ব্যস্ত বন্দর-নগরীর দু'অংশের মাঝে সংকীর্ণ উপসাগর, মাঝে কমলা রঙের ঝুলন্ত সেতু। যে-কোনও দিকের পাহাড় থেকে দেখা যায় অন্যদিকের বাড়িঘর।

বিজ্ঞানী শিমেযুর সংগ্রহ করা পুরনো আরেক গাড়িতে চেপে নাগাসাকি শহরে পৌঁচেছে রানা, সোহেল ও হিনা। গাড়িটা উনিশ শ' বাহাত্তর সালের জিটি-আর চার দরজার সেডান। সত্যি বলতে, জাপানের প্রথম গাড়ি, যেটা সংগ্রহ করতে চাইবে গাড়ি-প্রেমিক যে-কেউ। অবশ্য আসার পথে বিড়বিড় করেছে সোহেল, 'হাড্ডির মত শালার সিট! ভর্তা হয়ে গেল পেছনের কুমড়ো!'

'কেউ কেউ ভাববে, আমরা গরীব বলেই মেরামত করে

চালাচ্ছি গাড়িটা,' কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করল সোহেল। 'আবার এ কথাও ঠিক, চালাতে হলে বেন্টলির চেয়ে জিটি-আর বেশি পছন্দ করব।'

সিটে ঘুরে ওকে দেখল হিনা। 'আপনার ভাল লেগেছে বলে ধন্যবাদ। প্রভু শিমেযুর জন্যে এ গাড়িটা প্রথম মেরামত করি। মনে আছে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা।'

'গাড়িটা ক্লাসিক, তেমনি আগ্রাসী চেহারার,' বলল সোহেল।

সেতুর র‍্যাম্পে গাড়ি তুলল রানা। বুঝে গেছে, মেয়েটার সঙ্গে খাতির করতে চাইছে সোহেল। নীরস সুরে বলল ও, 'আমাদের ভাড়া গাড়ি হলেই চলত। হিটারও আধুনিক হতো। এত ঠাণ্ডা লাগত না।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল হিনা। 'ভাড়াটে গাড়ি আধুনিক, তা ঠিক। তবে সেটা সবসময় সবার জন্যে ভাল হয় না। আপনারা কি জানেন, নতুন গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ রাখে গাড়িকোম্পানি? স্যাটেলাইট রেডিয়ো রিসিভারের মাধ্যমে যে-কোনও সময়ে জেনে নিতে পারবে, কোথায় আছে তাদের তৈরি কোন্ গাড়ি। বুঝলেন তো? লোজ্যাক বা অন্য সিস্টেম লাগেই না। নতুন কিছু গাড়িতে আছে রিমোট অপারেশন অথোরিটি ইকুইপমেন্ট। ইচ্ছে করলে কমপিউটার টার্মিনাল ব্যবহার করে যখন তখন বন্ধ করে দিতে পারে আপনার ইঞ্জিন। অর্থাৎ, সর্বক্ষণ তাদের হাতের মুঠোয় আছেন আপনি।'

'কিন্তু গোপনে কোথাও যাচ্ছি না আমরা,' মৃদু হাসল রানা। 'এ প্ল্যানের বড় দিক হচ্ছে, সরাসরি মুখোমুখি কথা বলব লো হুয়াং লিটনের সঙ্গে। কোনও লুকোছাপা নেই।'

'কথা বলার সুযোগ দেবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'দেবে,' বলল রানা। 'সোজা গিয়ে সাহায্য চাইব।' হিরাডো ব্রিজে উঠে পেরোল নাগাসাকি উপসাগর। উৎরাই পথে চলল ডকের দিকে বিলিয়নেয়ারের ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য

করে। এক শ' একর জমিতে তৈরি হয়েছে হেডকোয়ার্টার, দেখলে মনে হবে ভবিষ্যতের কোনও শহর। দালানগুলোর পাশে রয়েছে ভাস্কর্য করা বাগান মাঝে দিয়ে গেছে ফুটপাথ ও পাশে কংক্রিটের সরু সব নালা। দেখা গেল, ফ্যাসিলিটির পেছনে সাগরতীরে অত্যাধুনিক গাড়ি পরীক্ষার জন্যে প্রমাণ আকারের ট্র্যাক আছে।

পাহাড়ি পথে নামতে শুরু করে বলল রানা, 'তো ওটাই লো হুয়াঙের নতুন কোম্পানি। নিপ্পন-চায়না রোবটিক্স। লোকটার সঙ্গে জুটে গেছে ক'জন জাপানি শিল্পপতি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হচ্ছে কোম্পানি। বড় ধরনের দুটো অনুষ্ঠানের প্রথমটা। উপস্থিত হবেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী, নাগাসাকির মেয়র এবং পার্লামেন্টের বেশ ক'জন সদস্য।'

'বুঝেছি, ফালতু রঙিন ফিতা কাটতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কান পচিয়ে ছাড়বে রাজনৈতিক নেতারা,' মাথা দোলাল সোহেল।

'কালকের অনুষ্ঠান আরও গুরুত্বপূর্ণ,' বলল রানা। 'চিন-জাপানের মাঝে হচ্ছে পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি। তবে ওই অনুষ্ঠান হবে ফ্রেণ্ডশিপ প্যাভিলিয়ন নামের নতুন বড় এক অডিটোরিয়ামে। ওটা তৈরির পুরো টাকা দিয়েছে লো হুয়াং লিটন।'

'টাকা দিয়ে বন্ধু কিনছে,' বলল সোহেল। 'এরপর ওসব বন্ধুদের মাধ্যমে প্রভাবিত করবে দু'দেশের ক্ষমতাশালী নেতাদের। ভাল বুদ্ধি।'

'ঠিকই ধরেছিস,' বলল রানা, 'ওই অনুষ্ঠানে আমরা গেলে কেউ খেয়াল করবে না।'

'যেহেতু এদের তুলনায় আমরা পিঁপড়ের চাইতেও খুদে মানুষ,' সায় দিল হিনা।

'এই দুই জমজমাট অনুষ্ঠান করা হচ্ছে ট্রেড শো-র মত করে,' বলল রানা। 'চাইলে যোগ দিতে পারবে যে-কেউ। আর

এই সুযোগটাই নেব আমরা।'

টিলা বেয়ে নেমে সরু রাস্তা ধরে সরাসরি কোম্পানির পাতাল পার্কিং গ্যারাজে ঢুকল রানা। গাড়ি রেখে ওরা একটু দূরেই পেল এস্কেলেটর। ওটায় করে উঠে এল ওপরতলায়। চারপাশে গুঞ্জন তুলছে শত শত মানুষ। নানাদিকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শক্তিশালী বাতি। এদিক ওদিক চলেছে ছোট ছোট সব মেশিন। রানা, সোহেল ও হিনা এস্কেলেটর থেকে নামতেই ওদের দিকে চেয়ে হাসল হলোগ্রাফিক এক মেয়ে। মিষ্টি করে বলল, 'আপনারা যা ভাবছেন, তার চেয়েও অনেক কাছে সত্যিকারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!'

চারপাশে তাকাল ওরা। ঝিকমিক করছে নিয়ন বাতি। বাজছে জোরালো মিউযিক। যে-কেউ ভাববে, সে ঢুকে পড়েছে ডিস্কো ক্লাবে। এস্কেলেটরের সামনে দু'পাশে ক'ফুট দীর্ঘ দেয়ালে ফিট করা আছে কৃত্রিম কয়েকটা হাত। নখে লাল নেইলপলিশ। চাইছে হ্যাণ্ডশেক করতে।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল হিনা। ফিসফিস করল, 'আকুমু।'

'কেন দুঃস্বপ্ন?' জানতে চাইল রানা।

আরেকবার মাথা নাড়ল হিনা। 'এটা হচ্ছে নরকের সাত চত্বরের মতই ভয়ঙ্কর বাজে জায়গা।'

রানা ও সোহেল দেখল, মুষড়ে পড়েছে মেয়েটা। হঠাৎ পতিতালয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলে এমনই হতাশ হবেন যাজক।

'এখান থেকে বহু কিছু শেখার আছে,' বলল রানা।

'আমার বমি আসছে,' তৃতীয়বার মাথা নাড়ল হিনা।

অটোমেটেড হাত এড়িয়ে সামনের ডেস্কের কাছে এল ওরা। ওখান থেকে সংগ্রহ করল হেডসেট। আধুনিক যন্ত্রটার কারণে শুনবে যে-কোনও ভাষার বক্তৃতা। সামনে বেশ কিছু বুথ। প্রথমটা জেনেরিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপ্লে। এ সম্পর্কে ইংরেজিতে রেকর্ড করা মিষ্টি কণ্ঠের এক মেয়ে বলতে লাগল:

‘আধুনিক রোবটের জন্যে ভবিষ্যতে হাজাররকমের কাজ থেকে রক্ষা পাবেন আপনি। আজ থেকে এক দশক পর বিরক্তিকর কোনও কাজ করতে হবে না আর আপনাকে। দীর্ঘ পথে ড্রাইভ? লাগবে না। ওয়্যারহাউসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম? লাগবে না। আসলে ভারী সব কাজই করবে রোবট। আপনি চাইলে বিশাল সব মেশিন পাহাড় কেটে তৈরি করে দেবে চওড়া রাস্তা। যা চান, সবই পাবেন হাতের নাগালে।’

‘কাজ না থাকলে নগদ টাকাও পকেটে আসবে না,’ বলল হিনা।

ভুরু কুঁচকে ফেলল সোহেল। ‘এখন আর ভালবাসতে পারছি না রোবটগুলোকে!’

‘তা হলেই বুঝুন,’ বলল হিনা, ‘টাকা নেই বলে শেষে না খেয়ে মরে যাব আমরা!’

ফ্যাসিলিটির আরেক দিকে গেল ওরা। ওখানে বাড়ছে ভিড়। গমগম করে উঠল দরাজ এক কণ্ঠ: ‘এবার আপনারা দেখবেন আমাদের নতুন পরিচারক রোবট। ওর জন্যে আর প্রয়োজন পড়বে না বাড়িঘরে কাজের মানুষ। মিষ্টি মেয়েটির নাম: ন্যাম-নাইন-এক্স।’

ছাত থেকে নিচের অন্ধকার জায়গায় ফেলা হলো উজ্জ্বল আলো। সবাই দেখল, ফ্রেঞ্চ পরিচারিকার পোশাক পরনে এক মহিলা। মুখটা কোমল, লাল লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটে মৃদু হাসি। অবশ্য চোখ কাঁচের মতই, কোনও আবেগ নেই।

‘আমি মিস রেবেকা,’ সুরেলা কণ্ঠে বলল রোবট। ঠোঁট নড়ছে কথা বলার সময়। ‘আমি আছিই তো আপনাদের সব কাজ করে দেয়ার জন্যে।’ দর্শকদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল সে।

বিস্মিত হয়েছে রানা। রোবটের কণ্ঠে নেই আড়ষ্ট কমপিউটার জেনারেটেড বাক্য। কাছে গিয়ে মেশিনটা দেখল ও। গুছিয়ে রাখা একটা কিচেনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। দেখতে

না দেখতে কল খুলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করল হাঁড়িকুড়ি। তোয়ালে দিয়ে সব মুছে তুলে রাখল র‍্যাকে। রানার মনে পড়ল রাঙার মা-র কথা। এবার ব্যাগ থেকে ফলমূল, সজি, মাংস ও মাছ বের করে ফ্রিজের ঠিক জায়গায় রাখল রোবট। গুঁড়ো করে নিয়ে পারকোলেটর মেশিনে তৈরি করল কফি। একদানা গুঁড়োও কোথাও পড়ল না।

'বুঝলি, এবার কারও চাকরি নেই,' হতাশ সুরে বলল সোহেল। চট্ করে দেখল হিনাকে। 'বিবিও লাগবে না!'

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'একগাদা মেশিনের মাঝে চুপ করে বসে থাকবে সবাই। বিয়ে করার দরকার কী? কোনও প্রয়োজন নেই আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখার।'

কথাটা শুনে করুণ চেহারা করল সোহেল। 'বলেন কী, বাচ্চা না হলে তো...'

'ভবিষ্যতে আধুনিক মেশিন উৎপাদন করবে মানুষের বাচ্চা,' ভরসা দিল হিনা। 'যে যার বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। কোথাও সমস্যা নেই। বাচ্চাগুলোকে পেলে দেবে মা রোবট। চাইলে আপনাকেও ঘুম পাড়িয়ে দেবে মাথায় হাত বুলিয়ে। আর আপনার ঘুম না এলে...' সোহেলকে দুর্দান্ত একটা চোখ টিপ দিল হিনা।

বিমর্ষ হয়ে অন্যদিকে চেয়ে বিড়বিড় করল সোহেল, 'দুশ্‌শালা!'

মৃদু হাসল রানা। 'অফিসে আর প্রেম-প্রেম ভাব করতে হবে না নীলা, ববি, পলি... বা আর কারও সঙ্গে! ...এবার, চল্, অনুষ্ঠান শেষ হলে গিয়ে ধরব লো হুয়াং লিটনকে।'

বেশ ক'টা দেখার মত ডিসপ্লে এড়িয়ে গ্রেট হল-এ ঢুকল ওরা। এ ঘর তৈরি করা হয়েছে অডিটোরিয়াম হিসেবে। একদিকে উঁচু মঞ্চ। ওখানে দাঁড়িয়ে রোবট নিয়ে বকবক করছে না লো হুয়াং লিটন। আজকে তার বক্তব্য অনুযায়ীঃ সহযোগিতার বিশাল এক সুযোগ এসেছে চিন-জাপানের।

এখন সময় হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাওয়ার।

'এশিয়ার মহান এ দুটি দেশ চাইলে বদলে দিতে পারবে গোটা পৃথিবী। তবে তার আগে চাই সম্পর্ক উন্নয়ন। ভুলতে হবে তিক্ত অতীতের কথা। গত শতাব্দীগুলোতে যেসব ভুল হয়েছে, সেগুলো পড়ে থাকুক ইতিহাসের পাতায়। আমরা যেন সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি ভবিষ্যতের স্বর্গপুরীর দিকে।'

'বড় বড় কথা বলছে,' নিচু গলায় রানাকে বলল সোহেল, 'দক্ষিণ চিন সাগর আর সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে দুই দেশের যে কামড়া-কামড়ি, সেটা সামলাবে কীভাবে?'

মিনিটখানেক পর ওই বিষয়ে কথা বলল লো হুয়াং লিটন। ...বেশ কয়েকটি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পদক্ষেপ নিয়েছে চিন সরকার। কিছু দিনের ভেতর জাপান সরকারের হাতে তুলে দেয়া হবে কয়েকটি দ্বীপের কর্তৃত্ব। ভবিষ্যতে জাতিগত কোনও বিরোধ থাকবে না আমাদের। তার বদলে থাকবে শুধু বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা। আর এ থেকে হাজারো ধরনের সুবিধা পাবে দুই দেশ।'

হাততালি দিল অন্তত চার শ' জাপানি ও চিনা।

'লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে স্রষ্টা, যা খুশি তাই করতে পারবে,' মন্তব্য করল হিনা।

'উবোন হিমুরা বলেছেন, জাপান আর চিন— দুই দেশেই কূটনৈতিক সুবিধা পায় লোকটা,' বলল সোহেল।

'কথা শুনেছেন?' নাক কোঁচকাল হিনা। 'জাপানের দ্বীপ জাপানকে ফেরত দিয়ে কৃতজ্ঞ করতে চায়! লোকটা গর্বের ডিপো!'

চুপচাপ লো হুয়াং লিটনের বক্তৃতা শুনছে রানা। তার কথা শেষ হলে মস্তবড় এক কমলারঙা কাঁচি দিয়ে কাটা হলো মখমলের লাল ফিতা। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসা শুরু করল নিপ্পন-চায়না রোবটিক্স। বুফেতে সার্ভ করা হলো শতখানেক

পদের খাবার। যে যার মত ভরে নিল প্লেট। ওয়েট্রেসরা অকাতরে বিলাতে লাগল শ্যাম্পেইনের গ্লাস। তবে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিল না রাজনৈতিক নেতারা। পাহারা দিয়ে মঞ্চ থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিল সিকিউরিটি টিম। অবশ্য রয়ে গেছে লো হুয়াং লিটন। এখানে ওখানে থেমে আগ্রহীদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে এবং আন্তরিকভাবে আলাপ জুড়ছে।

'এবার নিজ পরিচয় দেয়ার সময় হয়েছে,' বলল রানা।

'অডিটোরিয়ামের নিচের গ্যারাজে দেখা হবে,' জানাল সোহেল। 'দেখা যাক খোলে কি না তোর কপাল।'

ফাঁকা হতে শুরু করেছে অডিটোরিয়াম। ব্যস্ততার ছাপ পড়ছে লো হুয়াং লিটনের আচরণে। হ্যাণ্ডশেক করছে আগের চেয়ে দ্রুত। কম কথায় সারছে বক্তব্য। বিদায় নিতে চায়। সারি সারি চেয়ারের মাঝের চওড়া পথে বিলিয়নেয়ারের দিকে চলল রানা। এক লোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে ঘুরে দাঁড়াল লো হুয়াং লিটন। এবার কাছের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু তখনই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'মিস্টার হুয়াং, কপাল ভাল, আপনাকে পেয়ে গেলাম। চমৎকার লাগল আপনার বক্তৃতা।'

রাবারের মুখোশের মত চেহারায় অনুভূতির ছাপ নেই লোকটার। কিন্তু রানার কথা শুনে মৃদু মাথা দোলাল সে। 'সরি, আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনলাম না।'

'ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চেনেন না,' বলল রানা, 'আমার নাম মাসুদ রানা। নুমা বা দ্য ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সিতে আছি অনারারি ডিরেক্টর হিসেবে। সংগঠনটি কাজ করে ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে। আগে পরিচয় হয়নি, তবে আপনার টেকনিকাল ব্রেনের... বা সোজা কথায়, আপনার ভক্ত আমি।'

বিরক্তি কেটে গেল বিলিয়নেয়ারের মুখ থেকে, স্মিত হাসল। 'কীভাবে ভক্ত হলেন, বলুন তো?'

‘আজকাল গভীর সাগরে অসংখ্য রোবট ও অটোমেটেড ভেহিকেল ব্যবহার করি আমরা,’ বলল রানা, ‘আপাতত জরুরি এক এক্সপিডিশন হবে চিনের পুব সাগরে। ওখানেই আপনার রোবটের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। দেখার মত ওগুলোর কর্মদক্ষতা। তাই মনে হলো, আপনার রোবট ও অটোমেটেড ভেহিকেল কাজে লাগতে পারে আমাদের।’

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল লো হুয়াং, ‘নিপ্পন-চায়না রোবটিক্সের আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব নুমার মত নামকরা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে। গভীর সাগরে কাজ করবে এমন কিছু রোবট আছে আমাদের প্রোডাকশন পাইপলাইনে। পরে হয়তো ওগুলো কাজে লাগবে আপনাদের। সোমবার অফিসে ফোন করুন আমাকে। পরিচয় করিয়ে দেব অপারেশন্স ডিরেক্টরের সঙ্গে।’

‘সোমবার দেরি হয়ে যায়,’ বলল রানা, ‘আমাদের কাজ শুরু হবে আগামীকাল থেকে। হাতে সময় নেই।’

‘এত তাড়া কীসের?’ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে গিয়ে দুই ভুরু কুঁচকে ফেলল বিলিয়নেয়ার।

‘আমরা লড়ছি চিনের পুব সাগরে উদ্ভব হওয়া এক জিয়োলজিকাল সমস্যার বিরুদ্ধে,’ বলল রানা, ‘সাগরতলে হচ্ছে একের পর এক অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভূমিকম্প। এলাকার সুনামির ইতিহাস ও টেকটোনিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে দেরি না করে তদন্ত করব। এটা জানা খুব জরুরি, কী হচ্ছে ওখানে। ...ভাল হতো আমরা আজ রাতেই মিটিঙে বসলে।’

মাথা নাড়ল লো হুয়াং। ‘সম্ভব নয়। তবে অফিসে জানিয়ে দেব আপনি যোগাযোগ করবেন। এনজিনিয়ার খুব খুশি হবে আপনাদেরকে সহায়তা দিতে পারলে।’ রানার সঙ্গে হাত মেলাল সে। ‘গুড লাক। এনজয় করুন এক্সপো। এবার বিদায় নেব।’

রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে চলল লোকটা। তার

সঙ্গে জুটে গেল ক'জন বড় কর্মকর্তা। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্যারাজে নামল রানা।

গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল ও হিনা।

'কী বুঝলি?' জানতে চাইল সোহেল। 'ঘাবড়ে গেছে?'

'হয়তো,' বলল রানা, 'তবে চেহারা ছিল ওক গাছের গুঁড়ির মত। চোখের পলক ফেলেনি।'

'ভালমত টোকা দিয়ে দেখেছিস?'

'টোকা নয়, ওর জন্যে চাই ইলেকট্রিক করাত।'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন পুলিশ অফিসার হিমুরা,' বলল হিনা, 'ভুল জায়গায় টোকা দিয়েছেন আপনি।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'এবার এগোতে হবে ভেবেচিন্তে। এসবে জড়িত হলে উল্টো টোকা দেবে লো হুয়াং লিটন।'

'কিন্তু নিরপরাধ হলে?' জানতে চাইল সোহেল।

'অফিসে ফিরে মুচকি হাসবে— বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছিলাম!'

বত্রিশ

অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এনসিআর অফিসে ফিরল লো হুয়াং, চিন্তিত। নিঃশব্দে দরজা পেছনে আটকে দিয়ে বসল ডেস্কের পেছনে। মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখছে রানার সঙ্গে বলা কথাগুলো। কিছুক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিল: দেরি না করে পথ থেকে সরাতে হবে মাসুদ রানা আর নুমাকে।

ডেস্কটপ কমপিউটারের স্ক্যানারে আঙুল রাখল সে। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর খুলে গেল ডেস্কের ড্রয়ারের তালা। দ্বিতীয় ড্রয়ার থেকে স্পেশাল এক সেল ফোন নিল সে। ওটা আটকে নিল কমপিউটারের বিশেষ জ্যাক-এ। কি-বোর্ডে কয়েকটা টোকা দিতেই চালু হলো এনক্রিপশান প্রোগ্রাম। এক সেকেণ্ড পর ফোন থেকে গেল কল।

স্ক্রিনে ফুটল হলদে আইকন। কানেক্ট হচ্ছে কল। এনক্রিপটেড কোড মেনে নেয়ায় সবুজ হয়ে উঠল আইকন।

ওদিক থেকে বলল কেউ, 'লাইন সিকিয়োর।'

'সিকিয়োর লাইন,' পাল্টা বলল হুয়াং, 'যোগাযোগ করিয়ে দাও মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে।'

'একমিনিট।'

অপেক্ষা করতে গিয়ে টাই ঢিলে করল বিলিয়নেয়ার। ব্যথা শুরু হয়েছে তার গলা ও ঘাড়ে। ডেস্ক থেকে স্কচ মদের বোতল নিয়ে গ্লাসে সোনালি তরল ঢেলে ঢকঢক করে গিলল। একটু পর কমপিউটারের স্পিকারের মাধ্যমে এল পুরুষ কণ্ঠ: 'মন্ত্রী মহোদয় অপেক্ষা করছেন, স্যর। লাইন খোলা।'

অর্থাৎ, বেইজিঙের মন্ত্রণালয়ের নিজ অফিসে অপেক্ষা করছে যেইন নিং। 'ঝামেলা হয়েছে,' বলল লো হুয়াং, 'আপাতত বন্ধ করতে হবে সব অপারেশন।'

কয়েক সেকেণ্ড স্ট্যাটিকের আওয়াজ হওয়ার পর, ওদিক থেকে এল নিং-এর কণ্ঠ, 'নানান দিক থেকেই ঝামেলায় পড়েছি আমরা। কিন্তু সব চালু করে দিয়ে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।'

'প্রকাশ পেতে পারে আমাদের সব,' বলল লো হুয়াং। 'আজ দেখা করেছে মাসুদ রানা। বলে গেছে, চিনের পুব সাগরে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক সমস্যার কথা জেনেছে তারা।'

'তাতে অবাক হচ্ছি না,' বলল যেইন নিং। 'কিন্তু তুমি বলেছিলে মারা গেছে লোকটা।'

ক্যাসিনোয় নিজ চোখে তাকে দেখেছে বিলিয়নেয়ার, তবে সে কথা চেপে গেল মন্ত্রীর কাছে। 'আমাকে বলা হয়েছিল ওই দুর্গে মারা গেছে ওরা। এ-গুজব ছড়িয়ে দেয় জাপানি পুলিশ। ছেলেমানুষী বলতে পারেন। আসলে এখনও তদন্ত করছে তারা।'

'আর তুমি নাদান শিশুর মত পড়লে তাদের ফাঁদে।'

অপমানে বুক জ্বলে গেল লো হুয়াং লিটনের। 'গুরু, আপনি হয়তো ভেবে দেখেননি, মস্ত কোনও ভুল হলে কত বড় বিপদে পড়ব আমরা। ভাবুন একবার, জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ হতে না হতেই আমার নিজ এলাকায় এসে হাজির হয়েছে মাসুদ রানা! এটা কাকতালীয় হতেই পারে না! তারা জেনে গেছে, সরীসৃপের চোয়ালে কী করেছে এনসিআর। এবার সার্ভে করবে। কোনওভাবে লুকাতে পারব না মাইনিং সাইট।'

'ঘাবড়ে দিতে চাইছে,' বলল যেইন নিং।

'নিশ্চিত হবেন কী করে, গুরু?'

'কারণ, ওরা আগেই সার্ভে করেছে,' বলল বৃদ্ধ চিনা। 'ওখানে কিছুই পায়নি।'

হতভম্ব হয়ে গেল লো হুয়াং লিটন। সে একমাত্র লোক নয় যে জরুরি তথ্য গোপন করছে! 'কবে এটা হলো?'

'গতকাল,' বলল যেইন নিং, 'একটা সিগনাল ধরা পড়ে আমেরিকান এক রোভ থেকে। সোনার থেকে বোঝা গেছে ওটা ছোট আকারের সাবমারসিবল। ধারণা করছি, গেছে খনি এলাকায়।'

টিসটিসে ব্যথা শুরু হওয়ায় মাথার তালু টিপতে লাগল লো হুয়াং লিটন। 'কীভাবে হলো এমন? আমার তো ধারণা ছিল নেভি পাহারা দেয় ওই এলাকা।'

কী ঘটেছে জানাল যেইন নিং। কথার ভেতর প্রশংসার ভাব থাকল। 'স্বীকার করতে হবে, আমাদের জালের ভেতর

ফুটো পেয়েছে ওরা। আমরা ভাবিইনি, ওদিক দিয়ে ঢুকে পড়তে পারবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা কোরো না, ওরা এমন কিছু পাবে না যে হৈ-চৈ করতে পারবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল লো হুয়াং। 'সব তথ্য পাঠিয়ে দেবে ওয়াশিংটনে।'

'সে সুযোগ পাবে না,' জোর দিয়ে বলল যেইন নিং। 'শাংহাই শহরে পৌঁচেছে নুমার দুই এজেন্ট। তবে দেরি হবে না তাদেরকে কারাগারে ভরতে। গুপ্তচর হিসেবে অভিযোগ তোলা হবে তাদের বিরুদ্ধে। টুঁ শব্দ করার উপায় থাকবে না আমেরিকার। এমন কী বড় কোনও সার্ভের মাধ্যমে নিখুঁত সোনার ম্যাপ, ভিডিয়ো ফুটেজ বা গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং সোনার থেকেও জরুরি কিছু পাবে না ওরা। সত্যিকারের কাজ হয়েছিল তোমার মেশিন দিয়ে গভীর সুড়ঙ্গের ভেতর। অতটা গভীরে যাবে না সোনার।

'বড়জোর আমেরিকানরা জানবে, মাইনিং হয়েছে সাগরতলে, তবে পরে ভূমিকম্প বা অন্য কোনও কারণে তা পরিত্যক্ত হয়। ক্যানিয়নের নিচে রয়ে গেছে ধ্বংসস্তূপ। তবে সেসব এখন হাজার হাজার মাছের বাড়ি। নতুন কিছুই জানবে না তারা। আপাতত বোঝার উপায় নেই ওখান থেকে উত্তোলন করা হয়েছে সোনালি শিখা। আর শেষে ওরা যখন কিছু বুঝবে, ততক্ষণে আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে জাপানি সরকার। এদিকে তোমরা হোক্কাইডো থেকে তুলবে সোনালি শিখা। অবশ্য, খনিটা খুঁজে বের করতে পারলে তবেই।'

নরম সুরে বলল লো হুয়াং, 'আমরা খনি পাওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আশা করি আজই হাতে পাব প্রাচীন কিছু তলোয়ার আর মাসামিউনের ডায়েরি। শেষের ওটায় আছে কীভাবে কঠিন হয় ধাতু। ডায়রি থেকে জানব, কোথায় আছে ওই অ্যালয়। তবে শাংহাই-এ নুমা এজেন্ট আগেই সব ফাঁস করে দিলে আর কিছুই করতে পারব না।'

কিছুক্ষণের জন্যে চুপ হয়ে গেল যেইন নিং। ভাবছে ওয়েইকিউই খেলার জটিল কোনও কৌশল। এ সুযোগে আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল লো হুয়াং লিটন।

অন্তত দু'মিনিট পর বৃদ্ধ বলল, 'তুমি তো বললে তোমার কাছে এসেছিল মাসুদ রানা?'

'জী। সাহায্য চেয়েছে। ওই খনি দেখতে চায়।'

'ওয়েইকিউইর কঠিন চাল দিয়েছে,' বলল যেইন নিং। 'কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছে তোমাকে।'

'একটা বাড়তি কথাও বলিনি। কিছুই জানতে পারেনি।'

'ওর খেলা পাকা খেলোয়াড়ের মত, প্রশংসা না করে পারছি না। জানা দরকার কতটুকু জেনেছে সে।'

'আমার জানা নেই।'

'খেলার প্রথম শিক্ষা ভুলে যেয়ো না,' বিরক্ত হয়ে বলল নিং। 'প্রতিপক্ষ সাহসী হয়ে ঝুঁকি নিলে, তখন ভাল সুযোগ পাবে তুমি। সাহসী লোক সে। ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করে না। তার মানে, তাকে ফেলা যাবে বিপদে। ওর গোয়ার্তুমি কাজে লাগাতে হবে নিজেদের পক্ষে।'

'তা কীভাবে করব, গুরু?'

'আমরা চাই জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে আমেরিকার বিরুদ্ধে চেতিয়ে দিতে, তাই না?'

'আমরা মাসুদ রানা আর সোহেল আহমেদকে সরিয়ে ফেললেও আমেরিকার সরকার বলবেঃ নিজে থেকে যা খুশি করেছে তারা,' বলল লো হুয়াং, 'কোনও দায় নেবে না শ্বেতাঙ্গরা। তার ওপর, এরা জাতে বাঙালি।'

'গায়েব করে দাও,' বলল যেইন নিং। 'ওদের জায়গায় সেট করো আমাদের নতুন দু'জনকে।'

'তার মানে... গুরু, আপনি বলছেন...'

'তাই বলছি,' জোরের সঙ্গে বলল বৃদ্ধ, 'আপাতত আমেরিকান সরকার বা নুমার হয়ে কাজ করছে মাসুদ রানা

আর সোহেল আহমেদ। তারা চিন-নিপ্পন সহযোগিতামূলক চুক্তি অনুষ্ঠানে এসে জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে খুন করলে শুরু হবে ভীষণ হৈ-চৈ। প্রচণ্ড খেপবে জাপানি পাবলিক। তাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে জাপান-আমেরিকার সম্পর্ক। যেটা চিনের জন্যে অত্যন্ত লাভজনক হবে বলেই মনে করি।'

হাসল হুয়াং। 'আপনি বরাবরের মতই সঠিক বলেছেন, পরম গুরু! সুযোগটা নিজে দেখিনি বলে মাফ করে দেবেন। ঠিক, সরাসরি মুঠোয় ধরা দিয়েছে এসে মাসুদ রানা!'

তেত্রিশ

শাংহাই শহরের ব্যস্ত রাস্তায় চলতে চলতে ক্রিঁচ্ আওয়াজে ব্রেক কষল বিশাল ডাবল ডেকার বাস। নিচু হলো ইঞ্জিনের গর্জন। ঝাঁকি খেয়ে চুপ হয়ে গেছে সবাই। নতুন করে গতি তুলছে বাস। দু'পাশের ফুটপাথে গিজগিজ করছে ছোট সব দোকান। চিরুনি থেকে কমপিউটারের পার্টস, কী নেই সেখানে। সামনের এক লেন মেরামত করছে সড়ককর্মীরা। খুব ধীরে এগোচ্ছে গাড়িঘোড়া।

বাসের নিচতলায় দাঁড়িয়ে আছে আসিফ রেজা। দু'হাতে ধরেছে সিলিং থেকে ঝুলন্ত স্ট্র্যাপ। পাশের সিটে বসেছে ওর স্ত্রী তানিয়া। ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে নতুন পোশাক ও জুতো কিনেছে ওরা। আলাপ করেছে, কীভাবে সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকবে শাংহাই-এর আমেরিকান কনসুলেটে।

শাংহাই টুর্স্ লিমিটেডের ব্রোশিওর দেখে বুদ্ধিটা এসেছিল

আসিফের মগজে। দু'ঘণ্টা পর ওরা উঠল রঙচঙে প্রকাণ্ড বাসে। এখন ওটা ওদেরকে নিয়ে চলেছে শহরের কেন্দ্রে।

চারপাশে বসে আছে টুরিস্ট। বেশিরভাগই আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান। আসিফ ও তানিয়া আশা করছে, চট্ করে ওদেরকে এখানে খুঁজবে না চাইনিয পুলিশ।

যাওয়ার পথে পড়ছে ঐতিহাসিক মন্দির, রাজ প্রাসাদের মত সরকারী সব দালান। একটু পর দেখা গেল প্রকাণ্ড এক কংক্রিটের উঁচু দালান। আগে ওটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কসাইখানা। চালু করেছে নতুন করে। ওখানে রয়েছে দেশ সেরা সব দোকান ও রেস্টুরেন্ট। সুনাম অর্জন করেছে বেশ কিছু ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট ও দোকান।

কিছুক্ষণের জন্যে বাস থামল ওরিয়েন্টাল পার্ল টাওয়ারের সামনে। শাংহাই শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় দালান ওটা। বাণ্ডিল করা বলয় ও বিশাল পাইপ আকৃতির কলাম ও বিম সোজা উঠেছে পনেরো শ' ফুট ওপরের আকাশে।

'দেখলে মনে হয় বিগড়ে গেছে কারও বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট,' বলে উঠল কে যেন।

খুব মুগ্ধ, এমন ভাব করছে আসিফ ও তানিয়া। বাস্তবে অপেক্ষা করছে যাত্রার শেষাংশের জন্যে। বাস পৌঁছে দেবে ওদেরকে শহর কেন্দ্রে আমেরিকান কনসুলেট বাড়ির কাছে।

একটু পর গন্তব্যে পৌঁছুবে ওরা। জ্যাম বেশি বলে ধীর হয়েছে বাসের গতি। কিন্তু একটু দূরে চোখ যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল তানিয়া ও আসিফের।

'কনসুলেটের কথা ভুলে যাও,' নিচু গলায় বলল তানিয়া।

মাথা দোলাল গম্ভীর আসিফ। চারপাশ থেকে কনসুলেট ঘিরে রেখেছে চাইনিয পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোক। নানাদিকে ব্যারিকেড। কেউ ওদিকে গেলেই দাঁড় করিয়ে পাসপোর্ট চেক করছে অফিসাররা। তাদের চোখ এড়িয়ে গলবে না ছোট সুঁই-ও। 'কারও কিছু বলার নেই। বোধহয়

সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ব্যবস্থা নিয়েছে আমেরিকানদের নিরাপত্তার জন্যেই।'

'বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতেও বাধা দেয়া হবে,' বলল তানিয়া। 'আমরা বাঙালি। তাই ওখানেও চোখ রাখবে এরা।'

ট্রাফিক সিগনাল পড়তেই থামল বাস। এক দম্পতির ওপর চোখ পড়ল আসিফের। সিকিউরিটির লোকদের দিকে আঙুল তাক করে কী যেন বলছে তারা। একটু ঝুঁকে জানতে চাইল শান্ত দানব, 'জানেন, কেন ওখানে এত পুলিশ?'

ঘুরে ওকে দেখলেন বয়স্ক দম্পতি। গেঞ্জিতে মেপল লিফ। আসিফ ধারণা করল, এঁরা কানাডিয়ান। মহিলা বললেন, 'শুনলাম ওখানে নাকি হামলা করবে ইসলামি জঙ্গিরা। ভাবুন কী ভয়ানক কথা! আজ সকালে আমাদের হোটেলে পুলিশ এসেছিল। তখনই জানলাম, কানাডিয়ান আর ব্রিটিশ কনসুলেটও ঘিরে রেখেছে। বোমার কথা ভাবলেই গলা শুকিয়ে যায় আমার। ভাল করতাম এখানে না এসে অন্য কোথাও গেলে। এখন তো বাড়িই ফিরতে পারব না। বেইজিঙে আমাদের বন্ধু আছে, কিন্তু ওখানেও যেতে দেবে না। বন্ধ করে দিয়েছে এয়ারপোর্ট আর ট্রেন স্টেশন।'

'আমি তো এসব কিছুই শুনিনি,' আকাশ থেকে পড়ল আসিফ। 'আমাদের তো ফ্লাইট আগামীকাল!'

আফসোসের হাসি হাসলেন বয়স্কা মহিলা। 'দেরি না করে এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শুনলাম, অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে আটকে গেছি আমরা সবাই।'

মাথা নাড়ল আসিফ। 'তা হলে তো যোগাযোগ না করে উপায় নেই।' মহিলাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল ও। 'দয়া করে আপনার মোবাইল ফোনটা একটু দেবেন? খুব জরুরি কল। আমারটা চুরি হয়ে গেছে।' আগে দেখেছে আসিফ, কেউ বিপদে পড়লে বেশিরভাগ সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কানাডিয়ানরা।

'কাজ হবে না, বাছা,' বলল মহিলার স্বামী। 'শহরের ভেতর সেল ফোনের নেটওঅর্ক বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।'

'বাদ পড়েনি ইন্টারনেটও,' বলল মহিলা। 'আমরা যেন পৌঁছে গেছি পাথর যুগে।'

'বা উনিশ শ' ত্রিশে,' বলল স্বামী।

মৃদু হাসল আসিফ। আগে জানত না এত কাছেই ছিল পাথর যুগ। 'ল্যাণ্ড ফোনে কল দেয়া যাবে?'

'ওটাই ব্যবহার করেছি,' বলল কানাডিয়ান মহিলা। 'কল করেছি হোটেল থেকে।'

তথ্যের জন্যে স্বামী-স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে তানিয়ার পাশে বসে পড়ল আসিফ। পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'শুনেছ?'

'হুঁ। সব পথ আটকে দিচ্ছে কেউ। এসব করা হচ্ছে আমাদের জন্যে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল আসিফ, 'ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোন নেটওঅর্ক নেই, কাজেই আমাদের তথ্য কোথাও পাঠাতে পারব না।'

চুপ করে থাকল তানিয়া। তবে কিছুক্ষণ পর সামনে চেয়ে বলল, 'সব পথ বন্ধ হয়নি।' সামনের সিটের পেছনে ছোট্ট টিভি স্ক্রিন দেখাল। লাইভ ব্রডকাস্ট করছে সিএনএন-এর সংবাদ-কর্মী। দুনিয়াকে জানাচ্ছে জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে শাংহাই শহরের ইন্টারনেট।

'নেটওঅর্ক এখনও কাজ করছে,' বলল তানিয়া। 'ওদের নিজেদের স্যাটেলাইট আছে। লিঙ্ক করছে ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কের ব্যুরোর সঙ্গে। আমরা যদি এক মিনিটের জন্যে ওদের...'

তানিয়া চুপ হয়ে গেলেও বক্তব্য বুঝে গেছে আসিফ। নিচু গলায় বলল, 'কাজটা বিপজ্জনক। তবে কখনও এমন কোনও সাংবাদিক দেখিনি, যে কিনা দুর্দান্ত কোনও খবর পেয়েও চুপ করে বসে থেকেছে। আমরা যদি বড় টোপ ফেলি, হয়তো

সাহায্য করতেও পারে।'

'কোনও অফিসে গেলে ধরা পড়ব,' বলল তানিয়া, 'আমাদের চাই ওদের কোনও মোবাইল ট্রাক।'

স্ক্রিনের রিপোর্টারের দিকে তাকাল আসিফ। 'বেশিক্ষণ লাগবে না ওখানে পৌঁছে যেতে। জায়গাটা চিনতে পেরেছ?'

'চেনার কথা? বংশাল, না সূত্রাপুর?'

'একঘণ্টা আগে ওখানেই ছিলাম,' বলল আসিফ, 'ওই যে পেছনে ওরিয়েন্টাল পার্ল টাওয়ার। চলো, বাস থেকে নেমে পড়ি।'

পরের স্টপেজে টুরিস্ট বাস থেকে নামল ওরা। ট্যাক্সি নিয়ে গেল সরাসরি ওই টাওয়ারের কাছে। পার্কিং লটে ঢুকে ভাবল, খনি পেয়েছে সোনার। বিশাল উঁচু স্তম্ভের নিচে পার্ক করা হয়েছে বেশ কয়েকটা স্যাটেলাইট টিভি নেটওঅর্কের সাংবাদিক বহনকারী ট্রাক। নামকরা এই ল্যাণ্ড মার্ক টাওয়ারটাকে নিজেদের ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করছে সবাই।

উদাস ভাব ধরে প্রথম দুটো মোবাইল ট্রাক পাশ কাটাল আসিফ ও তানিয়া। গাড়িগুলোর ছাতে স্যাটেলাইট ডিশ। এই জিনিসই চাই ওদের।

'এগুলো লোকাল নেটওঅর্কের ট্রাক,' বলল তানিয়া। ওর চোখ পড়েছে একটু দূরে কয়েকটা গাড়ির ওপর। 'আমাদের দরকার আমেরিকান নেটওঅর্ক। সিএনএন, ফক্স, বা...' চুপ হয়ে গেল ও। এইমাত্র নতুন শট দেয়ার জন্যে একটা ট্রাক থেকে নেমেছে এক মহিলা সাংবাদিক। 'আইএনএন,' বিড়বিড় করল তানিয়া। 'ইণ্ডি নেটওঅর্ক নিউয। ওটাই চাই। ওই নেটওঅর্কে সর্বক্ষণ চলছে নানান ষড়যন্ত্রের থিয়োরি।'

মৃদু হাসল আসিফ। 'কবে থেকে এসব দেখো?'

'রাতে, সুযোগ পেলে... হাতে চকলেট আইসক্রিমের বড় বক্স,' অপরাধী সুরে স্বীকার করল তানিয়া।

‘ও, তাই বলি ট্র্যাশক্যানে কোথা থেকে আসে খালি আইসক্রিমের এত বাক্স,’ বলল আসিফ। ‘যাক গে, মোটা বউ পেলে তোষকের কী দরকার! রেডি হও, মহিলা সাংবাদিকের রিপোর্ট শেষ হলেই কথা বলব।’

ক্যামেরাম্যানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। থেমে শুটিং দেখছে কয়েকজন টুরিস্ট। কানে ইয়ারপিস পরে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেয়ার পর মহিলা-সাংবাদিক বলল, ‘আগেরবার কথার সময় মিলিটারি হেলিকপ্টারের আওয়াজ ছিল। ওটা জুড়ে দিতে হবে। উত্তেজনা আসবে দর্শকের মনে।’

‘ঠিক আছে,’ সায় দিল ক্যামেরাম্যান। ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে রাখতে লাগল সে। পাশাপাশি কয়েকটা মোবাইল ট্রাকের একটার দিকে চলল রিপোর্টার। গাড়ির পেছন দরজা খুলে উঠবে, এমনসময় ডাকল তানিয়া, ‘মিস হিউবার্ট, সরি, বিরক্ত করছি। আমি আপনার মস্তবড় ফ্যান। হুভার ড্যামের নিচে কী আছে, তা নিয়ে যে ডকুমেন্টারি করেছিলেন, ওটা দেখে আত্মা কেঁপে গিয়েছিল আমার।’

বিরক্তি কেটে গেল মিস হিউবার্টের। মিষ্টি করে হাসল। ‘থ্যাঙ্ক্স্! তবে স্বীকার করতে দোষ নেই, নিজে কিন্তু কোনও দিনও নেভাডায় যাইনি। অনেক তথ্য জোগাড় করে তৈরি করেছি ওই ডকুমেন্ট। ভাল লাগল যে আপনার খারাপ লাগেনি। এ থেকে বুঝতে পারছি, কাজটা মন্দ হয়নি।’ এবার জানতে চাইল, ‘আমাকে কি আপনার সঙ্গে সেলফি তুলতে হবে?’

‘একটা সই দিলে খুশি হব,’ ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট নোটবুক ও কলম নিয়ে বাড়িয়ে দিল তানিয়া। ওগুলো নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে কী যেন পড়তে লাগল মিস হিউবার্ট।

কাগজে তানিয়া লিখেছে কেন এসেছে। সাহায্য দরকার ওদের।

মুখ তুলে তাকাল রিপোর্টার। 'আমার অফিসের কেউ আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে মজা করতে?'

'মজা করছি না, বিশ্বাস করুন,' বলল তানিয়া। 'আমরা কি আপনার ট্রাকে বসে আলাপ করতে পারি? সব খুলে বলতে একটু সময় লাগবে।'

কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর দরজা খুলে ক্যামেরাম্যানকে বলল, 'জনি, কিছুক্ষণ পর কথা বলব, ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল ক্যামেরাম্যান। মিস হিউবার্টের পিছু নিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠল তানিয়া ও আসিফ।

ব্রডকাস্ট ভ্যান অ্যাম্বুলেন্সের মত, তবে ভেতরে রয়েছে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের বদলে কমপিউটার ও প্রোডাকশন গিয়ার। কফিনের মতই বদ্ধ জায়গা। পেছনে দুটো ছোট সিট। তার একটায় বসল মিস হিউবার্ট। অন্যটা দখল করল তানিয়া। কেবিনেটে পিঠ কুঁজো করেও মাথা হেঁট হয়ে গেল লম্বু আসিফের।

'সরাসরি মূল কথায় আসা যাক,' বলল মিস হিউবার্ট। 'আপনারা ইউএস সরকারের গোপন এজেন্সির এজেন্ট। আপনাদেরকে খুঁজছে চিনা পুলিশ ও মিলিটারি। যাতে ওয়াশিংটনে ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন, তাই এত কিছু করছে। আমি কি ঠিক বুঝতে পেরেছি?'

'আসলে... নুমা গোপন এজেন্সি নয়,' শুধরে দিতে চাইল তানিয়া।

'আমি জীবনেও ওটার নাম শুনিনি,' বলল রিপোর্টার।

'আমরা ঠিক বিজ্ঞাপন প্রচার করি না,' জানাল আসিফ।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝলাম,' অন্য প্রসঙ্গে গেল মিস হিউবার্ট, 'কিন্তু তা হলে আপনাদেরকে এত কষ্ট করে খুঁজছে কেন চাইনিয সরকার? কেন তারা আস্ত একটা শহরের সব স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেবে?'

'সব শুনলে বুঝবেন,' বলল তানিয়া।

'ব্যাখ্যা করে বলুন, যেন বুঝতে পারি,' বলল মহিলা রিপোর্টার। 'সাধারণ মানুষ মনে করে আমার কাজ স্রেফ পাগলামি। তবে কপাল ভাল, প্রডিউসাররা তা মনে করেন না। তাই পাবলিকের কাছ থেকে সহায়তা নিতে হয় না। বরং আমরাই নতুন খবর জানিয়ে চমকে দিই।'

'বিশ্বাস করুন, আমরা কাউকে চমকে দিতে বা মজা করতে এখানে আসিনি,' বলল তানিয়া। 'আমরা কোনও সিক্রেট এজেন্ট নই। আমি গুপ্তচর নই, সাধারণ মেরিন বায়োলজিস্ট। আসিফ জিয়োলজিস্ট। আমরা চাইনিয সাগরে দেখেছি মানুষের তৈরি অস্বাভাবিক কিছু জিনিস। সোনার রিডিং পেয়েছি। ফলে ধারণা করছি, চিনের কারণে হচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে ইকোলজিকাল বিপর্যয়। যা আবিষ্কার করেছি, তাতে চিন সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে প্রচণ্ড চাপ আসবে। তাই তারা চাইছে আমাদেরকে গ্রেফতার করে সরিয়ে ফেলতে। অথচ, খুব জরুরি এসব তথ্য ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া।'

'ভাল কথা, বুঝলাম,' বলল মিস হিউবার্ট, 'কিন্তু আমার তো জানা আছে, তাদের নিজেদের এলাকায় যা খুশি করতে পারে চিন সরকার। ওই সাগর তাদের এলাকায় পড়ে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিপর্যয় হলে সেজন্যে আপনাদেরকে কেন গ্রেফতার করতে চাইবে তারা?'

'কারণ চিনের পুব সাগরের এ কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেলে হৈ-চৈ শুরু হবে আন্তর্জাতিক আঙিনায়,' বলল তানিয়া। 'ছি-ছি করবে সবাই। প্রচণ্ড চাপ আসবে সরকারের ওপর।'

তানিয়া থামতেই সোজা হয়ে বসল মিস হিউবার্ট। 'তা হলে কি আপনারা বলতে চান, আগের চেয়ে দ্রুত উঠে আসছে সাগর সমতল? আর সেটা হচ্ছে চিনের কারণে?'

'হু-হু করে বাড়ছে পৃথিবীর প্রতিটি সাগরের উচ্চতা, তবে

সেটা হচ্ছে তাদের কারণেই, এমন প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই। প্রতি বছর দশ ফুট করে সাগর উঠে এলে, তলিয়ে যাবে বহু দেশ। আগামী ছয় মাসে ডুববে সাগরের কাছের অনেক নিচু দেশের উপকূল।'

'এটা নিউয পেপারের বিশাল হেডলাইন হবে,' বলল মিস হিউবার্ট।

'চিনের পুব সাগরে তদন্তের সুযোগ এ দেশের সরকার দেবে না,' বলল তানিয়া। 'এসব তথ্য ওয়াশিংটনে পাঠাতে চাই বলেই নানাভাবে বাধা দিচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আস্ত সাগর ডাঙায় উঠে এলে সর্বনাশ হবে বহু দেশের। ওটাকে বলতে পারেন সত্যিকারের মহাপ্লাবন।'

'ঘনিয়ে আসছে অকল্পনীয় মহাপ্লাবন!' বিড়বিড় করল মিস হিউবার্ট। 'পরে একসময় কমপিউটার গেম ছাড়বেন। তাতে আসবে কোটি কোটি টাকা।'

'মিস হিউবার্ট,' ডাকল তানিয়া।

'আমাকে মেরিয়ান বলে ডাকলে খুশি হব।'

'আমি মিথ্যা বলছি না,' কাতর গলায় বলল তানিয়া। 'একবার ভেবে দেখুন কী হচ্ছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে দিয়ে ঘিরে রেখেছে পশ্চিমা সব কনসুলেট। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এয়ারপোর্ট ও রেল স্টেশন। গোপন এবং বিপজ্জনক তথ্য ফাঁস হবে, সে ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট আর সেল ফোনের নেটওঅর্ক। ওই মারাত্মক তথ্য রয়ে গেছে আমাদের কাছে। দুনিয়াকে জানাতে হবে কী ঘটছে। অথচ, সে সাধ্য আমাদের নেই। তবে আপনি একবার স্যাটেলাইট ডিশ ব্যবহার করতে দিলে, এসব জরুরি তথ্য পাঠিয়ে দেব আমেরিকায়। মানুষ অন্তত জানবে কী ভয়ানক সর্বনাশের দিকে চলেছে তারা।'

পরিচিত সাহসী এক মহিলা সাংবাদিকের কাছে সাহায্য চেয়েছে তানিয়া। দ্বিধায় পড়ে গেছে মেরিয়ান হিউবার্ট।

এবার অন্যদিক থেকে তার মনের দুর্গে ঢুকল আসিফ। সহজ সুরে বলল, 'এটা একজন সাংবাদিকের সারাজীবনের সেরা কাহিনী। হয়তো পাবে পুলিৎযার পুরস্কার। তার চেয়েও বড় কথা, সেধে কাজ দেবে বিশাল সব নেটওঅর্ক থেকে। আগামী বছর হয়তো থাকবে সে ২০/২০ নেটওঅর্কে। তখন বিগফুট বা এলিয়েনেরা লোক তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সেসব ছোটখাটো রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। হয়তো পাবে নিজস্ব শো।'

হেসে ফেলল মেরিয়ান। 'হয়তো, অথবা আপনারা দু'জন আসলে খেপা পাগল!'

'আমাদের কাছে রয়ে গেছে ভিডিয়ো আর সোনার ডেটা,' বলল তানিয়া। আসিফের কাছ থেকে ল্যাপটপ নিয়ে মহিলা সাংবাদিকের হাতে দিল ও। 'নিজেই দেখুন।'

চৌত্রিশ

গাড়ি হোয়াইট হাউসের ড্রাইভওয়েতে ঢুকতেই আরও গম্ভীর হলেন নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। পাশের সিটে বসা তাঁর সহকারী কমোডর জোসেফ কার্কের গলা শুকিয়ে গেছে। তলব করেছেন নতুন প্রেসিডেণ্ট। অত্যন্ত রাগী মানুষ। নিজের আছে হাজার দোষ-ত্রুটি, সেসবের ভেতর মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারির কথা বিশ্বের সবারই জানা, অথচ অন্যের বেলায় পান থেকে চুন খসলে হয়ে ওঠেন খড়্গ হস্ত। অল্পদিনেই সবাই বুঝে গেছেন, এই প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক।

তাঁর ধারণা: সুযোগ বুঝে যে-কোনও দুর্বল দেশে হামলা করে বা করিয়ে, একবার যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেই লাখে লাখে অস্ত্র বিক্রি করে আবারও ধনী হয়ে উঠবে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেই তাঁকে এখনও রাখা হয়েছে হোয়াইট হাউসে।

রিসেপশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও কমোডর কার্ককে। একটু পর তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ওভাল অফিসে।

বিশাল ডেস্কের ওদিকে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বাগিয়ে দেখছেন ছোট এক অ্যান্টিক কাগজ। হ্যামিলটন ও কার্ক ঘরে ঢুকতেই ওটা পাশে রেখে হাতের ইশারায় দেখালেন সামনের সিট। তাঁরা বসতেই বললেন, 'আপনাদের নুমার অনেক সুনাম শুনেছি। তাই জানতে চাইছি, হঠাৎ কেন এশিয়ায় গণ্ডগোল করছে আপনাদের লোক?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন হ্যামিলটন।

'স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে, জাপানে তুলকালাম কাণ্ড করছে আপনাদের স্পেশাল প্রোজেক্ট টিম। তারা আবার আমেরিকানও নয়। বাংলাদেশি। তা হলে কি ধরে নেব, নুমার নাম ভাঙিয়ে যা খুশি করছে তারা? স্থানীয় গ্যাংস্টার থেকে শুরু করে সরকার বিরোধীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। পুড়িয়ে দিয়েছে হাজার বছরের পুরনো এক কাঠের জাপানি দুর্গ। শুধু তাই নয়, চিন থেকে খবর এসেছে, তাদের দু'জনকে ধরতে গোটা শাংহাই শহরে জাল পেতেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। গুপ্তচরের মত তাদের দেশে ঢুকেছে ওই দুই বাঙালি নুমা এজেন্ট।'

হ্যামিলটন জানতেন আগে হোক বা পরে, এ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসতে হবে তাঁকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন

তিনি, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সাগর বিষয়ক সমস্যা নিয়ে কাজ করছে ওরা। এবং আমার ধারণা, যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে গোটা পৃথিবীর ওপর, সেটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক আছে চিনের।'

'চিনের সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করে তাদের এলাকায় ঢুকেছে ওরা।'

'জরুরি তথ্য পাওয়ার জন্যে আমিই বলেছি, দরকারে যে-কোনও দেশে যেতে পারো,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'সেজন্যে যে-কোনও দায় মাথা পেতে নেব আমি।'

ভুরু কুঁচকে অ্যাডমিরালকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'আশা করি আপনারা জানেন, চিন ও আমাদের বর্তমান সম্পর্ক। এ-ও অজানা নয়, জাপান আর আমাদের বন্ধুত্ব কতটা নাজুক। চিন ক'বছর ধরেই চেষ্টা করছে জাপান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশকে নিয়ে ব্যবসায়িক ও সামরিক গোষ্ঠী গড়তে। কিছু দিন আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধ বিচারে স্বাক্ষর করেছে জাপান ও চিন। এর পর পরই প্রথমবারের মত সাগরে যৌথ সামরিক মহড়া করেছে দুই নেভি। পারস্পরিক ব্যবসায়িক চুক্তি হচ্ছে আগামীকাল। এদিকে জাপানের পার্লামেন্টে প্রস্তাব উঠছে: অনুচিত হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি টিকিয়ে রাখা।'

'কিন্তু এসবের সঙ্গে নুমার...'

হাত তুলে অ্যাডমিরালকে থামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'চিন সরকার এখন নুমা বা আমেরিকান সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলে, সেটা হবে আগুনে তেল ঢেলে দেয়ার মত। গত বাহাত্তর ঘণ্টায় প্রাচীন দুর্গ পুড়িয়ে দেয়ার ছবি বহুবার এসেছে জাপানি প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায়।'

তিনি থামার পর বললেন অ্যাডমিরাল, 'তাতে আমাদের কিছু করার ছিল না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমাদের লোক পুড়িয়ে দেয়নি ওই দুর্গ। সত্যি হচ্ছে, ওই দুর্গের বাসিন্দা আর

আমাদের টিমের সবাইকে খুন করতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় ওখানে। আমাদের ধারণা, ওই হত্যার পরোয়ানা এসেছে চিন থেকে।'

'তাই?'

'জী। এবং শাংহাই-এ না গিয়ে উপায় ছিল না আমাদের টিমের। আমরা রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে নয়, ভাবছি পৃথিবী রক্ষার বিষয় নিয়ে। আপনি হয়তো জানেন, সাগরের পানি হুড়মুড় করে উঠে আসছে সাগরের পারের প্রতিটি দেশে। তা ঠেকাতে না পারলে ভবিষ্যতে কোনও রকম রাজনীতিই থাকবে না পৃথিবীতে।'

বাতাসে হাতের ঝাপটা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'সাগরের কথা বাদ দিন। আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা স্রেফ পাগল হয়ে গেছেন।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' অপমানে লাল হয়েছে অ্যাডমিরালের নাক। 'তবে আমার ধারণা, পৃথিবী জুড়ে আসছে ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবন। কাজেই পাগল হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কোনও লোকের। ভাল হয় একটু আগে পাওয়া ভিডিয়ো ফুটেজ আপনি নিজে একবার দেখলে।'

কিছুক্ষণ অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে তারপর বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ঠিক আছে, দেখছি।' একটা রিমোট কন্ট্রোল তুলে দূরের দেয়ালে তাক করলেন তিনি। বাটন টিপতেই সরে গেল কাঠের প্যানেল। ওখানে দেখা দিল হাই-ডেফিনিশান মনিটর।

চালু হয়েছে ভিডিয়ো। দেখা গেল সাগরতলের দৃশ্য। একপাশে নানান ধরনের ইন্সট্রুমেন্টাল রিডিং।

'ওটা সাধারণ রোভের ইন্টারফেস,' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন জোসেফ কার্ক।

মাঝে মাঝে ঝাঁকি খাচ্ছে ভিডিয়ো। তিন সেকেণ্ডের জন্যে দেখা গেল ঘুরপাক খাওয়া কাদামাটি ও পানি। পরের দৃশ্যে

এল সোনার ইমেজ। মনে হলো সাগরতলে রয়েছে কোন্ আইসক্রিম আকৃতির পাহাড়ি ঢিবি। ওটার চূড়া থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে গরম পানি। একটু পর দেখা গেল সাগরতলে কীসের যেন ধ্বংসস্তূপ। জঞ্জালের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা রোবটিক হাত ও মুখ।

'এসব কোথায় পেলেন?' বেয়াড়া সুরে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট ডাম্প।

'একটু আগে প্রচার করা হয়েছে ইণ্ডি নিউয নেটওঅর্ক থেকে,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এজন্যে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি কেউ। পরে বলা হলো, হ্যাক করা হয়েছে তাদের স্যাটেলাইট। কিন্তু ট্র্যান্সমিশনের সময় দেয়া হয়েছে কিছু সংখ্যা। ওগুলো আসিফ রেজা এবং তানিয়া রেজার নুমা আইডি কোড।'

'যে দু'জন গোপনে গেছে শাংহাই শহরে,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'জী।'

'আপনি জানতেন ওরা ধরা পড়তে পারে। তখন উপায় থাকবে না ওদেরকে ফিরিয়ে আনার।'

'কাজটার গুরুত্ব বুঝেই ঝুঁকি নিয়েছে ওরা,' বললেন হ্যামিলটন, 'এবার চেষ্টা করতে হবে বের করে আনার।'

'তা সম্ভব নয়,' প্রস্তাবটা নাকচ করলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা এমন কী এটাও স্বীকার করব না যে তারা এ দেশ থেকে কোথাও গেছে।'

'ওরা ধরা পড়লে অস্বীকার করে লাভ হবে না,' বললেন জোসেফ কার্ক।

অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় রাগ। 'আপনারা বাজে ঝামেলায় ফেলেছেন আমেরিকাকে।'

'সেজন্যে আমরা দুঃখিত,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবে আরও বাজে হবে ওরা চাইনিযদের হাতে ধরা পড়লে।'

‘ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে, সেটা হবে আগুনে ঘি ঢালার মত,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘তার চেয়ে চুপ করে বসে থাকা ভাল। দেখা যাক কী হয়। যদি চাইনিযরা ধরে নেয় বিষয়টা পাত্তা দিচ্ছি না আমরা, হয়তো অতটা গুরুত্ব দেবে না।’

‘সেক্ষেত্রে গোপনে কবর দেবে আসিফ ও তানিয়াকে,’ নরম সুরে বললেন হ্যামিলটন।

‘আপনার কথা অনুযায়ী, চিনে যাওয়ার ঝুঁকি ওরা জেনে বুঝেই নিয়েছে,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। বন্ধ করলেন ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভির প্যানেল। ‘ওদেরকে ওই দেশ থেকে বের করতে গিয়ে জটিলতা বাড়াবেন না। আমার আর কিছু বলার নেই।’

চেয়ার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল ও কমোডর।

‘ভাল থাকুন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন জর্জ হ্যামিলটন।

তাঁর পিছু নিলেন কার্ক। রিসেপশন এরিয়ার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, ‘স্যর, বিপদ আছে জেনেও ওদেরকে ওই দেশে যেতে উৎসাহিত করেছি আমরা।’

মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল। ‘দেখেছি ওদের ডেটা। সত্যিই উঠে আসছে সাগর। প্রেসিডেন্টও তা বুঝবেন। কিন্তু কিছু করবেন না। রাজনৈতিকভাবে তাঁর হাত-পা বাঁধা। তবে অর্ধেক ফ্লোরিডা তলিয়ে গেলে হাউমাউ করে উঠবে সবাই।’

‘স্যর, আমরা চুপ করে থাকলে, সেটা হবে মানব সভ্যতার সঙ্গে বেঈমানি।’

মৃদু মাথা দোলালেন হ্যামিলটন। ‘আসিফ ও তানিয়া আরও ডেটা পাঠালে হয়তো টনক নড়বে হোয়াইট হাউসের। তবে সেজন্যে বসে থাকব না আমরা। জানতে হবে চিনের কারণে ঘটছে কি না এই বিপর্যয়। কিছু করার জন্যে হাতে বেশি সময়ও পাব না আমরা।’

‘আমরা কি গোপনে কোনও সাবমেরিন পাঠাতে পারি,

স্যর?' জানতে চাইলেন কার্ক। 'নেভিতে অনেকেই আপনার ভক্ত। হয়তো অনুরোধ করলে...'

মাথা নাড়লেন হ্যামিলটন। 'উপায় নেই। আসিফ ও তানিয়া ওখানে যাওয়ার পর আরও কড়া পাহারা দিচ্ছে চাইনিয নেভি। আমাদের সাবমেরিন ওদের পানিতে ধরা পড়লে ধরে নেয়া হবে, সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। ফলাফল ভয়ঙ্কর।'

ফয়েতে বেরিয়ে এলেন হ্যামিলটন ও কার্ক। নিচু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল, 'তবে একটা কথা পরিষ্কার, যা-ই ঘটুক, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব আসিফ-তানিয়াকে চিন থেকে বের করে আনতে।'

মাথা দোলালেন কার্ক। 'জী, স্যর, তাই উচিত, নইলে ছোট হব নিজেদের বিবেকের কাছে।'

'পরিস্থিতি আরও জটিল না করে গোপনে করতে হবে কাজটা।' গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন অ্যাডমিরাল। 'এসো।'

গম্ভীর চেহারায় গাড়িতে উঠলেন দু'জন।

পঁয়ত্রিশ

কোনও ভণিতা না করেই আসিফ ও তানিয়ার মস্ত বিপদের কথা রানাকে সংক্ষেপে জানালেন কমোডর জোসেফ কার্ক। ভারী হয়ে গেছে দু'জনেরই মন।

'আপনারা কি ভাবছেন ওদেরকে আমেরিকায় ফিরিয়ে নিতে পারবেন?' জানতে চাইল রানা।

'উপায় খুঁজছি,' বললেন কার্ক, 'এদিকে অ্যানালাইয করা হচ্ছে ওদের পাঠানো ডেটা। ভিডিয়োতে যে ঢিবিটা, প্রথমে দেখলে মনে হবে ওটা আগ্নেয়, কিন্তু আসলে তা নয়। গন্ধক, আর্সেনিক, কয়লা বা অন্যকিছু নয়, শুধু উৎক্ষেপ করছে গরম পানি।'

'এসব ঢিবি কতটা বড়?' জানতে চাইল সোহেল। 'ভিডিয়ো থেকে কিছুই বোঝা যায় না।'

'সোনার ডেটা অনুযায়ী, একেকটা প্রায় বিশতলা বাড়ির সমান উঁচু,' বললেন কার্ক। 'অন্যগুলোও মোটামুটি এমনই।'

'কী পরিমাণ পানি বেরোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওগুলোর কারণেই কি সাগরের উচ্চতা এত দ্রুত বাড়ছে?'

'ক্যামেরার সবচেয়ে কাছের গিযার থেকে যে গতি তুলে বেরোচ্ছে পানি, তাতে প্রতি মিনিটে উঠে আসছে পাঁচ লক্ষ কিউবিক ফিট। বর্ষার সময়ে একদিনে নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে যে পরিমাণ পানি ঝরে, ধরে নিতে পারেন, এরকম দশটা ঢিবি থেকে বেরোচ্ছে সে পরিমাণের পানি।'

'আছে কতগুলো?' জানতে চাইল সোহেল।

'জানা নেই,' বললেন কার্ক, 'আসিফ আর তানিয়ার পাঠানো ভিডিয়োতে দেখা গেছে অন্তত চল্লিশটা ঢিবি। তবে এডিট করা হয়েছে রেকর্ডিং। আরও লম্বা ছিল ভিডিয়ো।'

'সবাই যাতে বুঝতে পারে, সেজন্যে সংক্ষিপ্ত ডেটা আর ভিডিয়ো দিয়েছে ওরা,' মন্তব্য করল সোহেল।

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন কার্ক, 'স্যাটেলাইট ডেটা থেকে মনে হচ্ছে, পুব চিনের সাগর থেকে বেরোচ্ছে জোরাল স্রোত। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ স্রোত। আগে তাইওয়ান আর ওকিনাওয়ার মাঝে যে উত্তরমুখী স্রোত ছিল, সেটা পুব দিকে সরে চলে গেছে দক্ষিণে। ফলে পাল্টে যাচ্ছে আবহাওয়ার প্যাটার্ন, সাধারণ দিন হচ্ছে কুয়াশাভরা। চিনের শুকনো কিছু এলাকায় শীতের আগেই আসছে একের পর এক

তুষার ঝড়।

'শক্তিশালী ওই স্রোত উত্তরদিকে যাচ্ছে বলে বেয়ারিং স্ট্রেইট পর্যন্ত সাগরে কমে যাচ্ছে পানির লবণাক্ততা, ফলে বদলে যাচ্ছে তাপমাত্রা। জাপান সাগর এতই পাল্টে যেতে শুরু করেছে যে, আগামী কয়েক মাসে ওটা হয়ে উঠবে মিষ্টি পানির বড় একটা লেক।'

'এত পানি উঠছে এসব ঢিবি থেকে?' বিস্মিত হয়েছে রানা।

'আমাদের তা-ই ধারণা,' বললেন কার্ক। 'তবে হঠাৎ কেন এভাবে উঠে আসছে, তার কোনও ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই। কীভাবে পানির উঠে আসা ঠেকানো যাবে, তা-ও জানি না। শুধু জানি, চিনের পুব সাগরে কী যেন করেছে ওরা। ফলে...' চুপ হয়ে গেলেন কার্ক। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'আপনাদের কাজ কতটা এগোল, মিস্টার রানা?'

লো হুয়াং লিটনের সঙ্গে দেখা করেছে, জানাল রানা। তাতে লাভ হয়নি। 'লোকটার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই কারও হাতে। যতটুকু যা শুনেছি, সেসব এসেছে এক মাঝারি মাপের ইয়াকুযা অপরাধী নেতার কাছ থেকে।'

'একটু আগে জরুরি তথ্য দিয়েছেন আপনি,' বললেন কার্ক, 'লো হুয়াং লিটনের কোম্পানি তৈরি করে নানান ধরনের রোবট।'

'তা-ই জেনেছি,' বলল রানা, 'ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি।'

'এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি আসিফ আর তানিয়ার তোলা ভিডিয়োর স্টিল ছবি, বুঝতে পারবেন ওগুলো কী ধরনের,' জানালেন কার্ক।

কমপিউটার স্ক্রিনের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। তিন সেকেণ্ড পর এল লিঙ্ক। ওটার ওপর ক্লিক করতেই দেখা গেল সাদা-কালো ছবি। ওখানে রয়েছে সাদা একটা রোবটিক

বাহু, কাঁধ আর মুখ।

'কী বুঝলেন, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, সোহেলের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর যমজ বোন,' মন্তব্য করল রানা।

'তলিয়ে গেছে সাগরে,' বললেন কার্ক, 'ওটা ভূমিকম্প এলাকা। একটা ক্যানিয়নের নিচে।'

'পানির নিচে কী করছে আমার শালী?' জানতে চাইল সোহেল।

'ডিপওঅটার মাইনিং,' বললেন কার্ক, 'কিন্তু বড় কোনও বিপর্যয়ের ফলে ধসে পড়ে চিনাদের তৈরি সব ফ্যাসিলিটি। দুমড়ে গেছে সব টিনের বাক্সের মত।'

'কী খুঁজছিল ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না। তবে ওটা বোধহয় খুব দামি। নইলে এত খরচ করত না। পানির নিচে খনি থেকে কিছু তুলতে গেলে খরচ পড়বে পঞ্চাশ থেকে এক শ' গুণ। অর্থাৎ, ওরা যদি প্ল্যাটিনাম বা সোনাও তুলত, বেশি খরচের কথা ভেবে বন্ধ করত খনিতে কাজ।'

'অর্থাৎ, সোনার চেয়েও দামি কিছু,' বলল সোহেল।

'আমাদের জিয়োলজি ডিপার্টমেন্ট খুঁজে দেখছে, কী ধাতুর জন্যে এত গভীর সাগরে মাইনিং হলো,' বললেন কার্ক। 'আপাতত কোনও জবাব দিতে পারছে না ওরা।'

'খনি বন্ধ করে দিয়েছে চিনারা,' বলল সোহেল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে জায়গাটা পরিত্যক্ত।'

'আপাতত তাই,' স্বীকার করলেন কার্ক, 'ভিডিয়োতে আমরা দেখেছি, পরে আর ফ্যাসিলিটি চালু করা হয়নি।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। কী যেন অস্বাভাবিক লাগছে ওর। সেটা কী, বুঝতে পারছে না। হিনার দিকে তাকাল। 'কবে প্রথম যি-ওয়েভ আর ভূমিকম্প টের পেলেন ডক্টর শিমেযু?'

'প্রায় একবছর আগে,' রানার জানা কথাটাই বলল হিনা।

কার্কের দিকে মনোযোগ দিল রানা। 'কার্ক, আপনার ইন্টারনেটের গতি বেশি। আমাদের জন্যে একটা কাজ করুন, একটু খোঁজ নিয়ে জানান এনসিআর প্রথম কবে ইনকর্পোরেটেড হয়েছে।'

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন কার্ক, 'পার্টনারশিপ ঘোষণা করা হয় আজ থেকে এগারো মাস আগে।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'আর কবে থেকে হঠাৎ করে জাপানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল চিন?'

'এগারো মাস আগে,' একমিনিট পর বললেন কার্ক। 'ওই একই দিনে এনসিআর ইনকর্পোরেটেড হয়।'

এর কোনও ব্যাখ্যা নেই রানার কাছে। তবে বুঝতে পারছে, গোপন কিছু আছে গোটা ব্যাপারটার ভেতর। 'চিন সরকার নিজেদের এলাকায় খনি থেকে কিছু তুললে, এবং পরে খনি বন্ধ করলে, এত গোপনীয়তা বজায় রাখত না। মনে হচ্ছে, যে ধরনেরই হোক সেই ধাতু, সেটা পাওয়ার জন্যে মরিয়া তারা। সাগরতল থেকে নতুন "ওর" না পেয়ে এখন খুঁজছে জাপানের দ্বীপে। নইলে খুন হতেন না শিমেযু এবং তাঁর অনুসারীরা।'

'অসম্ভব নয়,' বললেন কার্ক।

'এ নাটকে উপস্থিত বেশ কয়েকটা পক্ষ,' বলল রানা। 'লো হুয়াং লিটন আর তার রোবট। চাইনিয কূটনীতিকরা। পারস্পরিক শান্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠা চিন-জাপান। এবং তা হচ্ছে চিনের আগ্রহে। অথচ, গত কয়েক দশক ধরে তারা বলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অপরাধের জন্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে জাপানকে।'

'তুই আসলে কী ভাবছিস?' জানতে চাইল সোহেল।

'চিনের ওই ক্যানিয়নে যে ধাতু ছিল, ওটা ফুরিয়ে গেছে,

তাই চিনের কর্মকর্তারা ভাবছে ওই একই জিনিস পাবে জাপানের উপকূলে,' বলল রানা। 'লো হুয়াং লিটনকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। বন্ধুত্বের আড়ালে আছে অন্যকিছু। এনসিআরকে ব্যবহার করে ওই ধাতু খুঁজছে তারা।'

'জিনিসটা কী হতে পারে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা।

'আপনার থিয়োরি জানিয়ে দেব জিয়োলজি টিমকে,' বললেন কার্ক। 'নতুন কোনও সম্ভাবনা বেরোতে পারে। তবে আমাদের প্রথম কাজ, যেভাবে হোক আসিফ ও তানিয়াকে চিন থেকে সরিয়ে আনা। দ্বিতীয় কাজ, জানতে হবে কী করেছে চিন সরকার। তৃতীয় কাজ, বন্ধ করতে হবে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা ওই পানির স্রোত। কিন্তু কীভাবে এসব করব, আমাদের জানা নেই।'

'প্রথমে ধরতে হবে লো হুয়াং লিটনকে,' বলল রানা। 'ওর পেট থেকে বেরোবে অনেক কিছুই।'

'নিশ্চয়ই নিজের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল আছে তার,' বললেন কার্ক। 'কঠিন হবে তাকে বাগে পাওয়া।'

'ভাবছি, হানা দেব তার ফ্যাক্টরিতে,' বলল রানা, 'প্রয়োজনে কিডন্যাপ করব তাকে।'

'এসব কিছুই করতে হবে না,' বলল হিনা। এইমাত্র আবার ঢুকেছে ঘরে। হাতে রানার নতুন মোবাইল ফোন। সিম কার্ড তুলতে হয়েছে ওটার জন্যে।

স্ক্রিনে দপ-দপ করে জ্বলছে একটা টেক্সট মেসেজ।

'এইমাত্র এল,' বলল হিনা, 'আপনাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে লো হুয়াং লিটন।'

ছত্রিশ

জোসেফ কার্কের ফোন রাখার পর প্রথমেই বলল সোহেল, ‘বুঝতেই পারছিস, এটা ফাঁদ।’

মোবাইল ফোন হাতে নিল রানা। ‘ভাল লক্ষণ। যা ভেবেছি, তার চেয়ে বেশি ঝাঁকি খেয়েছে লোকটা। ঝুঁকি থাকলেও এবার সুযোগ পাব তার ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখার।’

‘এমন কিছু দেখাবে না, যেটা তোর সন্দেহ বাড়াবে,’ বলল সোহেল। ‘আর একবার তোকে নিজের এলাকায় পাওয়ার পর কী করবে তার ঠিক নেই।’

‘ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার,’ বলল রানা। ‘তা ছাড়া, আজ মিটিং করার জন্যে এত ঘেষ্টানোর পর তার নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়া স্রেফ অন্যায়।’

‘হুঁ, অন্যায়, তবে এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ,’ বলল সোহেল।

‘আমাকে নিয়ে তোর এত ভয় কীসের?’ চোখ টিপে হাসল রানা।

‘এরপর তুই বলবি আমার বোনের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করছি,’ গম্ভীর হয়ে গেছে সোহেল। ‘কিন্তু সত্যিই, তুই ওখানে যাবি ভাবতেই কেমন কু ডাকছে আমার মন।’

‘প্রথম সুযোগে আপনাকে খুন করবে,’ নিজের মতামত জানাল হিনা।

মাথা নাড়ল রানা। ‘আমার তা মনে হয় না। কাকে কী

বলে ওখানে গেছি, তার ঠিক আছে? নিজের এলাকায় ডেকে খুন করলে অনেক ঝুঁকি নিতে হবে তাকে। সেটা করবে না সে। আমার ধারণা, চাপা হুমকি দেবে। ঘাবড়ে গিয়ে থাকলে মুখ বন্ধ করাবার জন্যে ঘুষও দিতে চাইতে পারে।'

'দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারেন আপনি,' বলল হিনা।

'সম্ভাবনা তো আছেই,' বলল রানা। 'তাই ব্যাক স্টেজে থাকবে সোহেল। বিপদ দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

'পাগল হলি?' মাথা নাড়ল সোহেল। 'আমি তোকে জেনেবুঝে ফাঁদে পা দিতে দেব না।'

'ঝামেলায় পড়লে তুই তো আছিসই,' বলল রানা। 'ফ্যাক্টরির ওদিকে আছে টিলা। ওখান থেকে নিচের সবই দেখা যায়। ফ্যাক্টরির ভেতরের দিক দেখবি না, তবে তোকে জানিয়ে দেব বিপদ হলে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবি।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল সোহেল। 'ও, তুই মৌজ মারবি, আর আমি শালা বাইরে পাহারাদার কুকুর?'

'আমারও যাওয়া উচিত,' বলল হিনা। 'আমার দায়িত্ব ছিল পরম গুরু শিমেযুকে নিরাপত্তা দেয়া। এখন মনে হচ্ছে আপনার ব্যাপারেও আমার দায়িত্ব আছে, মিস্টার রানা।'

মৃদু হাসল রানা। 'কথাটা বলেছ তাই কৃতজ্ঞ বোধ করছি, হিনা। অনেক ধন্যবাদ। তবে এবারের কাজটা একাই করতে চাই।'

'আপনি চিনা বা জাপানি ভাষা জানেন? ওরা যদি নিজেরা আলাপ করে, বুঝবেন কিছু? আপনি তো কিছুই বুঝবেন না। ফিসফিস করে বলছে কীভাবে খুন করবে আপনাকে, অথচ কিছুই জানলেন না। হতে পারে না?'

চুপ করে থাকল রানা। হিনাকে জানাল না, জাপানি বা চিনা ভাষা ভালই জানে ও।

'হিনা ঠিকই বলেছে, যাক তোর সঙ্গে,' বলল সোহেল। 'একজনের চেয়ে দু'জনের বুদ্ধি বেশি।'

‘তা ছাড়া, বেশিরভাগ লোকের মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিতে পারব,’ বলল হিনা। ‘সে সুযোগে অন্যদিকে মন দিতে পারবেন। আর লড়তে হলেও দেখবেন খারাপ করি না আমি।’

‘রাজি হয়ে যা, রানা,’ অনুনয়ের সুরে বলল সোহেল, ‘লক্ষ্মী, দুলাভাই আমার!’

মাথা দোলাল রানা। ‘ঠিক আছে, আমি রাজি। এবার কিনতে হবে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত পোশাক।’

কিছুক্ষণ পর নাগাসাকির ডিযাইনার শপে গিয়ে হিনা আর নিজের জন্যে অভিজাত পোশাক কিনল রানা। ধসিয়ে দিল নুমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্তত সাড়ে তিন হাজার ডলার।

এখন ওর পরনে ডাবল ব্রেস্টেড ডিনার জ্যাকেট ও ফ্রেঞ্চ কাফওয়ালা ঘিয়ে শার্ট। হিনাকে দেবীর মত দেখাচ্ছে দু’কাঁধ খোলা চকচকে ধূসর ড্রেসে। বুকে এমব্রয়ডারিটা রঙিন ফুলের। কবজি ছাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি নেমেছে হাতা।

‘জীবনেও এমন সুন্দর পোশাক পরিনি,’ বলল মেয়েটা।

‘দারুণ লাগছে তোমাকে,’ প্রশংসা করল রানা।

‘দেখতে দারুণ হলে হবে কী, আরামদায়ক নয়,’ মাথা নাড়ল হিনা।

টিলার ওপরে স্কাইলাইন জিটি-আর নিয়ে অপেক্ষা করছে সোহেল। নিজেরা ভাড়া করা এক সেডান নিয়ে ফ্যাসিলিটির জমিতে পৌঁছুল রানা ও হিনা। ফ্যাক্টরির মেইন গেট থেকে সত্তর ফুট দূরে শক্তিশালী এক বৈদ্যুতিক আলোর নিচে গাড়ি রাখল রানা। দর্শকরা বিদায় নেয়ায় এখন খাঁ-খাঁ করছে পরিত্যক্ত পার্কিং লট।

গাড়ি থেকে নামার আগে পার্স থেকে কার্বন ফাইবারের সরু ছোরা নিল হিনা। ওটা দেখতে লেটার ওপেনারের মত হলেও একদিক খাঁজ কাটা। হিনার ডান কবজির হাতার ভেতর গেল ছোরা। নিচু গলায় বলল মেয়েটা, ‘আমি প্রস্তুত থাকতে

ভালবাসি। আপনিও ভাল করবেন সঙ্গে অস্ত্র রাখলে।'

বুক পকেট থেকে ধাতব কলম নিয়ে দেখাল রানা। 'আমার সবসময় মনে হয়, তলোয়ারের চেয়ে কলম অনেক বেশি শক্তিশালী।'

'ভুল জানেন,' বলল হিনা।

'আমার শুধু মুচড়ে দিতে হবে ওপরের ক্যাপ, তাতেই সোহেল শুনবে আমাদের সবার কথা।'

'আপনাদের সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গোপন যন্ত্রপাতি?'

'না, তোমার পোশাক যখন অল্টার হচ্ছিল, সে সুযোগে একটু দূরের এক ইলেকট্রনিক্স দোকান থেকে কিনেছি এটা। দুই হাজার ইয়েন। বিশ ডলারেরও কম।'

কলমের ক্যাপ মুচড়ে দিল রানা। 'পৌঁছে গেছি, সোহেল। শুনছিস আমার কথা?'

সোহেলের জবাব এল গাড়ির স্পিকারের মাধ্যমে। 'পরিষ্কার দেখছি তোদেরকে। তোরা ভেতরে গেলে গাড়ির ওপর চোখ রাখব। আমাকে একা ফেলে বেশি ফুর্তি করতে যাস্নে।'

'আপ্রাণ চেষ্টা করব,' বলল রানা।

কলমের ক্যাপ ঠিক করে নেয়ায় কেটে গেল সংযোগ। গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করে মেইন গেটের কাছে পৌঁছুল রানা ও হিনা। জালের মত গেটের ওদিকে এক গার্ড, কবাট খুলে ওদেরকে নিয়ে গেল ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙে। ইন্টারকমে খবর দিতেই হাজির হলো স্বয়ং লো হুয়াং লিটন।

'খুব খুশি হলাম সময় দিয়েছেন বলে,' বলল রানা। 'ও হিনা, নুমার জাপানিস লিয়েইযন অফিসার।'

মাথা নিচু করে বাউ করল লো হুয়াং। কয়েক সেকেণ্ড সুন্দরী মেয়েটার ওপর চোখ থাকল তার, তারপর সহকারীর সঙ্গে রানা ও হিনাকে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমাদের চিফ

ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলা।'

ছাতের নিয়ন বাতির উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে সাবা সাবেলার শেভ করা ন্যাড়া মাথা। পরনে সাধারণ কালো প্যান্ট ও সাদা শার্ট। একের পর এক সবুজ আইকন ভেসে উঠছে চোখের চশমার কাঁচে। ডাঁটি থেকে তার গেছে কানের ইয়ারবাডে। কোমরের বেল্টে ভারী পাওয়ার প্যাক। রানা বুঝল, ওই চশমা আসলে কমপিউটার। ডিসপ্লেতে দেখছে আইকন। গলায় মেডেলের মত ভারী ব্যাজ। দু'পাশে বাটন। টিপটিপ করে জ্বলছে দুটো এলইডি বাতি, বোধহয় মাইক্রোফোন ও স্পিকারের। বুক পকেটে কলম, ফ্ল্যাশলাইট ও লেযার পয়েন্টার। বাহুর ওপরে আরেকটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। রানা নিশ্চিত হতে পারল না, ওটা ফিটনেস মনিটর কি না।

সাবা সাবেলার দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হিনা, রানার মনে হলো মেয়েটা দেখছে ভয়ঙ্কর প্লেগের জীবাণু। ফিসফিস করে বলল হিনা, 'এ তো হয়ে গেছে পুরো অ্যাণ্ড্রয়েড!'

'মানবীয় আকর্ষণ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির চেয়ে বেশি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'যে দৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, দ্বিধা করবে না একটা চুমুর বিনিময়ে সব ডিভাইস পুকুরে বিসর্জন দিতে।'

এ কথা শুনে সাবা সাবেলার প্রতি আবছা আগ্রহ দেখাল হিনা। সুযোগ পেলে নাকে দড়ি দিয়ে লোকটাকে ঘোরাবে।

টুকটাক আলাপ করছে সবাই। কিছুক্ষণ পর লো হুয়াং লিটন বলল, 'ডিনার দেয়া হবে আমাদের এগযিকিউটিভ ডাইনিং রুমে। তবে আমার মনে হয়েছে, আপনারা আগে হয়তো ঘুরে দেখতে চাইবেন ফ্যাক্টরি।'

'খুব খুশি হব,' বলল রানা।

পথ দেখাল লো হুয়াং। বিশাল ফ্যাক্টরির প্রথম তলায় এখন কোনও কর্মী নেই। অথচ, নানান কাজ করছে ডযন

দেড়েক মেশিন। ফ্যাসিলিটির এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পার্টস্ সরিয়ে নিচ্ছে কোনও কোনওটা। অন্যগুলো ব্যস্ত প্রোডাকশন লাইনের কমপোনেন্ট ঝালাই দিতে।

'আসলে কী তৈরি হয় এই ফ্যাক্টরিতে?' জানতে চাইল রানা।

'বহু ফ্যাক্টরির জন্যে তৈরি করা হচ্ছে রোবটিক্স।'

'তার মানে মেশিনগুলো তৈরি করছে আরও মেশিন,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল হুয়াং, 'ডিযাইন বা প্রোডাকশনের কাজটা এখনও করে মানব-কর্মীরা। তবে একটা সময় আসবে, যখন সব কাজই করবে রোবট।'

'মানব-কর্মী?' কথাটা ধরেছে হিনা। 'তা হলে কি আপনারা ঠিক করেছেন এরপর কাজে নেবেন রোবট কর্মী?'

'কথার কথা বলেছি,' বলল লো হুয়াং, 'একসময় সত্যিকার অর্থে মানুষকে সব ঝামেলা থেকে মুক্ত করবে রোবট। বিপজ্জনক বা কঠিন কাজ করতে হবে না আর মানুষকে। ধরুন, প্রতিদিন শত শত স্ক্রুর প্যাঁচ কষছে এক লোক, তার জীবন হয়েছে অর্থহীন। অথবা, প্রায় অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রতিদিন দশঘণ্টা বাটালি চালাচ্ছে একজন। অথচ ওখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি। যখন তখন হতে পারে ভয়ানক দুর্ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে বিপদ ছাড়াই কাজ করবে আমাদের মেশিন। বা ধরুন, অপরাধীদেরকে ধরতে হবে, যখন তখন গুলি খেয়ে মরে যেতে পারে পুলিশ অফিসার বা সৈনিকরা, এসব সময়ে সত্যিকারের কাজে আসবে রোবট পুলিশ বা সোলজার।'

'রোবটিক সৈন্য?' জানতে চাইল রানা।

'ক্ষতি কী?' হাসল লো হুয়াং লিটন।

'দেখাতে পারবেন?'

রানা আর হিনাকে নিয়ে ফ্যাক্টরির প্রথম কক্ষ থেকে

বেরিয়ে আরও বড় এক ঘরে ঢুকল লো হুয়াং। তার সঙ্গে রয়ে গেছে সাবা সাবেলা। এ কামরা অনেকটা কনভেনশন হলের মত। একপাশে কংক্রিটের উঁচু সেতু গেছে ঘরের দূরে। ওটার ওপর থেকে দেখা যাবে টেস্টিং এরিয়া।

চারপাশে হাই-টেক সব ইকুইপমেন্ট। নানাদিকে জ্বলছে কমপিউটার স্ক্রিন। বড়-ছোট অনেক ধরনের মেশিন, বিভিন্ন কাজ করছে যে যার মত।

ওরা সবাই সেতুর ওপর ওঠার পর বলল লো হুয়াং, 'শুরু করুন ডেমনস্ট্রেশন।'

বাহুর ডিভাইসের স্ক্রিনে কী যেন টিপল সাবা সাবেলা। ছাতে জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট। পরিষ্কার দেখা গেল নিচের চারপাশ। এখানে ওখানে কয়েকটা ম্যানিকিন। কয়েকটা আছে আড়ালে। দু'দলের মাঝে আছে এক লোক। 'সাধারণ জিম্মি পরিস্থিতি,' বলল হুয়াং। 'আট টেরোরিস্ট, সাত জিম্মি।'

হঠাৎ রেসিং ট্র্যাক থেকে ধুম্ আওয়াজ তুলে একটা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল ছোট এক ব্যাটারিং র‍্যাম মেশিন। পেছনে বেশ কয়েকটা যন্ত্র। ওগুলো দেরি না করে গুলি করল নানাদিকে দাঁড়িয়ে থাকা টেরোরিস্ট ম্যানিকিনের দিকে। আর্মার প্লেটিঙে গুলি লাগতেই ছিটকে উঠল কমলা ফুলকি।

'লাইভ অ্যামো?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল লো হুয়াং। 'তবে আপাতত রয়েছে কম বারুদ। চাই না গুলি ছিটকে কাউকে আহত করুক।'

'নিচে আপনার যে লোক, সে কি নিরাপদ?' জানতে চাইল রানা। 'তার দিকে গুলি করবে না ওসব মেশিন?'

'না, ওর গলায় ঝুলছে আইডেন্টিফায়ার,' বলল লো হুয়াং। 'রোবটকে জানিয়ে দিচ্ছে, গুলি করা চলবে না তাকে। ওই একই জিনিস ব্যবহার হবে মানুষ ও রোবটের মিলিত অ্যাসল্টের সময়। এতে গুলি করে মানুষ মারার ঝুঁকি কমেছে

পঁচানব্বুই পার্সেন্ট।'

'প্রশংসা না করে পারছি না,' বলল রানা।

ব্যাটারিং র‍্যামের পেছনে ঢুকেছে আরও কয়েকটা রোবট। নিচের অংশে চাকার বদলে ছয়টা পা। দালানের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে মাকড়সা রোবট। অনায়াসে টপকে যাচ্ছে উঁচু বাধা। কয়েক পশলা গুলি করে খতম করল টেরোরিস্টদেরকে।

'ওরা হিট সেন্সর, সাউণ্ড ওয়েভ আর ক্যামেরার মাধ্যমে খুঁজে বের করছে টার্গেট,' বলল লো হুয়াং। 'একইভাবে যোগাযোগ রাখছে পরস্পরের সঙ্গে। একটা যদি কিছু জানতে পারে, জেনে যাচ্ছে অন্যরা।'

হঠাৎ থেমে গেল প্রতিটি মেশিন। স্ক্যান করছে পরের ঘরের থার্মাল আউটপুট। এক সেকেণ্ড পর ছয় পায়ে ভর করে ঢুকল ওদিকের ঘরে। পরমুহূর্তে এল গুলির আওয়াজ।

'সহজ, তাই না?' হাসল লো হুয়াং। 'মারা গেছে টেরোরিস্টরা, নিরাপদ রয়ে গেছে জিম্মিরা। কারও গায়ে গুলি লাগেনি।'

মনে মনে প্রশংসা করল রানা। মুখে বলল, 'টেরোরিস্ট আর হোস্টেজদের ভেতর তফাৎ করছে কী করে?'

'আমরা ওটাকে বলি ডিসক্রিমিনেটর ফাঙ্কশন,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'ক্যাপটিভদের ফেশাল রেকগনিশন প্যাটার্ন, হিট সেন্সর ও ওয়েপন রেকগনিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোবটের প্রোসেসর জেনে যাচ্ছে, কোন্ লোকের কাছে অস্ত্র আছে, আর কার কাছে নেই।'

'প্রশংসনীয়।'

'তা ছাড়া, রোবটের গায়ে গুলি লাগলে সময় লাগে না মেরামত করতে।'

ওদের পাশের টার্মিনাল থেকে চিনা ভাষায় বেরিয়ে এল প্রিন্টেড ব্যাটল রিপোর্ট। ওটা পড়ে নিয়ে ব্যাখ্যা দিল লো

হুয়াং, ‘এসব রোবট খরচ করেছে মোট বাইশটা গুলি। সামান্য ক্ষতি হয়েছে দুটো রোবটের। পুলিশ বা সৈনিকের দল লড়লে মরত তাদের কয়েকজন, আহত হতো জিম্মিরা। এ থেকে আশা করি বুঝছেন, ভবিষ্যতে খারাপ পরিস্থিতি দেখা দিলে ব্যবহার করা উচিত হবে রোবট টিম।’

‘তবে টেরোরিস্টদের শক্ত ঘাঁটি দখলের সময় এভাবে সহজেই কাজটা করা যাবে না,’ মন্তব্য করল রানা।

‘ভুল ভাবছেন,’ বলল লো হুয়াং। ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক মিশনে সৈনিক না পাঠিয়ে ব্যবহার করা হবে ওঅর-বট। তারা দখল করবে যে-কোনও দুর্গ।’

‘ওঅর-বট?’ জানতে চাইল রানা।

‘চমৎকার নাম, তাই না?’

‘এটা ছিল পুলিশী রেসকিউ মিশন, তাই না?’

‘জী,’ গর্বের সঙ্গে মাথা দোলাল লো হুয়াং। ‘কিন্তু আমরা তৈরি করছি আর্মি মেশিন। দুনিয়ার যে-কোনও বিপজ্জনক এলাকা দখল করবে ওই রোবট। ওগুলো আরও শক্তপোক্ত, আধুনিক আর ভয়ঙ্কর। প্রয়োজন হলে লড়বে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। এভাবে যুদ্ধ করতে পারবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তাদের ঘুম লাগবে না, খাবার লাগবে না, মেডিকেল চিকিৎসা লাগবে না। আমরা মানুষ খুনের মাত্রা কমিয়ে দেব। যুদ্ধের সময় এলাকার ক্ষতিও হবে কম। আহত হবে না মানব সৈনিক। যুদ্ধের পরের ট্রমা নিয়েও চিন্তা নেই। তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভুগতে হবে না।’

‘তবে শত্রুপক্ষের পরিণতি ভয়ঙ্কর, তাই না?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমাদের তা মনে হয় না,’ বলল বিলিয়নেয়ার, ‘রোবট যে শুধু নিখুঁত তাই নয়, গুলিও করবে অনেক হিসেব কষে। মানবিকতাও দেয়া হবে ওদেরকে। ওরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না। সহ রোবট বিকল হলে রেগে গিয়ে অত্যাচার করবে না

বন্দিদের ওপর। লড়াইয়ের ভয়াবহতা দেখে পাগল হয়ে যা খুশি তা করবে না। রেপ করবে না রোবট। নির্যাতন করবে না কাউকে। চুরি-ডাকাতির চিন্তাই থাকবে না ওদের প্রসেসরে। বলতে পারেন, যুদ্ধ হবে বীভৎসতা ছাড়াই।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। বিলিয়নেয়ার যেসব কথা বলেছে, তার বিপক্ষের যুক্তিও শুনেছে ও। অনেকের ধারণা, একসময়ে আর নিয়ন্ত্রণে থাকবে না বুদ্ধিমান রোবট। পুরো পৃথিবী হবে সত্যিকারের নরক। আসলে কী হবে তা নতুন পরিস্থিতিতে না পড়লে বোঝার উপায় নেই।

লো হুয়াঙের অনুরোধে একটু সরে সেতু থেকে নিচে তাকাল সবাই। মেঝেতে কিছু মেশিন তৈরি করছে হাইওয়ের অংশ। জ্যাকহ্যামার চালিয়ে কংক্রিট ভাঙছে এক মেশিন। আরেক মেশিন সেসব জঞ্জাল তুলছে ড্রাইভারহীন ট্রাকে। পেছনে জঞ্জাল ভরে যেতেই কোনও দিকে গুঁতো না দিয়ে দূরের এক দরজা পেরিয়ে চলে গেল ট্রাক।

'রোবটিক আর্মি আসতে অন্তত এক যুগ বাকি,' বলল লো হুয়াং। 'তবে সেলফ ড্রাইভিং ভেহিকেল কিন্তু আজই পেতে পারেন।'

'দেখেছি কিছু,' বলল রানা।

'খুব একটা দেখেননি,' বলল বিলিয়নেয়ার। 'তবে কিছু দিন পর দেখবেন ওগুলো ছাড়া আর কোনও গাড়িই নেই। এনসিআর এরই ভেতর তৈরি করেছে ড্রাইভারহীন রেস কার। দুনিয়া-সেরা রেসারদেরকে হারিয়ে দেবে হাসতে হাসতে।'

'রিমোট গাইডেড?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল লো হুয়াং। 'স্বয়ংক্রিয় ভেহিকেল। কারও সাহায্য লাগবে না। প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেবে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি ব্যবহার করে।'

'শহরের রাস্তায় চলা এককথা, আর হাই স্পিডে গাড়ির ক্ষমতা বুঝে রেসের ট্র্যাকে চলা অন্য কিছু,' বলল রানা।

'আমি নিজেও দু'একবার রেস করেছি। কাজটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক।'

ঠাট্টার হাসি হাসল লো হুয়াং। 'অবশ্যই তাই। তবে আপনি যখন ফুড চেইনের ওপরে থাকার জন্যে লড়ছেন, সেসময়ে যে-কোনও মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ক'দিন পর দেখবেন ওরা অনায়াসে চালাচ্ছে ফাইটার জেট বিমান বা জাহাজ। এ ছাড়া, সাগরতল থেকে তুলবে তলিয়ে যাওয়া জাহাজ বা বোট। আর ট্র্যাকে রেসে জিতে যাওয়া? ওটা তো এখনই পারে রোবটিক রেস কার। যে-কোনও মানুষের চেয়ে অনেক ভালভাবে চালাবে ওরা।'

চুপচাপ শুনছিল রানা, কিন্তু বুঝে গেল, বিলিয়নেয়ারের কথায় খোঁচা আছে। এতক্ষণ বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল লোকটা, তবে মেশিনের কথা ওঠার পর সামান্য ফুলে গেছে নাকের পাটা। একটু ফাঁক করে রেখেছে দুই পা। চোখে বিপ্লবী দৃষ্টি। রানা বুঝে গেল, কীভাবে পাল্টা খোঁচা দিতে হবে লোকটাকে।

'আজ থেকে হাজার বছর পর, সত্যিই হয়তো একদিন রোবট হবে মানুষের সমকক্ষ,' নিজেও ঠাট্টার সুরে বলল রানা। 'তবে এ জীবনে দেখব না, রেসের ট্র্যাকে মানুষকে হারিয়ে দিয়েছে কোনও রোবট। মেশিন অনেক কিছুই পারে, কিন্তু কখনোই থাকে না তার বিবেক বা বিবেচনা।'

গম্ভীর চেহারায় ওকে দেখল লো হুয়াং। কয়েক সেকেণ্ড পর মুচকি হাসল। 'সাহস থাকলে প্রমাণ করুন আপনার থিয়োরি।'

'খুশি মনে,' বলল রানা, 'সেজন্যে কী করতে হবে আমাকে?'

'এ ফ্যাক্টরির গ্রাউণ্ডে আছে রেসিং ট্র্যাক,' বলল হুয়াং, 'গ্যারাজে আছে প্রোটোটাইপ রোবট রেস কার। পাশেই দুটো রেসিং কার। ওগুলো রাখা হয়েছে রেসিং ড্রাইভারদের জন্যে।

চাইলে রোবট রেসিং কারের বিরুদ্ধে নামতে পারেন। আশা করি দেখার মত হবে রেস। বড় অঙ্কের বাজি ধরতেও আপত্তি নেই আমার।'

'আমি রাজি,' দ্বিধাহীনভাবে বলল রানা। 'তবে আপনি বিলিয়নেয়ার, আর আমি বাংলাদেশের আধাসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, কাজেই বড় অঙ্কের বাজি ধরতে পারব না। টাকা নয়, অন্য কিছু নিয়ে বাজি ধরতে পারি।'

'আপনি যে বলেছিলেন নুমায় আছেন?'

'অনারারি পদে,' বলল রানা।

মাথা দোলাল লো হুয়াং। 'ঠিক আছে, আপনি যদি রেসে জেতেন, এনসিআর থেকে আপনার এক্সপিডিশনের জন্যে প্রতিটি রোবট ভেহিকেল বিনা পয়সায় দেয়া হবে।'

'আর আমি হেরে গেলে?'

'কঠিন কিছু করতে হবে না,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'শুধু স্বীকার করবেন, আসলে মানুষের চেয়ে ঢের কাজের এসব রোবট।'

সাঁইত্রিশ

লো হুয়াং লিটনের গ্যারাজে দ্রুতগতি স্পোর্টকার দেখবে ভেবেছে রানা। সেসব গাড়ি হবে চাকা সর্বস্ব গাড়ি। থাকবে না তাতে বাড়তি ওজন। কিন্তু গ্যারাজে ঢুকে অবাক হলো। পাশাপাশি রাখা তিনটে দারুণ লোভনীয় গাড়ি।

'এগুলো টয়োটা কোম্পানির,' বলল লো হুয়াং, 'তবে

চাইলেও ডিলারের কাছ থেকে কিনতে পারবেন না।'

'অন্তত কয়েক লাখ ডলার একেকটার দাম,' রানার কানের কাছে বলল হিনা।

'গত বছর লে ম্যান্সে নামানো হয় এটা,' ডানের গাড়িটা দেখাল লো হুয়াং। 'টুইন-টার্বোচার্জ্‌ড্‌ ভি সিক্স, নয় শ' আটষট্টি হর্সপাওয়ার। তবে আমাদের ট্র্যাকে রেসের জন্যে হ্রাস করা হয়েছে শক্তি। এখন আছে সাত শ' হর্সপাওয়ার।'

'যথেষ্ট।' কমলা-সাদা গাড়ির পাশে থামল রানা। বুঝে গেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ওটা। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে খেপা চিতা। চোখা নাকে মিশেছে দু'পাশের কার্বন ফাইবার প্যানেলের ফেণ্ডার। নিচে মোটা পারফর্মেন্স টায়ার। গাড়ির মাঝে অশ্রু বিন্দু আকৃতির ককপিট। সামনের ঈষৎ বাঁকা উইণ্ডশিল্ড দেখার মত। পেছনে বিশাল উইং নিয়ে তিনটে খাড়া ফিন। প্রচণ্ড বেগে যাওয়ার সময় স্থির রাখবে গাড়িটাকে। নির্দ্বিধায় বলল রানা, 'অটোমোবাইল সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে, নইলে ভাবতাম এই জিনিস উড়তে পারে।'

'ঘণ্টায় শতখানেক মাইল বেগে অ্যাক্সিডেন্ট হলে সত্যিই উড়াল দেবে,' সতর্ক করল লো হুয়াং লিটন।

'আমি সতর্ক থাকব,' কথা দিল রানা।

আধঘণ্টা পর ড্রাইভারের সিটে বসে সিট বেল্ট আটকে নিল ও। পরনে ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট সুট ও ফাইভ-পয়েন্ট হার্নেস। মাথায় বসিয়ে নিয়েছে হেলমেট।

রেসের জন্যে তৈরি।

ককপিট ছোট ও সরু, আরেকটু বড় হলে ভাল লাগত রানার। চারপাশ থেকে ওকে প্রায় ঘিরে রেখেছে বিলেটেড অ্যালিউমিনিয়াম ও প্যাডেড রোল কেইজ। বামে কয়েকটি টগল সুইচ। চাইলে এদিক ওদিক সরানো যায় স্টিয়ারিং হুইল। অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দেয়ায় টুইন-টার্বো ভি সিক্স ইঞ্জিন থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গাড়িটাকে।

লো হুয়াঙের সহকারী রেডি করছে অটোমেটেড রেস কার। এ সুযোগে নিজের গাড়ির ভেতর দিক দেখল রানা। ফুটওয়েলে পাশাপাশি প্যাডেল। বিশেষ ম্যানুভারের সময় চাপ দিতে পারবে এক পায়েই। তবে দুর্ঘটনাবশত পা রাখতে চায় না ওখানে। হাতের কাছেই প্যাডল শিফটার। সুইচ টিপতেই খোয়া দিয়ে তৈরি ট্র্যাকে গিয়ে পড়ল চারটে শক্তিশালী হেডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলো। পরিষ্কার দেখা গেল রেসের জন্যে কমলা ও সাদা দাগ।

‘ট্র্যাক ভাল করেই চেনে রোবট,’ বলল লো হুয়াং, ‘সুবিধা নিতে চাই না, তাই আপনাকে পাঁচ ল্যাপ দিতে দেব। বুঝে নেবেন কেমন ট্র্যাক। রওনা হন। অভ্যস্ত হয়ে উঠুন গাড়িটার সঙ্গে। গিয়ে আছড়ে পড়বেন না দেয়াল বা নাগাসাকি উপসাগরে। পঞ্চম বাঁক অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে কুখ্যাত। ওপরে উঠে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। যদি বেড়ার ওপর গিয়ে পড়েন, উল্টে পড়বে গাড়ি। মারাও যেতে পারেন।’

গাড়ির ক্যাবে হাত ভরে দুটো সুইচ টিপল লো হুয়াং। ‘এবার টেলিমেট্রি পাবেন। আর এই সুইচটা ন্যাভিগেশন গাইডেন্স অ্যালার্টের।’

‘গাইডেন্স?’ অবাক হয়েছে রানা।

‘আপনার ফোনের মতই, তবে আরও নিখুঁত,’ বলল বিলিয়নেয়ার। ‘আগেই বলে দেবে সামনের বাঁক কতটা তীক্ষ্ণ। যাতে চমকে যেতে না হয়। আপনার মনে হবে পাশে বসে সাহায্য করছে ন্যাভিগেটর।’

‘নতুন গাড়িতে যথেষ্ট বিরক্ত করে এই জিনিস,’ বলল রানা। ‘তবে ট্র্যাকে হয়তো কাজে আসবে।’

পিছিয়ে গেল লো হুয়াং লিটন। সামনে বেড়ে গাড়ির কার্বন ফাইবার ডোর বন্ধ করল এক মেকানিক, পিছিয়ে গিয়ে দেখাল বুড়ো আঙুল। চারপাশ দেখার জন্যে স্বাভাবিক গতি তুলে প্রথম দুটো চক্কর কাটল রানা। প্রতিবার বাঁকের আগেই সতর্ক

করল ন্যাভিগেটর। স্টিয়ারিং হুইল থেকেও এল সঠিক ফিডব্যাক।

তৃতীয় চক্করে গতি তুলল ঘণ্টায় এক শ' বিশ মাইল। সাগরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাগাসাকি উপসাগরে দেখল ভাসমান জাহাজের মিটমিটে আলো। গতি কমিয়ে ঘুরল পঞ্চম বাঁক। বামে ওপরে গেছে রাস্তা। তুমুল বেগে যাওয়ার সময় মনে হবে উড়ে গিয়ে গাড়ি পড়বে সাগরে। চতুর্থ ও পঞ্চম ল্যাপে গতি আরও তুলল রানা। একটু পর ফিরে এসে থামল পিট-এ। সত্যিই এবার তৈরি রেসের জন্যে।

লো হুয়াঙের মেকানিকরা প্রস্তুত রেখেছে হলদে গাড়ি। ওটার তিরিশ ফুট দূরে নিজের গাড়ি রাখল রানা। দুই গাড়ির গায়ে অসংখ্য এনসিআর লোগো। তবে রোবটের গাড়িতে রয়েছে কয়েকটা বাড়তি অ্যান্টেনা।

রাতের পরিবেশ শীতল। তবুও ককপিটে ঘামছে বলে গাড়ির দরজা খুলল রানা। মাথা থেকে নামাল হেলমেট।

ওর পাশে পৌঁছে গেল হিনা। 'আপনি কি আমার হিরো হওয়ার জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিচ্ছেন?'

'তোমার হিরো?' মাথা নাড়ল রানা।

'তা হলে কি টেকনোলজিকে হারাবার জন্যে? প্রমাণ করবেন যে মানুষই সেরা?'

মৃদু হাসল রানা। 'তা নয়। আসলে চাইছি লো হুয়াংকে অস্বস্তিতে ফেলতে। একটু পর থাকব ট্র্যাকে। চারপাশে চোখ রেখো তুমি।'

ঝুঁকে রানার গালে চুমু দিল হিনা। 'সৌভাগ্যের জন্যে।'

এমনসময় গর্জে উঠল রোবটের গাড়ি। আবার রানার পাশে ফিরল লো হুয়াং লিটন। 'আপনি তৈরি তো?'

'হ্যাঁ, তৈরি।'

'গুড, বেশিক্ষণ রেস হবে না, সাগর থেকে আসছে ঝড়,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'আমরা চাই না গাড়িদুটো বৃষ্টিতে

ভিজুক।'

মাথা দোলাল রানা।

'ঘুরে আসুন,' বলল লো হুয়াং, 'ফিনিশিং লাইন পেরোলে ধরে নেয়া হবে প্রথম গাড়ি জিতেছে।'

আবারও হেলমেট পরে স্ট্র্যাপ টাইট করে নিল রানা। দু'গাড়ি দাঁড়াল নিয়মমত ফর্মেশনে। সরু লেনে যাতে সংঘর্ষ না হয় সেজন্যে তিরিশ ফুট সামনে রানার গাড়ি।

লাল বাতি জ্বলে উঠল ট্র্যাকের পাশের পোলে। তিন সেকেণ্ড পর ওই আলো হয়ে উঠল হলদে। তিন সেকেণ্ড পর বাতি হয়ে গেল সবুজ।

ছিটকে রওনা হলো রানার গাড়ি। দ্রুত বাড়ছে বেগ। আগের ল্যাপগুলোর চেয়ে বেশি গতি তুলছে রানা। ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল প্রথম বাঁক।

'ডানদিকে সত্তর ফুট দূরে বাঁক,' ঘোষণা দিল ন্যাভিগেশন সিস্টেম।

কড়া ব্রেক করতেই রানা টের পেল, ট্র্যাক খামচে ধরেছে চাকার রাবার। সামনে ছিটকে যেতে চাইল রানা, তবে নিজ কাজ ঠিকভাবেই করল রেসিং হার্নেসের স্ট্র্যাপ। স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে রানা। পিছলে সরে যাচ্ছে সাদা ও কমলা বর্ডার থেকে। নতুন করে গতি তুলে বামে বাঁক নিল ও।

হঠাৎ এত বেশি গতি তুলল গাড়িটা, সিটে প্রায় গেঁথে গেল রানা। নানান দেশের ফাইটার বিমান চালাবার সময় এ অনুভূতি হয়েছে ওর।

'সামনে সরু বাঁক,' সতর্ক করল ন্যাভিগেটর।

কড়া ব্রেক করতেই ঝট্ করে কমে এল গতি। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বামে বাঁক নিল রানা। ট্র্যাকের সবচেয়ে ধীর অংশ এটা। কিছু দূর যাওয়ার পর আরেকটা বাঁক।

'বামে চল্লিশ ফুট দূরে বাঁক।'

সহজেই চাকা পিছলে যেতে দিয়ে ওই বাঁক পেরিয়ে গেল

রানা, নতুন করে তুলল গতি।

'ডানে ত্রিশ ফুট দূরে বাঁক।'

প্র্যাকটিস ল্যাপের সময় ন্যাভিগেটরকে বিরক্তিকর মনে হয়েছে রানার। মনোযোগ সরে যায় ওটার জন্যে। কিন্তু এখন রিফ্লেক্সের শেষ সীমায় পৌঁছে বুঝল, ওটা কাজের। ঠিক সময়ে সতর্ক করছে যন্ত্রটা। ফলে ওর চোখ থাকছে সামনের বাঁকে। তৈরি থাকছে মন।

বামে চতুর্থ বাঁক নিয়েই গিয়ার ফেলে তুমুল গতি তুলল রানা। সামনে দীর্ঘ ট্র্যাক গেছে টিলার ওপরে। ঝড়ের বেগে খালি অবযার্ভেশন ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও। এরপর সোজা রাস্তা গেছে পঞ্চম বাঁকের দিকে।

'বামে সত্তর ফুট দূরে ওপরে উঠে বাঁক।'

তীব্র ব্রেক কষে বাঁক নিল রানা। রক্ত উঠে এল মাথায়। গরম লাগছে গাল। আগের ল্যাপের মতই এবারও ওর মনে হলো পিছলে চলেছে বেড়ার দিকে। ওটা ছিঁড়ে বেরোলে মাধ্যাকর্ষণের টানে বহু নিচের উপসাগরে পড়বে গাড়ি। বাঁকের ভেতরের দিকে চোখ রেখে বাঁক নিতে চাইছে ও।

ল্যাপের অবশিষ্ট অংশ ঝামেলা ছাড়াই পেরোল। পেছনে পড়ল স্টার্ট/ফিনিশ লাইন। নয় সেকেণ্ড পেছনে পড়েছে রোবট চালিত গাড়ি।

'এক ল্যাপ গেল, বাকি চারটে,' বিড়বিড় করল রানা।

পিট এরিয়ার উঁচু ভিউয়িং স্ট্যাণ্ড থেকে ট্র্যাকে দশ মিলিয়ন ডলারের রোবট চালিত গাড়ি দেখছে লো হুয়াং লিটন। রানার গাড়ির পিছু নিয়ে ছুটছে ওটা। দুই গাড়ি দ্বিতীয় ল্যাপ ঘুরে আসতেই গম্ভীর হলো বিলিয়নেয়ার। এখন দশ সেকেণ্ড এগিয়ে আছে মাসুদ রানা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবেলার দিকে তাকাল লো হুয়াং। 'আপনার গাড়িতে বোধহয় সমস্যা আছে। মাসুদ রানা এখনও

আগে কেন?'

'গাড়িতে সমস্যা নেই,' জবাবে বলল সাবেলা। 'পাঁচ ল্যাপ ছুটে গাড়ির চাকা গরম করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে মাসুদ রানা। আমাদের রেসিং কার ছুটছে ঠাণ্ডা টায়ারে ভর করে। বাঁকে ঘোরার সময় কম গ্রিপ পাচ্ছে চাকা, তাই বাধ্য হয়ে কমপিউটার কমিয়ে দিচ্ছে গতি। তবে তৃতীয় ল্যাপের পর সমান সুযোগ পাব আমরা। চতুর্থ ল্যাপে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে আমাদের গাড়ি। আর রেস শেষ হওয়ার সময় এগিয়ে থাকবে অন্তত বিশ সেকেণ্ড। গো হারা হারবে মাসুদ রানা।'

'আপনার কথা ঠিক হলেই ভাল,' বলল লো হুয়াং। 'আমি বিব্রত হতে পছন্দ করি না। যাতে হারতে না হয়, এখনই অফ করে দিন সেফটি প্রোটোকল।'

কৌতূহলী চোখে বসকে দেখলেও নির্দেশ পালন করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। এবার সেফটি অপারেটিং প্যারামিটার পাত্তা না দিয়ে যে-কোনও মূল্যে জিততে চাইবে রোবটিক কার।

আটত্রিশ

আগের দুটো ল্যাপের মতই তৃতীয় ল্যাপটাও স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে রানার কাছে। কিন্তু চতুর্থ ল্যাপ শুরু হতেই দেখল এগিয়ে আসছে রোবট চালিত গাড়ি। ওটার হেডলাইটের আলো পড়ছে আয়নায়। ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। চারটে হীরা আকৃতির উজ্জ্বল সাদা আলো জানিয়ে দিচ্ছে, শিকারের খুব

কাছে পৌঁছে গেছে শিকারী।

ঘাড়ের কাছে চার আলোর ফলে সমস্যা হচ্ছে রানার। চোখ সরু করল। নিজের গাড়ির হেডলাইট দেখাই কঠিন।

চলছে চতুর্থ ল্যাপ, আরও কাছে চলে এল রোবটিক কার। আরও দ্রুত চলতে গিয়ে ঝুঁকি নিতে হচ্ছে রানাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাঁক ঘোরার সময় চাকা গেল ট্র্যাকের কিনারায়। নিজের ওপর বিরক্ত হলো রানা। ভাবল, একটু বেশি আগে চাপ দিয়েছে অ্যাক্সেলারেটরে। মুহূর্তে পৌঁছে গেল পরের বাঁকে। আরেকটু হলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেত গাড়ি। এদিকে ভুল করছে না আবেগহীন কমপিউটার, রানার গাড়ির সঙ্গে রোবটিক গাড়ির ব্যবধান থাকল মাত্র চার সেকেণ্ডের।

'ডানে ত্রিশ ফুট দূরে বাঁক,' জানিয়ে দিল ন্যাভিগেটর। হেরে যাচ্ছে নাকি! মনটাকে শান্ত রাখতে চাইছে রানা। মসৃণভাবে ঘুরিয়ে নিল স্টিয়ারিং হুইল। তীর বেগে ঘুরল বাঁক। পরক্ষণে রেস বাড়িয়ে গিয়ার ফেলেই ছুটল ক্ষিপ্র চিতার বেগে।

তবুও রোবটিক গাড়ির সঙ্গে কমে আসছে ব্যবধান।

রকেটের বেগে বিপজ্জনক বাঁকের দিকে চলেছে দুই গাড়ি। রানার কমলা-সাদা গাড়ির পেছনের উইং ছুঁই-ছুঁই করছে রোবটিক গাড়ির নাক। এখন আর উজ্জ্বল আলো পড়ছে না রানার চোখে। প্রথম সুযোগে ওকে পেরিয়ে যাবে রোবট। অথচ, কিছুই করার নেই ওর। বিড়বিড় করে বলল, 'পেরোতে হলে আমার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে তোকে।'

'বামে সত্তর ফুট দূরে ওপরে উঠে বাঁক।'

ঝড়ের বেগে আসছে বিপজ্জনক বাঁকা উত্তল পথ। এবার ব্রেক করতে হবে। ট্র্যাকের ভেতরে সরে গতি কমাল রানা।

একই কাজ করল রোবটিক কার। তবে ওটার একটু আগেই ব্রেক করেছে রানা। ওর গাড়ির পেছনে এসে ধুম করে বাড়ি খেল রোবটিক কার।

সামনে হোঁচট খেল রানা। পিছলে ট্র্যাক থেকে সরে যেতে শুরু করেছে গাড়ি। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে নেয়ায় আবারও চাকা কামড়ে ধরল ট্র্যাক। নাক সোজা করেই সঠিক পথে ফিরল রানার গাড়ি।

গুঁতো মেরে পিছিয়ে গেছে রোবটিক গাড়ি। ছুটে এল নতুন উদ্যমে। তবে এবার তুমুল বেগে নয়। নাকে বাড়ি খেয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অ্যারোডাইন্যামিক শেপ। রানার মনে হলো বড় ক্ষতি হয়নি ওর নিজের গাড়ির।

মিসাইলের বেগে পিট ও ভিউয়িং স্ট্যাণ্ড পেরোল রানা। চট্ করে দেখেছে, প্ল্যাটফর্মে ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুয়াং। বিড়বিড় করল ও, 'মানুষ বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাবে, তা ভুল কথা!'

প্ল্যাটফর্মে মুখে ফেনা তুলছে লো হুয়াং। 'আমি আপনাকে পই-পই করে বলে দিয়েছি, রেসে হারলে চলবে না!'

টেলিমেট্রি মনিটর দেখছে সাবা সাবেলা। 'আমার কিছু করার ছিল না। আপনি চেয়েছেন যেন সেফটি অফ করে দেয়া হয়। কাজটা বিপজ্জনক।'

'মাসুদ রানাকে পাশ কাটিয়ে যান, সাবেলা।'

'একটু আগে চেষ্টা করেছে রোবট। তবে আগের ল্যাপের চেয়েও জোরে ছুটছে মাসুদ রানা। যে-কোনও কিছু চট্ করে বুঝে ফেলে।'

'তা হলে তাকে সাহায্য করা বন্ধ করুন,' বলল লো হুয়াং।

'কী করতে বলেন, স্যর?'

'বন্ধ করে দিন ন্যাভিগেশন সিস্টেম।'

'ওই অ্যানাউন্সমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করবে, ফলে সোজা বিধ্বস্ত হবে দেয়ালে,' জানাল সাবা সাবেলা।

'সে বোঝাতে চাইছে ড্রাইভিঙে রোবটকে হারাতে পারে

মানুষ। পারলে নিজে থেকে প্রমাণ করুক!'

বড় করে দম নিল ইঞ্জিনিয়ার। 'ওই লোক কিন্তু খুন হবে, স্যর। বাংলাদেশ আর আমেরিকান সরকার সন্দেহ করবে আপনাকে।'

'সন্দেহ করলেই বা কী? দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই!'

আপত্তির সুরে তর্ক জুড়ল সাবেলা, 'যেইন নিং কিন্তু বলেছেন বাঁচিয়ে রাখতে! তাকে বলির পাঁঠা বানাতে চান তিনি।'

প্রচণ্ড রেগে ইঞ্জিনিয়ারের শার্টের কলার চেপে ধরল বিলিয়নেয়ার। 'যা বলছি করুন! বন্ধ করুন ন্যাভিগেশন সিস্টেম!'

লো হুয়াং ছেড়ে দিতেই ট্র্যাক দেখল লোকটা। সরু পথে চতুর্থ বাঁকের দিকে চলেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড দেরি করল সাবা সাবেলা, তারপর সুইচ টিপে অফ করে দিল রিলে।

রানা জানে, আবারও ওকে পেরোবার চেষ্টা করবে রোবট চালিত গাড়ি, কিন্তু সেক্ষেত্রে হতাশ হয়ে রেস বাদ দেবে না ও। জেদ চেপে গেছে, যেভাবে হোক হারাবে হুয়াংকে।

পরিচিত পাহাড়ি ট্র্যাকে প্রায় উড়ে চলেছে রানা— অধৈর্য এবং আগ্রাসী। তুমুল বেগে বিপজ্জনক বাঁক লক্ষ্য করে চলেছে ওর কমলা-সাদা টয়োটা গাড়ি।

'বামে চল্লিশ ফু...' বলতে শুরু করেও থেমে গেল ন্যাভিগেটর।

সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বাঁক নিল রানা। রাস্তার বাইরে খোয়া দিয়ে তৈরি স্ট্রিপে উঠল গাড়ির চাকা। ঝড়ের বেগে প্রায় ফুল স্পিডে পেরোল বাঁক। এখন ইঞ্জিনের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করছে রানা। রাতের আঁধারে লাল বাতি জ্বেলে সতর্ক করছে টেকোমিটার।

প্রচণ্ড বেগে পেছনে যাচ্ছে ট্র্যাকের কমলা ও সাদা স্ট্রিপ।

নাগাসাকি উপসাগরে ঝিকমিক করছে অসংখ্য বাতি। রানার ঠিক পেছনেই রোবটিক কার। প্রতি মুহূর্তে কমিয়ে আনছে দূরত্ব।

নির্জন সেতু পেরিয়ে বিপজ্জনক পঞ্চম বাঁকের দিকে চলেছে রানা। ফুল স্পিডে কর্কশ আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন। আর গতি তুলতে পারবে না। হালকাভাবে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখেছে রানা, যে-কোনও সময়ে সতর্ক করবে ন্যাভিগেটর, আর তখনই অ্যাক্সেলারেটর থেকে পা তুলে ব্রেক কষবে ও।

কিন্তু এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ পেরোতেই রানা টের পেল, সতর্ক করবে না কেউ। ওর চোখ পড়ল ট্র্যাকে আগের স্কিড করা দাগে। ওই একমুহূর্তেই কষল হিসাব। অনেক বেশি জোরে ছুটছে ওর গাড়ি। বাঁক খুব বেশি কাছে।

ব্রেক প্যাডেলে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল রানা। গাড়িটাকে চরকির মত ঘুরে যাওয়া থেকে বাঁচাল অ্যান্টি লক সিস্টেম। পেছন ট্র্যাক ভরে উঠল রাবার পোড়া নীল ধোঁয়ায়। হার্নেস নিষ্ঠুরভাবে কামড়ে ধরল রানার কাঁধ। ব্রেক প্যাডেলে পা রেখে স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘোরাতে শুরু করে কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিল ও।

গতি কমলেও আড়াআড়িভাবে হেঁচড়ে চলেছে টয়োটা। চাকা থেকে টিয়ার-গ্যাসের মত বেরোচ্ছে গাঢ় ধোঁয়া। প্রচণ্ড বেগে দেয়াল লক্ষ্য করে পিছলে চলেছে গাড়ি।

উপায় না দেখে ব্রেক প্যাডেল ছেড়ে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিল রানা। কর্কশ আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইছে রানা। ক'সেকেণ্ড পর খসখসে ট্র্যাক কামড়ে ধরল চার টায়ার। গতি এতই বেশি, ছিটকে ট্র্যাকের ভেতর দিকে চলে গেল গাড়ি। নেমে পড়েছে রাস্তা থেকে। আরেকটু হলে ছিঁড়ে নিত রোবটিক গাড়ির নাক। প্রচণ্ড বেগে রানার গাড়ি পেরিয়ে নীল ধোঁয়ায় হারিয়ে গেল ওটা।

কিন্তু ওই ধোঁয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল রোবট গাড়ির স্মোক সেন্সর। এদিকে অফ সেফটি মোড। নিজেও ব্রেক কষতে দেরি করেছে অটোমেটেড গাড়ি। ধোঁয়ার মেঘে ঢুকেই শুরু হলো স্কিড। সোজা গিয়ে বাইরের দেয়ালে গুঁতো দিল গাড়িটা। সংঘর্ষ হতেই ভেঙে ছিটকে উঠল ডানদিকের কার্বন ফাইবার। উপড়ে গেছে পেছনের উইং, ছুঁড়ে দেয়া কুঠারের মত পাক খেতে খেতে উড়ে গেল দেয়াল পেরিয়ে নাগাসাকি উপসাগরে। আহ্লাদী বেড়ালের মত দেয়ালে গা ঘষতে ঘষতে নুড়িপাথরের স্তূপে নাক গুঁজল রোবটিক গাড়ি।

ট্র্যাকের ভেতরের দিকে ঘাসের মাঠে থেমেছে রানার গাড়ি। কপাল ভাল ও আহত নয়। একেবারে শেষসময়ে দেখেছে বিধ্বস্ত হয়েছে অটোমেটেড গাড়ি। নাক গুঁজেছে নুড়িপাথরের স্তূপে। নষ্ট হয়েছে দুটো হেডলাইট। ট্র্যাকে আলো ফেলেছে অন্য দুটো।

রানার মনে হলো, রেসে ড্র করেছে ও। কিন্তু তখনই দেখল চরকির মত ঘুরছে রোবটিক গাড়ির চাকা। পিছিয়ে গেল গাড়িটা, নুড়িপাথর মাড়িয়ে উঠতে চাইছে ট্র্যাকে।

অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'ও, তাই?' প্রথমে উঠল না গতি, তবে সত্তর ফুট নালের মত ঘাসজমি পেরোতেই উঠে এল ট্র্যাকে। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছে ও। চলেছে মাঠের মাঝ দিয়ে ট্র্যাকের অন্যদিকে। ওদিকেই ফিনিশ লাইন।

একবার রোবটিক গাড়ি দেখল রানা। নতুন করে গতি তুলেছে লো হুয়াঙের গাড়ি, তবে ওটা থেকে খসে পড়ছে নানান পার্টস্। এখন একই গন্তব্যের দিকে চলেছে দুই গাড়ি উল্টো দিক থেকে। সংঘর্ষ অনিবার্য।

অ্যাক্সেলারেটর চেপে রাখল রানা। মাঠ পেরিয়ে কোনাকুনিভাবে চলেছে ফিনিশ লাইন লক্ষ্য করে।

তবে ওর গাড়ি ফিনিশ লাইন পেরোবার আধ সেকেণ্ড পর

পৌঁছুল রোবট চালিত ভাঙাচোরা গাড়ি।

মৃদু হেসে ব্রেক কষে থামল রানা। ট্র্যাকের এক শ' ফুট দূরে ওর চেয়ে অনেক ধীরে থামল রোবটিক কার।

হার্নেস খুলে গাড়ি থেকে বেরোল রানা। উন্মাদিনীর মত ছুটে আসছে হিনা। ধীরেসুস্থে হেলমেট আর ফায়ারপ্রুফ হুড খুলল ও। এদিকে প্রায় ধ্বংসস্তূপ প্রোটোটাইপ গাড়ির দিকে ছুট দিল লো হুয়াঙের ক'জন মেকানিক। কারও মুখে হাসি নেই। রেসে দ্বিতীয় হয়েছে তাদের গাড়ি।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' রানার কাছে জানতে চাইল হিনা।

'আগে এত ভাল ছিলাম না,' হাসল রানা। দরদর করে ঘামছে। গা থেকে আসছে পোড়া রাবারের গন্ধ।

'এখনও ভাবতে পারছি না আপনি জিতে গেছেন,' রানার হাত চেপে ধরল হিনা। 'সত্যি, আপনি পাগল!'

'হারতে পছন্দ করি না,' বলল রানা। তর্জনী তুলল। 'মানুষ পেল এক পয়েন্ট। রোবট? যিরো!'

ভিউয়িং প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এল লো হুয়াং এবং তার ইঞ্জিনিয়ার। চেহারা গম্ভীর। 'আপনি জিততে পারেননি,' জোর দিয়ে বলল বিলিয়নেয়ার। 'আপনি চিট করেছেন। ভেতর দিক দিয়ে এলে জেতার উপায় নেই।'

'আপনি বলেছেন, ফিনিশ লাইনে পৌঁছুবে যে গাড়ি, জিতবে ওটা,' বলল রানা। 'আমার তো মনে পড়ছে না যে আর কোনও শর্ত দেয়া হয়েছিল!'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রানাকে দেখল বিলিয়নেয়ার। 'এ থেকে প্রমাণ করা যায় না যে মানুষই সেরা।'

'আপনার সঙ্গে একমত নই,' মৃদু হাসল রানা। 'প্রমাণ হলো হারিয়ে দেয়া যায় রোবটকে। এ থেকে আরও একটা ব্যাপার বোঝা যায়, রোবটও হতে পারে বিপজ্জনক।'

গা জ্বলে গেলেও বুঝল লো হুয়াং, তর্কে জিততে পারবে

না।

টুং শব্দ তুলল সাবা সাবেলার বাহুর মেডেল। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে মেসেজ। কাঁধ ঝাঁকাল ইঞ্জিনিয়ার। 'এখনই কেউ খেতে চাইলে ডিনার রেডি।'

কঠোর চোখে তাকে দেখল বিলিয়নেয়ার। সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে খাবারের রুচি। উদাস চেহারা করে দূরে তাকাল সাবেলা। খুশি হতো দূরে কোথাও যেতে পারলে। এবার যে-কোনও সময়ে হামলা হবে ভেবে কবজির ছোরার কাছে পৌঁছে গেল হিনার হাত।

অন্যরা গম্ভীর, তবে মৃদু হাসছে রানা। নরম সুরে বলল, 'রেস জিতলে সবসময় দারুণ খিদে লাগে আমার।'

উনচল্লিশ

পাহাড়ের কাঁধে নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিচের অপূর্ব দৃশ্য দেখছে বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। দূরে কোটি রঙিন আলো বুকে নিয়ে ঝিকমিক করছে নাগাসাকি বন্দর। সাগরতীরে বিশাল এনসিডার ফ্যাক্টরি। এখন ওখানে নেই কোনও ব্যস্ততা।

শক্তিশালী যুম লেন্সের ক্যামেরা দিয়ে দেখছে সোহেল। পাশে ট্রাইপডে হাই-পাওয়ার্ড মিলিটারি-গ্রেড বিনকিউলার। গাড়ি প্রতিযোগিতার সময় দেখেছে রেস ট্র্যাকের একাংশ। এরপর দুর্ঘটনা হলেও রানা সুস্থ আছে দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সোহেল জানে, যে কেউ ভাবত আজকের মত যথেষ্ট

হয়েছে, কিন্তু হাল ছাড়বে না রানা।

একটু আগে রানা আর মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেছে ফ্যাক্টরিতে। খিদে লাগতেই পাশের সিট থেকে নিয়ে স্যাণ্ডউইচে কামড় দিল সোহেল। জিনিসটা কিনেছে ভেণ্ডার মেশিন থেকে। খুবই বিস্বাদ। বিড়বিড় করল ও, 'হুঁ, তুই শালা চালাবি দশ লাখ ডলারের স্পোর্টস্ কার, সুন্দরী মেয়েকে পাশে নিয়ে সাঁটাবি দারুণ সুস্বাদু ডিনার— আর আমি? না, এটা স্যাণ্ডউইচ নয়, বুড়ো কোনও জুতোর প্রাচীন সুখতলি! না রে, সৌভাগ্যের দেবী বলে কিচ্ছু নেই!'

স্কাইলাইন জিটি-আর গাড়ির ফেণ্ডারে কোমর ঠেকিয়ে স্যাণ্ডউইচটা নামিয়ে রাখল সোহেল। চোখে লাগাল বিনকিউলার। সামান্য ঘুরিয়ে ফোকাস করার পর পরিষ্কার দেখল ফ্যাক্টরির চারপাশ।

রেস শেষ হওয়ার পর কোথাও নেই কোনও নড়াচড়া। পার্কিং লটে রানার গাড়ি। থমথম করছে চারপাশ। একবারও চোখে পড়েনি সিকিউরিটি প্যাট্রল। কে জানে, হয়তো মানব গার্ডদের বদলে রোবটকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে নিপ্পন-চিন রোবটিক্স!

বিনকিউলার রেখে হাতঘড়ি দেখল সোহেল। পেরিয়ে গেছে রাত দশটা। রানা বলেছে, ঘটনা যা-ই হোক, মাঝ রাতের আগেই বেরোবে ফ্যাক্টরি থেকে। তা যদি না পারে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সোহেল।

তবে রানা নিজেই যথেষ্ট।

সোহেল কল দিল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হিমুরার অফিসে। ওখান থেকে বলা হলো তিনি আছেন জরুরি অ্যাসাইনমেন্টে। ফিরলে তাঁকে জানানো হবে সোহেল আহমেদ কল করেছিলেন।

কিন্তু মৃদু কেঁপেছে উবোন হিমুরার সহকারীর কণ্ঠ। এটা অস্বাভাবিক। কু ডাকছে সোহেলের মন। সেজন্যেই ভাবছে বি

প্ল্যানের কথা। গাড়ির ট্রাঙ্কে রয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইযের ফায়ারওঅর্কস্। রানার বিপদ হলে ওগুলো ফেলবে ফ্যাক্টরির ওপর। কাজটা শেষ করেই যোগাযোগ করবে নাগাসাকি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট-এ— আগুন ধরেছে এনসিআর দালানে!

প্ল্যান সাধারণ হলেও আশা করা যায় কাজে আসবে। ওর আছে বোতল রকেট, একেকটা মর্টার শেলের সমান। এ ছাড়া, স্টারবার্স্ট শেল ও স্প্রিংলার। ফ্যাক্টরির ছাতে ফেললে নানাদিকে ছিটকে উঠবে লাল, সবুজ ও সাদা ফুলকি। বেরোবে প্রচুর ধোঁয়া। সবাই ভাববে সত্যিই আগুন ধরেছে ফ্যাক্টরিতে। চাইলেও ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে এড়াতে পারবে না হুয়াঙের লোক। তখন অন্যদ্রের সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে ঢুকবে সোহেল।

অবশ্য, চেনে রানাকে। বিপদ হলে নিজেই খুঁজে নেবে পথ। বিড়বিড় করল সোহেল, 'অনেক তো হলো, এবার বেরিয়ে আয়, দোস্ত! অত কী খাস?'

বিনকিউলার রাখতে না রাখতেই দেখল, ফ্যাক্টরির দিকে চলেছে কালো এক সেডান। আবারও বিনকিউলার চোখে তুলল সোহেল। পথের পাশের বৈদ্যুতিক আলোয় দেখল লোডিং যোনে গিয়ে একটা ডকে থামল গাড়িটা। ওটা থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে লোডিং প্ল্যাটফর্মে উঠল এক লোক। দরজার পাশের কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করল না, ধুম-ধুম করে কিল বসাতে লাগল দরজার ওপর।

ছাতের কাছে জ্বলে উঠল বাতি। ওই আলোয় লোকটাকে চিনল না সোহেল। এদিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে সে।

খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল এক সিকিউরিটি গার্ড। কী যেন বলছে লোকটাকে। উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়ল এদিকের লোকটা। মনে হয় তর্ক করছে।

আবারও ভেতরে চলে গেল গার্ড।

অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রথম লোকটা।

'ঘুরে দাঁড়া, বাপ,' বিড়বিড় করল সোহেল। 'সোনার চাঁদ

বদনী ধনী ঘোরো তো দেখি?'

ওকে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা।

এবার ক্যামেরার ট্রাইপডের পেছনে গিয়ে নতুন করে ফোকাস করল সোহেল। কিন্তু আবারও খুলে গেছে দরজা, এবার বেরিয়ে এসেছে স্বয়ং লো হুয়াং লিটন! লোকটার সঙ্গে হেঁটে গেল সেডানের পেছনে। খোলা হলো গাড়ির ট্রাঙ্ক। দু'জন মিলে ওটা থেকে বের করল দীর্ঘ এক কাঠের কেস। ওটা রাখা হলো গাড়ির ছাতে। খুলে ফেলা হলো কেসের ঢাকনি।

নতুন উৎসাহে ফোকাস করল সোহেল।

কেসের ভেতরে ঝিকমিক করছে কয়েকটা তলোয়ার।

'এত রাতে অ্যান্টিক তলোয়ার কেনার ব্যাপারটা কী?' আনমনে বলল সোহেল।

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লো হুয়াং। কয়েকটা তলোয়ার বের করে বন্ধ করে দেয়া হলো কেসের ডালা।

পাহাড়ের একপাশে সরে ড্রাইভার লোকটার চেহারা ক্যামেরায় বন্দি করতে চাইল সোহেল। তবে ঠিকঠাক অ্যাংগেল পেল না। তবে তখনই দেখল ডকের একপাশে বড় এক কনভেক্স মিরর। ওটা রাখা হয়েছে ড্রাইভাররা যেন গুঁতো না লাগায় ডকে।

ওই আয়নার দিকে ক্যামেরা তাক করল সোহেল। নতুন করে ফোকাস করতেই বুঝল, ম্যাগনিফিকেশন করেছে একটু বেশি ওপরে। ঝাপসা দেখাচ্ছে লোকটার ছবি। ট্রাইপড থেকে ক্যামেরা হাতে নিল সোহেল। ওদিকের আলো বেশ জোরালো।

ফোকাস ফিক্স হতেই চিনে গেল ড্রাইভারকে: ওরে চিচিওয়া! গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে এলিয়ে পড়ে আছে এক লোক। তাকেও চিনল সোহেল। ওই লোক যেন ঘুমিয়ে আছে। বিড়বিড় করল ও: 'সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরা!'

সন্দেহ কী যে তিনি অফিসে নেই!

মানুষটার মুখে এখন সাদা টেপ।

নড়ছে ক্যামেরার দৃশ্য। লো হুয়াংকে একটা তলোয়ার তুলে দেখাল ওরে। ওটা মুড়িয়ে রাখা হয়েছে চামড়া দিয়ে। এবার গাড়ির ছাত থেকে নিল চামড়ামোড়া পুরু একটা বই। ওটা নিয়ে নিজের হাতেই রাখল লো হুয়াং। অন্যহাতে দেখাল ভেতরে যাওয়ার গেট।

গাড়িতে চাপল ওরে চিচিওয়া, তারপর ড্রাইভ করে ঢুকে পড়ল ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের ভেতর।

চল্লিশ

রেসিং গাড়ির বাক্সের মত বদ্ধ জায়গায় দশ ল্যাপ পার করে ঘেমে গোসল হয়েছে রানা। এইমাত্র গ্যারাজ ওঅশরুমে পোশাক পাল্টে ভদ্রস্থ হলো। পরে নিচ্ছে নিজের পোশাক। আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখ ধুচ্ছে, এমনসময় প্যান্টের পকেটে বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে ফোনটা বের করল রানা। কল করেছে সোহেল।

'তোর পার্টির মৌজ শেষ,' বলল বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'বাড়ির পেছনে এখন ওরে চিচিওয়া।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

ওরে চিচিওয়া হাজির হয়েছে সে ব্যাপারে মনে কোনও সন্দেহ থাকলে কল দিত না সোহেল।

'তার মানে, ওরেকে ধরতে পারেননি উবোন হিমুরা।'

'কথা ঠিক,' সায় দিল সোহেল। 'বলতে পারিস শিকার হয়ে গেছে শিকারী। সেডানের পেছনের সিটে পড়ে আছেন হিমুরা। মুখে টেপ, হাতও আটকানো ওই জিনিস দিয়ে।'

'জানিস বেঁচে আছেন কি না?'

'জানার উপায় নেই। মোটেও নড়ছেন না।'

চিবুক দিয়ে কাঁধে ফোন রেখে ডিনার কোট পরছে রানা। নিচু গলায় বলল, 'গাড়িটা এখন কোথায়?'

'পার্ক করেছে পরের দালানের লোডিং যোনে।'

'আমি চাইলে কীভাবে ওদিকে যাব?'

'তোর বিল্ডিং থেকে বেরোবি দক্ষিণ-পশ্চিমের করিডোর ধরে।'

এবার অন্যদিকে সরাতে হবে সবার মনোযোগ।

কাজটা সহজেই পারবে সোহেল।

'সোহেল, পৌঁছে যাব ওদিকের বিল্ডিঙে। তার আগে তৈরি করব ডাইভার্শন। সবাই ফ্যাক্টরি থেকে বেরোলে তুই নিজে ঢুকবি। কিন্তু এরা ভেতরে রয়ে গেলে, আমাকে দুই মিনিট সময় দেয়ার পর ফেলবি আতসবাজি।'

'জানতাম তোর কাজে লাগবে, তাই সাজিয়ে রেখেছি লঞ্চ ট্রেতে,' জানাল সোহেল।

'দু'মিনিট সময় দিবি,' বলে ফোন কেটে দিল রানা। কোটের কাফ ঠিক করে বেরিয়ে এল ওঅশরুম থেকে।

বাইরে অপেক্ষা করছে হিনা। আলাপ জুড়েছে সাবা সাবেলার সঙ্গে। আশপাশে কোথাও নেই লো হুয়াং লিটন।

'ডিনার রেডি তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, চলুন,' বলল ইঞ্জিনিয়ার সাবেলা। 'একটু পর পৌঁছুবেন মিস্টার হুয়াং।'

'চলো।' মৃদু মাথা দুলিয়ে হিনার হাত ধরে এগোল রানা।

গ্যারাজ পার হয়ে ভেতর দরজার দিকে চলেছে ওরা।

চারপাশ দেখছে রানা। ওদেরকে প্রায় ঘিরে রেখেছে ওঅর্ক বেঞ্চ। দেয়ালের কাছে একের পর এক যন্ত্রপাতি রাখার আলমারি। সহজেই চোখে পড়বে এমন একটা জিনিস খুঁজছে রানা। ক'সেকেণ্ড পর পেল ওটা। আলতো হাতে চাপ দিল হিনার হাতের তালুতে।

ওর দিকে তাকাল হিনা।

চোখের ইশারায় চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলার দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

চোখ বিস্ফারিত হলো হিনার।

ভেতরে যাওয়ার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। আর তখনই লোকটার ঘাড় ও কাঁধের মাঝে কারাতে চপ বসাল রানা। মারটা গাঁথল সুপ্রাস্ক্যাপিউলার নার্ভে। অবশ হলো সাবেলার শরীরের ডানদিক। ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল সে। তার আগে চোয়ালে নিয়েছে রানার ডানহাতি প্রচণ্ড এক ঘুষি।

'মেরে ফেললেন?' বলল হিনা। 'নড়ে তো না!'

'চিনা স্বর্গের খোয়াব দেখছে,' ঝুঁকে অচেতন লোকটার কাছ থেকে কি-কার্ড নিল রানা। 'দড়ি এনে হাত বাঁধো।'

কাছেই ইলেকট্রিকাল কর্ড পেয়ে ওটা দিয়ে সাবেলার দু'কবজি কষে বাঁধল হিনা। 'আপনি বোধহয় জানেন, রানা, ওরা চোখ রেখেছে আমাদের ওপর? চারপাশে ক্যামেরা।'

'বুঝতে পারছ, ঝেড়ে দৌড়াতে হবে।' কয়েক পা সরে এক ওঅর্কবেঞ্চের কাছে থামল রানা। গার্বেজ বিনের পাশেই পেল ডাব্লিউডি-৪০ স্প্রে ক্যান। তুলে নিল ওটা। হিনার হাতে দিয়ে বলল, 'গার্বেজ বিনে দেখেছি ময়লা কাপড়। ওখানে স্প্রে করো।'

নির্দেশ পালন করল হিনা। খালি করতে লাগল ক্যান। একটু দূরেই ব্যাটারি কার্ট, ওটা ব্যবহার করা হয় রেসের গাড়ি চালু করার সময়। গার্বেজ বিনের কাছে ওটাকে নিয়ে এল রানা।

গার্বেজ ক্যানে প্রায় খালি ক্যান ফেলল হিনা। ও সরে যেতেই ব্যাটারির দুই টার্মিনাল স্পর্শ করাল রানা। নানাদিকে ছিটকে গেল কমলা ফুলকি।

'যা ভাবছি, তাই করবেন?' জানতে চাইল হিনা।

'শিমেযুর দুর্গ পুড়িয়ে দিয়েছিল ওরা,' বলল রানা। 'আমরা একই দয়া করছি ওদের ওপর।'

ভুসভুস করে ক্যান থেকে বেরোচ্ছে স্প্রে। ওটার ওপর ফুলকি পড়তেই দপ্ করে জ্বলল আগুন। গার্বেজ ক্যানে রয়েছে তেলে ভেজা সুতি ন্যাকড়া। বৃত্তাকার বিন হয়ে গেল প্রায় ফ্রেমথ্রোয়ার।

ওটাকে গড়িয়ে এক ওঅর্কবেঞ্চের নিচে রাখল রানা। চট্ করে নিভবে না আগুন। দরজার দিকে রওনা হলো ও। 'জলদি এসো!'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল হিনা।

'বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে,' জানাল রানা। 'ওখানে এক গাড়িতে আছেন সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে।'

দরজা খুলতে সাবেলার কি-কার্ড ব্যবহার করল রানা। করিডোরে ঢোকার আগেই কনুই ব্যবহার করে ভাঙল ফায়ার প্যানেলের কাঁচ। হ্যাঁচকা টান দিল অ্যালার্ম হ্যাণ্ডেলে। দপ করে জ্বলে উঠেই কর্কশ চিৎকার ছাড়ল ফায়ার অ্যালার্ম।

'একমিনিট,' দৌড়ে আবার গ্যারাজে ফিরল হিনা।

'হাতে সময় নেই,' তাড়া দিল রানা।

মাত্র আধমিনিট পর আবার ফিরল মেয়েটা, টেনে এনেছে অচেতন সাবেলাকে।

'আগুনে পুড়বে না,' বলল রানা। 'এটা তো তোমাদের সেই কাঠের দুর্গ নয়।'

'আমি কি আর গাধাটাকে বাঁচাতে গেছি?' বলল হিনা। 'আমাদের দরকার ডোরস্টপার। ওই কাজ করবে লোকটা।'

কবাট খুলে সাবেলাকে ওটার সামনে রাখল মেয়েটা। এবার বন্ধ হবে না দরজা, ফলে করিডোর ভরে উঠবে ধোঁয়ায়। খুব কঠিন হবে পিছু নেয়া।

'চমৎকার, রোবট বউ বিয়ে না করে তোমাকে পটিয়ে ফেললেই ভাল করবে সোহেল,' বিড়বিড় করল রানা।

দক্ষিণ-পশ্চিম করিডোর ধরে ছুটছে ওরা। শেষমাথায় লক করা ফায়ার ডোর। তবে সাবেলার চাবি খুলে দিল দরজার তালা। পরের ঘর ডিযাইন রুম। চারপাশে স্কেল মডেল ও কমপিউটার। ঘর পেরিয়ে ওরা পেল এলিভেটর লবি। ওরা যে করিডোর ধরে এসেছে, সেটা বাদ দিলেও দু'দিকে দুই দরজা।

দূরের দরজার কাছে পৌঁছে কি-কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল রানা। সামনের করিডোরে দু'দিকে অফিস ও কনফারেন্স রুম।

ঘুরে হিনাকে ইশারা করল রানা। দেয়ালে দেখেছে সাঁটিয়ে রাখা ইমার্জেন্সি এস্কেপ প্ল্যান। এ তলার সবই দেখানো হয়েছে ওটাতে।

আরেকবার ফ্লোর প্ল্যান দেখল রানা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছে হিনা। বলল, 'ওদিকে।'

ঠিকই বলেছে মেয়েটা।

ডানের দরজা খুলে বাড়ির সামনে দীর্ঘ করিডোর পেল ওরা। ছুটতে ছুটতে রানা দেখল ঘাসের লন ও ছাতে এসে পড়ছে আতসবাজি। বুম-বুম শব্দে ফাটছে বোমার মত।

'ঠিক সময়ে রকেট হামলা,' হিনাকে বলল রানা, 'আমাদের সোহেল সত্যিকারের জিনিয়াস!'

একচল্লিশ

লো হুয়াঙের ফ্যাক্টরির ওপর অর্ধেক ফায়ারওঅর্ক্‌স খরচ করেছে সোহেল। এবার হিনার ইন্সটল করা ফোনেটিক ট্র্যান্সলেটার ব্যবহার করে কল দিল ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে। জানিয়ে দিল, একের পর এক বিস্ফোরণ হচ্ছে এনসিআর ফ্যাক্টরিতে। পুড়ছে দালান। পুরো দু'বার একই কথা বলে ফোন রাখল ও। লঞ্চ টিউবে ভরল দানবীয় বোতল রকেট। নল তাক করল নিচের ফ্যাক্টরির ছাতে। টিপে দিল বাটন। একরাশ ধূসর ধোঁয়া ছেড়ে ফ্যাক্টরির ছাতে গিয়ে পড়ল আতসবাজি।

ছিটকে উঠল লাল-সাদা-বেগুনি ফুলকি। আরও চমকে দিতে আরেকটা শেল পাঠাল সোহেল। ওটার ফুলকি সোনালি। বিকট আওয়াজে ফাটল শেল। ওই শব্দ ছাপিয়ে শহরতলী থেকে এল ফায়ার ব্রিগেড বহরের করুণ বিলাপ।

'যথেষ্ট,' বিড়বিড় করল সোহেল। বিনকিউলার, দুই ট্রাইপড ও ক্যামেরা গাড়ির পেছন সিটে রেখে চেপে বসল ড্রাইভিং সিটে। কাছে চলে এসেছে সাইরেন। ফ্যাক্টরির দুই মাইল দূরে চওড়া সড়ক ধরে আসছে দপ-দপ করা লাল আলো। আরেকটা শব্দ মনোযোগ কেড়ে নিল সোহেলের। ঘুরে তাকাল ফ্যাক্টরির দিকে। নাগাসাকি উপসাগরের আকাশ থেকে নামছে জোরালো আলো। সব আওয়াজ ছাপিয়ে এল হেলিকপ্টারের গর্জন। ল্যাণ্ড করছে ওটা।

স্কাইলাইনের ইঞ্জিন চালু করে নুড়িপাথরের সরু রাস্তায় রওনা হলো ও। বুঝে গেছে, একবার পুলিশ অফিসারকে হেলিকপ্টারে তুললে আর কখনও তার লাশ পাবে না কেউ।

•

তিন গার্ডসহ লো হুয়াং বিশাল গ্যারাজ পেরিয়ে করিডোরে ঢোকার আগেই জ্ঞান ফিরেছে সাবা সাবেলার। করিডোর ভরে গেছে ধোঁয়ায়। দূরে কমলা ফুলকি। তবে মনে হলো না কোথাও দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন।

'ওর বাঁধন খুলে তারপর নেভাবে আগুন,' নির্দেশ দিল লো হুয়াং।

'কী হয়েছে?' আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইল সাবেলা।

'সেটা তো আপনার জানার কথা,' ধমকের সুরে বলল হুয়াং। 'অজ্ঞান করে রেখে আগুন দিয়েছে ফ্যাক্টরিতে।'

হাতের বাঁধন খুলে সাবেলাকে বসিয়ে দিল এক গার্ড। কবজি ডলতে লাগল ইঞ্জিনিয়ার। ক'সেকেণ্ড পর টিপতে লাগল ঘাড়। 'ওরা জেনে গিয়েছিল ভিডিয়ো করছি।'

তার গলায় ঝুলন্ত মেডেল ধরে দেখল লো হুয়াং। কোনও ক্ষতি হয়নি ওটার। কয়েক ফুট দূরে মেঝেতে পড়ে আছে হাই-টেক কমপিউটার চশমা।

'রেকর্ডিং করছেন বলে হামলা করলে আপনার ক্যামেরা ফেলে যেত না। প্রাণের ভয়ে পালাতে চাইছে। ভেবেছে, আগুন দিলে সবার চোখ পড়বে এদিকে। ছুটে আসবে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। ...যাক গে, এবার ভিডিয়োর কারণে জরুরি সব তথ্য পাব আমরা। পরে কাজে লাগবে ওদের বিরুদ্ধেই। আশা করি যথেষ্ট ভিডিয়ো করেছেন, সাবেলা?'

মাথা দোলাল ইঞ্জিনিয়ার। 'ভিডিয়ো তো পেয়েইছি, এ ছাড়াও আছে গলার রেকর্ডিং। নড়াচড়ার অ্যানালাইসিসও বাদ পড়েনি। সহজেই নকল করা যাবে।'

'গুড,' বলল হুয়াং, 'আপনাদেরকে নিতে হেলিকপ্টার

আসছে। সোজা গিয়ে নামবেন দ্বীপে। দেরি করবেন না কাজ শেষ করতে।'

'আর কেউ যাবে?'

'হ্যাঁ, টোকিও থেকে এসেছে চিচিওয়া। উপহার হিসেবে এনেছে পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট হিমুরাকে। তার নিখুঁত নকল তৈরি হলে, ঠিক সময়ে কেউ বুঝবে না আমরা কী করেছি।'

ওয়্যারহাউসের কাছে পৌঁছে গেছে রানা ও হিনা। সামনেই লোডিং বে। সাবেলার চাবি ব্যবহার করে শেষ তালা খুলল রানা। সামনে সিঁড়ি নেমেছে নিচতলায়। ওখানে অজস্র কাঠের ক্রেট। দূরে কয়েকটা গাড়ি।

'হিমুরাকে নিয়ে বেরোতে হলে সরাতে হবে হুয়াঙের লোকের মনোযোগ,' বলল রানা। 'হিনা, দেখো তো ওসব গাড়ি বা ট্রাকে চাবি আছে কি না।'

'চাবি না থাকলেও তার ছিঁড়ে চালু করব ইঞ্জিন,' বলল হিনা।

'বেশ,' বলল রানা, 'নেবে শক্তিশালী গাড়ি। যাতে প্রয়োজনে লোহার গেট বা দেয়াল ভেঙে বেরোতে পারি।'

'শক্তিশালী? ঠিক আছে,' বলল হিনা।

'রোবট দিয়ে হামলা করাতে পারে হুয়াং,' জানাল রানা, 'ভুলেও নেবে না অটোমেটেড গাড়ি বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি।'

নিঃশব্দে গাড়িগুলোর দিকে চলল হিনা। এদিকে পেছন দরজায় পৌঁছে গেল রানা। কবাট সামান্য ফাঁক করে দেখল বাইরে। হুয়াঙের ক'জন কর্মীকে নির্দেশ দিচ্ছে ওরে চিচিওয়া। খালি করবে সেডান।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নিল দীর্ঘ কয়েকটা কাঠের কেস। এরপর নামাল চামড়া দিয়ে মোড়া কিছু জিনিস। খুব সাবধানে বাক্স রাখা হলো কার্ট-এ। কাজ শেষ হতেই টেনে হিঁচড়ে গাড়ি

থেকে নামাল পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেন্টকে। ধুপ্ করে ফেলা হলো তাকে মেঝেতে।

সেডানের লাইসেন্স প্লেট দেখল রানা।

ওটা সরকারী গাড়ি।

উবোন হিমুরার উদ্দেশে ধমকে উঠল একজন। আরেকজন লাথি দিল কোমরে। ইশারা করছে উঠে দাঁড়াতে।

হিমুরা বেঁচে আছেন, তাতে খুশি রানা। ভেবেছিল এবার মালপত্র সরিয়ে নেবে হুয়াঙের লোক। কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না কেউ। শোনা গেল প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে কংক্রিটের ডকের দিকে নামছে হেলিকপ্টার।

বিপক্ষে পাঁচজন, আর এদিকে একা রানা। ওয়্যারহাউসে চোখ বোলাল ও। এমন কিছু চাই, যেটা সমতা আনবে লড়াইয়ে। একটা ফোর্কলিফটের ওপর চোখ পড়ল ওর। ইলেকট্রিকাল ভেহিকেলটা চালু করা কঠিন নয়। ড্রাইভ করাও সহজ। রেসের ট্র্যাকে গাড়ির মত সতর্ক হতে হবে না ওকে।

দেরি না করে গিয়ে ফোর্কলিফটে উঠল রানা। ইঞ্জিন চালু করে ওপরে তুলল দুই দাঁড়া। রওনা হলো খোলা বে ডোর লক্ষ্য করে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বেরিয়ে এল ওয়্যারহাউস থেকে, সোজা চলেছে ওরে চিচিওয়ার দিকে।

দু'সেকেণ্ড পর প্রেতাত্মা দেখল, ঘাড়ের কাছে হাজির হয়েছে দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়ার মত ফোর্কলিফ্‌ট্। প্রাণের ভয়ে কর্কশ এক চিৎকার ছেড়ে একপাশে ঝাঁপ দিল সে। কিন্তু তার দলের দু'জনের কপাল অত ভাল নয়। ধুম্ করে তাদের বুকে লাগল ফোর্কলিফ্‌ট্। ছিটকে পড়ল লোক দু'জন। ওদের সৌভাগ্য যে বুকে গেঁথে যায়নি লোহার দাঁড়া।

না থেমেই ডানে বাঁক নিল রানা। তিন চাকার গাড়ি অস্বাভাবিক দ্রুত। দাঁড়ার প্রচণ্ড এক বাড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে দূরে গিয়ে পড়ল একজন। ফেটে গেছে পাঁজরের কয়েকটা হাড়। অন্যজনের হাতে পিস্তল দেখল রানা। ওর মাথার ওপরে

ছাতে বিঁধল বুলেট। এবার গেঁথে ফেলবে ওকে। ক্যাব থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঁচু এক বাক্সের আড়ালে গিয়ে পড়ল রানা। সাবধানে উঁকি দিল, উবোন হিমুরাকে টেনে হেলিপ্যাডে নিচ্ছে হুয়াঙের এক লোক।

ওদিকে ছুট দেবে রানা, এমনসময় পথ আটকে দাঁড়াল ওরে চিচিওয়া। পিস্তলের বদলে হাতে চকচকে এক কাতানা!

অস্ত্র দোলাল চিচিওয়া। 'কাউকে এক কোপে দু'টুকরো করতে না পারলে সে তলোয়ারের দাম নেই সামুরাই যোদ্ধার কাছে। বন্দি আর অপরাধীর ওপর পরীক্ষা করা হতো অস্ত্রের ধার। এবার এই তলোয়ারটা পরখ করব তোর ওপর!'

সামনে বেড়ে একপাশ থেকে তলোয়ার চালাল ওরে চিচিওয়া। তবে ঝট্ করে পিছিয়ে ফোর্কলিফটের ওদিকে সরে গেছে রানা। ক্যাবের খাঁচায় লেগে পিছলে গেল তলোয়ার। ব্যস্ত হয়ে চারপাশ দেখছে রানা। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র চাই ওর। এক সেকেণ্ড পর ফোর্কলিফটের পাশ থেকে নিল লোহার ডাণ্ডার মত প্রাই বার।

'ওটা দিয়ে কিছুই করতে পারবি না!' কর্কশ হাসল ওরে চিচিওয়া। লাফিয়ে উঠে রানার মাথা লক্ষ্য করে সাঁই করে চালাল তলোয়ার।

দু'হাতে প্রাই বার মাথার ওপরে তুলে বসে পড়েছে রানা। খটাং করে লোহার দণ্ডে নামল তলোয়ার। আপাতত বেঁচে গেল ও। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে হাত থেকে ছিটকে পড়েছে প্রাই বার। তৃতীয়বারের মত হুইশ্ শব্দে তলোয়ার আসতেই একপাশে ঝাঁপ দিয়ে মেঝেতে শরীর গড়িয়ে দিল ও। তীক্ষ্ণধার ফলা কেটে দিয়েছে কোটের হাতা। উন্মুক্ত বাহুর ওপর চোখ পড়ল ওর। পেশি কেটে টপটপ করে পড়ছে রক্ত। কাতানা এতই ধারালো, ত্বক ও পেশি কেটে দেয়ার সময় ব্যথা পায়নি ও।

'পরেরবার কেটে নেব তোর মাথা, টেরও পাবি না,' খলখল করে হাসল ওরে চিচিওয়া।

খুনিটার কথা ঠিক, ভাবছে রানা। কাছে চলে এসেছে ফায়ার ব্রিগেডের ট্রাক। ল্যাণ্ড করছে হেলিকপ্টার। ওই দুই যন্ত্রের আগমন ওকে দিল বাঁচার আশা। 'ওরে চিচিঙ্গা, তোমার বদলে আমি হলে এখন মানে মানে কেটে পড়তাম! জেলে গেলে বাকি জীবনেও কাজে আসবে না হুয়াঙের পয়সা!'

এ কথায় আরও খেপল চিচিওয়া। তলোয়ার বাগিয়ে তেড়ে এল ওর দিকে। প্রাণ বাঁচাতে সরল রানা। প্রেতাত্মা আর নিজের মাঝে রেখেছে ফোর্কলিফ্‌ট্‌। বুঝে গেছে, বেশিক্ষণ পালিয়ে বাঁচবে না। ওর চাই সত্যিকারের কোনও অস্ত্র।

কথাটা ভাবতেই ফোর্কলিফটের খাঁচায় হাত ভরে পিছিয়ে নিল একটা কন্ট্রোল। ছোট চাকায় ভর করে চরকির মত ঘুরল গাড়িটা। ওর একটা দাঁড়ার বাড়ি খেয়ে ছিটকে পেছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল ওরে। তাতে কী, ছুটে আসছে হুয়াঙের লোক।

ফোর্কলিফটের খাঁচায় ঢুকে রিভার্স গিয়ার ফেলল রানা, পিছিয়ে গেল দ্রুত বেগে। মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়েছে হুয়াঙের লোক ও ওরে চিচিওয়া। তেড়ে গিয়ে পলাতক রানাকে ধরবে কি না ভাবছে। এদিকে ডকের মেঝেতে নেমেছে হেলিকপ্টার।

মাত্র কয়েক মুহূর্তে আবারও ওয়্যারহাউসে ঢুকে পড়েছে রানা। ভাবছে, এবার ঘিরে ফেলবে হুয়াঙের লোক। কিন্তু তখনই উঁচু বাক্স ও নানান ইকুইপমেন্ট ছিটিয়ে সগর্জনে এসে ওর পাশে থামল হিনার দশ চাকার চোরাই ট্রাক।

তেড়ে যেতে গিয়ে মস্তবড় ট্রাক দেখে ব্রেক কষে থেমে গেছে হুয়াঙের লোক ও চিচিওয়া। হতাশ চোখে দেখল ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। পরক্ষণে তাদের দিকেই ছুটে এল ট্রাক। সবার আগে ঘুরেই বিরাট এক লাফ মেরে ওয়্যারহাউস থেকে বেরোল চিচিওয়া। পিছু নিল অন্যরা। পাঁচ সেকেণ্ড পর

আধখোলা গেট উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল দশ চাকার ট্রাক। রাস্তা ধরে আসছে আগুন নির্বাপক গাড়িগুলো।

'কমপাউণ্ড থেকে বেরোও,' তাড়া দিল রানা, 'পুলিশ দেখলেও থামবে না।'

তুমুল গতি তুলছে হিনা। পকেট থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে সোহেলকে কল দিল রানা। 'তুই কই? ওরা হেলিকপ্টারে তুলে নিয়েছে উবোন হিমুরাকে।'

'দেখেছি,' জবাবে বলল সোহেল। 'পিছু নেব টেইল নম্বর দেখার জন্যে। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর হয়তো সামনে রাস্তা থাকবে না।'

'তুই তা হলে যাচ্ছিস কোথায়?'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে উপসাগরের দিকে।'

রানার কারিশমা ছিল রেস ট্র্যাকে, সোহেল জাদু দেখাচ্ছে ভিড় ভরা রাস্তায়। নানান গাড়ি, পথচারী ও ছোটবড় গর্ত এড়িয়ে উড়ে চলেছে জিটি-আর। মাঝে মাঝে সামনে পড়ছে ধীরগতি বাস। তখন হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছে না সোহেল। বাধা হয়ে উঠছে গাছের সারি। কিছুক্ষণ পর আরও দূরে চলে গেল যান্ত্রিক ফড়িং।

সামনে ওয়ান ওয়ে রোড। নিয়ম না মেনে পাহাড়ি রাস্তায় ঝড়ের বেগে নামতে লাগল সোহেল। বুঝে গেল, সামনেই উপকূলীয় সড়ক। কিছুটা যেতেই বড় এক বাড়ির কারণে দেখল না হেলিকপ্টার। তখনই ওর ওপর চড়াও হলো ছোট এক গাড়ি। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে হর্ন বাজাতে শুরু করে পাশের নর্দমায় নামল সোহেল। আরেকটু হলে উড়িয়ে দিত ফায়ার হাইড্রেন্ট। আবার উঠে এল রাস্তায়। কিছু দূর যাওয়ার পর পেল টু ওয়ে রাস্তা।

'কই তুই?' ঘাড় বাঁকা করে দূর আকাশে চোখ বোলাল। কোথাও নেই হেলিকপ্টার। তবে ক'সেকেণ্ড পর দেখল যান্ত্রিক

ফড়িঙের রঙিন বাতি। ওটা চলেছে সাগরের দিকে।

নতুন আরেকটা রাস্তা পেয়ে প্রচণ্ড গতি তুলল সোহেল। কিন্তু এক শ' গজ যেতে না যেতেই হেডলাইটের আলোয় দেখল, রাস্তার শেষে ঝিকমিক করছে সাইনবোর্ডের সবুজ অক্ষর। কড়া ব্রেক কষে থামল ও। রাস্তা শেষ। আর তিন ইঞ্চি এগোলে গাড়ি গিয়ে পড়বে পঞ্চাশ ফুট নিচের সাগরে!

গাড়ি থেকে নেমে চোখে বিনকিউলার তুলল সোহেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত দেখা গেল কপ্টারের বাতি, তারপর হারিয়ে গেল সব আলো রাতের আঁধারে।

বেয়াল্লিশ

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে নুমা হেডকোয়ার্টারের বেসমেন্টে রয়েছে বিশাল *দ্য আর্থ স্টাডিয ল্যাব*। ওখানে জড় করা হয়েছে ভারী সব মেশিন, ইকুইপমেন্ট, পানির প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, বালির স্তূপ, কাদা ও নানা ধরনের মাটি। এসব ব্যবহার করেই তৈরি হয় নকল প্রাকৃতিক পরিবেশ। কখনও বেসমেন্টে চলছে সুনামি, কখনও ভয়ানক বন্যা, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, কখনও বা হচ্ছে তুমুল ভূমিকম্প।

এলিভেটর থেকে নেমে ল্যাবে ঢুকলেন কমোডোর জোসেফ কার্ক, সতর্ক। কাদামাটি ও পানি এড়িয়ে পৌঁছে গেলেন জিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের দুই বিজ্ঞানীর একজনের পাশে। ভাল করেই জানেন, দু'দিন হলো রাত-দিন খাটছে যুবক।

জিম পার্কার মেরিন জিয়োলজিস্ট। কাজ করে আসিফ রেজার সহকারী হিসেবে। লাঠির মত সরু শরীর, ফ্যাকাসে মুখ। মাথার সোনালি চুল নেমেছে কোমরে। কেউ দেখলে হঠাৎ ভাববে, এ যুবক আসলে কোনও নর্ডিক রাজপুত্র।

'শুভ সকাল, পার্কার,' বললেন কার্ক।

'ও,' তো সকাল হয়েছে?' কাজ থেকে মুখ না তুলেই বলল যুবক। 'মর্নিং, ভেবেছিলাম এখনও রাত।'

'একটু আগে সূর্য উঠেছে। অফিসে ফিরেই পেলাম তোমার মেসেজ। নতুন কিছু জানতে পেরেছ তোমরা।'

'স্মিতা আর আমি বোধহয় জেনেছি কোথা থেকে আসছে এত পানি।'

'গুড,' বললেন কার্ক।

কাগজ থেকে চোখ তুলল পার্কার। মুখ শুকনো। 'তবে আগেই খুশি হবেন না। ব্যাখ্যা করে বলবে স্মিতা। ওর থিয়োরিই ফলো করেছি।' হাত বাড়িয়ে ইণ্টারকমের বাটন টিপল যুবক। 'কমোডোর কার্ক এসেছেন। জানতে চান আমরা কী পেয়েছি।'

'আসছি, একমিনিট,' বলল নারী কণ্ঠ।

অগোছাল ডেস্কের ওপর থেকে কয়েকটা কাগজ সরাল পার্কার। কার্ক দেখলেন আসছে স্মিতা আগরওয়াল।

যুবতী ভারতীয়। জন্মেছে মুম্বাই-এ। তবে বড় হয়েছে লণ্ডনে। লেখাপড়া করেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, তারপর ওকে ডক্টরেটের জন্যে পাঠানো হয়েছে এমআইটিতে। কালো চোখ, চোয়ালে উঁচু হাড়, একটু বেশি পুরু দুই ঠোঁট। কাঁধ ছুঁই-ছুঁই করছে বাদামি চুল। নাকের পাশে ছোট্ট নাকফুল থেকে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে খাঁটি হীরা।

নিখুঁত সুন্দরী বলা যেত ওকে, তবে মস্ত এক খুঁতের কারণে তা বলা যাবে না। এমআইটি থেকে বেরোতেই নুমার ইণ্টারভিউ-এ প্রথম হয়েছিল শতখানেক প্রতিযোগীকে

হারিয়ে। চাকরিতে যোগ দেয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ পর ভয়ানক গাড়ি দুর্ঘটনায় ভেঙে গেল ওর মেরুদণ্ড। পাঁচ-পাঁচবার অপারেশনের পর দীর্ঘ ছয় মাস পড়ে ছিল হাসপাতালে। এরপর পায়ের বুড়ো আঙুলে ফিরে পায় সাড়া। ভেবেছিল, আর কখনও কাজ করতে পারবে না বলে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হবে ওকে। কিন্তু ও হুইল চেয়ারে বসার মত সুস্থ হতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এসে হাজির, বললেন: অনেক শুয়েছ, এবার যোগ দাও কাজে।

কমপিউটার জিনিয়াস ল্যারি কিং-এর সঙ্গে কমপিউটার ডিপার্টমেণ্টে কাজ পেল ও। কিছু দিনের ভেতর সবাই বুঝে গেল, চাইলে অবিশ্বাস্য মনোযোগ দিতে পারে এই মেয়ে। আর এজন্যে আসিফ রেজা দেশের বাইরে থাকলে সবসময় স্মিতাকে জিয়োলজি টিমে কাজ দেন জর্জ হ্যামিলটন।

নিজের ডিযাইন করা অ্যাথলেটিক হুইল চেয়ারে বসে ডেস্কের কোনা ঘুরে থামল স্মিতা। ওই হুইল চেয়ারে আছে শক্তিশালী ব্যাটারি প্যাক। চাইলে ছুটতে পারে ত্রিশ মাইল বেগে।

ধূসর গেঞ্জি আর নীল জিন্স পরেছে স্মিতা। টের পেল, বরাবরের মতই আড় চোখে ওকে দেখছে পার্কার, চোখে নিখাদ প্রশংসা ও ভালবাসা। 'অত কী দেখছ, পার্কার?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'জানি না,' মাথা নাড়ল পার্কার। 'হতে পারে তোমার গায়ের অদ্ভুত সুন্দর রঙ, আবার হতে পারে হাতের পেশি। কোন্‌টা যে বেশি ভাল ঠিক বুঝি না।'

মিষ্টি হাসল স্মিতা। 'খালি প্রশংসা, তাই না?'

'বিশেষ করে ওই হাত,' বলল পার্কার। 'দুই হাতেও তোমার সঙ্গে পাঞ্জায় পারব না। আমার হাত তো ভেজা নুডলসের মতই।'

কাঠির মত হ্যাংলা ছোকরা সত্যিই প্রেমে পড়েছে, বুঝে

গেছেন কার্ক। খুকখুক করে কেশে নিয়ে বললেন, 'মেসেজ পড়ে মনে হয়েছে তোমরা কিছু জেনেছ।'

'তবে অনেকে ভাববে ওটা দুঃসংবাদ,' বলল স্মিতা।

'আমি মেসেজে আভাস দিয়েছি,' বলল পার্কার।

'খুলে বলো,' বললেন কার্ক, 'কী জানলে তোমরা।'

হুইল চেয়ার একটু সরিয়ে নিল স্মিতা। 'প্রথমে কিছুই বুঝিনি। তখন মনে হলো চিনারা ফুটো করেছে সাগরের নিচে কোনও অ্যাকুইফার। তবে ওটা হবে প্রকাণ্ড। প্রেশার ওটার প্রচণ্ড। নইলে আসিফ ভাই আর তানিয়া আপার ঢিবি থেকে ছিটকে বেরোত না এত পানি। কিন্তু জাপানি সাব-বটম প্রোফাইল ছিল আমাদের কাছে। ওদিকে সাগরের নিচে এত বড় লেক নেই যে চাপ খেয়ে উঠে আসবে পানি। তখন বাধ্য হয়ে আরও গভীরে খোঁজ নিলাম।'

এবার মুখ খুলল পার্কার, 'গত ক'বছর আগে ওই এলাকায় তেল খুঁজেছে এক তেল কোম্পানি। এরপর ধার নিলাম ওদের ডেটা। সেসময়ে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সবাই। হাইড্রোকার্বন ডিপোযিট পাওয়ার জন্যে সাগরতলে বহু মাইল নিচে অস্বাভাবিক গভীর কূপ খুঁড়েছিল ওই কোম্পানি। পেলও খানিক অন্য ডিপোযিট। কিন্তু সেসব তুলতে গেলে যে খরচ, তাতে পোষাবে না। অত তলা থেকে তেল তুললে একেক ব্যারেলের দাম পড়বে আড়াই শ' ডলার।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'তার ওপর, তেল পেল না তারা,' বলল পার্কার, 'ছিল সামান্য গ্যাস। কিন্তু সেসব আছে চিনা এলাকায়।'

'পানির কথা বলো,' বললেন কার্ক।

'পানিও পেল না। তবে ওখানে ছিল খাড়া কিছু ফাটল। সেসব সার্ভে এরিয়া থেকে দূরে।'

'খাড়া ফাটল?'

'জী, আগে কখনও জিয়োলজি ডেটাবেসে এমন দেখা যায়নি,' বলল পার্কার। 'ওখানে আছে নতুন ধরনের পাথর। জিয়োলজিস্টরা আগ্রহী হতে পারেন। তবে ওই পাথরের ভেতর পানি নেই।'

'তখন আরও গভীরে গেলাম আমরা,' বলল স্মিতা। 'ভাবলাম, রোভ না পাঠিয়ে কী করে অত নিচে যাব? সেসময়ে চোখ পড়ল ডক্টর শিমেযুর যি-ওয়েভের ওপর। তাঁর চেয়ে অনেক আধুনিক সাইসমিক মনিটর আছে এমন দু'একটা স্টেশন দেখেছে অতটা নিচে। কিন্তু দরকার পড়েনি বলে প্রকাশ করেনি কোনও ডেটা।'

'তারপর?'

'তারা ব্যবহার করেছিল মাটির অনেক গভীরে হাই-ইনটেনসিটি সাউণ্ড ওয়েভ।'

'খনি খুঁজছিল তারা?'

'জী।' মাথা দোলাল স্মিতা।

'তা হলে চিনারা সাগরে খনি খুঁজছে?'

'তাই আমাদের ধারণা,' বলল স্মিতা, 'তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিস্মিত হয়েছি অন্য কারণে। পার্কারের সংগ্রহ করা ডেটা থেকে দেখেছি, কোথা থেকে এসেছে যি-ওয়েভ। হতবাক হতে হয়েছে। বহু নিচে খাড়া পাথরের চাপড়ায় বাড়ি খেয়ে উঠে এসেছে যি-ওয়েভ।'

'কতটা গভীরে গেছে?' জানতে চাইলেন কার্ক।

'নিচের স্তর থেকে ওপরের চাতালে ওঠার জায়গাটাকে ধরুন পরিবৃত্তি এলাকা,' বলল পার্কার, 'ওটা কমপক্ষে দুই শ' মাইল। ওই গভীরতায় গিয়ে গুঁতো মেরে গভীর পাথর ভেদ করে উঠেছে যি-ওয়েভ। তাতে তৈরি করেছে অদ্ভুত মিষ্টি তরঙ্গ। আর তাতেই পরিবৃত্তি এলাকায় পাগল হয়ে উঠেছে কিছু মিনারেল।'

'কী ধরনের মিনারেল?'

'আগে হয়তো শুনেছেন, রিংউডাইট?'

'না, শুনিনি,' মাথা নাড়লেন কার্ক।

'ক্রিস্টালের মত হলেও প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। ওপরের চাতালের নিচে আছে ওই জিনিস। আজ থেকে কয়েক বছর আগে, দু'হাজার চোদ্দ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে পাওয়া হীরায় রিংউডাইট পেয়েছেন জিয়োলজিস্টরা। সবাই অবাক হন, ওই মিনারেলে ছিল বিশেষ ধরনের পানি।'

পার্কারের কথা শেষ করল স্মিতা, 'নতুন করে স্টাডি করলাম। আগেই পরীক্ষা করে দেখেছেন জিয়োলজিস্টরা, ওই রিংউডাইটে রয়েছে প্রচুর পানি। জিয়োলজিস্ট টিম ব্যবহার করেছিল আলট্রাসাউণ্ড জেনারেটর। কয়েক মাস পর আবারও ওখানে পরীক্ষা করে। জানা যায় পরিবৃত্তি এলাকা দেড় শ' মাইল পুরু। আর এই রিংউডাইটে আছে পানি। চারপাশে পাথরের প্রচণ্ড চাপ। অবস্থা ঝাঁকি দেয়া সোডা বোতলের কার্বোনেটেড জলের মত। খনি খুঁড়তে গিয়ে নিচের পাথর ফাটিয়ে দিয়েছে চিনারা। ফলে তৈরি হয়েছে এক শ' মাইলের বেশি গভীর ফাটল। চারপাশের পাথরের চাপ খেয়ে হুড়মুড় করে উঠছে কোটি কোটি গ্যালন পানি।'

'তার মানে, সে পানিই উঠেছে সাগরের বুকে,' বললেন কার্ক। 'এসব তথ্য থেকে হয়তো বেরোবে, কীভাবে বন্ধ করা যাবে পানি উৎসারণ। ...এত মুখ কালো করে রেখেছ কেন তোমরা? এটা তো খারাপ নয়, ভাল খবর!'

'আপনার তাই মনে হলো?' মাথা নাড়ল পার্কার। 'স্যর, ওটা কিন্তু তেলকূপ নয়। চাইলেন আর ক্যাপ লাগিয়ে দিলেন, তা অসম্ভব। পাতাল লেক থেকে পানি উঠলেও বহু দিন লাগে শুকাতে। তার ওপর, পরিবৃত্তি এলাকা বিশাল— এক শ'র বেশি মাইল গভীর।'

'আরও তথ্য দরকার,' বললেন কার্ক, 'তোমরা বলতে পারবে কী পরিমাণ পানি আছে ওখানে?'

শুকনো মুখে বলল পার্কার, 'সাত মহাসাগর, নদী, লেক বা সব বরফের ক্যাপ মিলেও ওটার অর্ধেক হবে না। সব যদি উঠে আসে, মাত্র কিছু দিনে তলিয়ে যাবে পৃথিবীর সব জমিন। পানিতে ভরে যাবে নীল এই গ্রহ। থাকবে না একটা দ্বীপও। এমন কী মাউণ্ট এভারেস্ট তলিয়ে যাবে বারো হাজার ফুট পানির নিচে।'

কথাটা শুনে প্রতিক্রিয়া দেখালেন না কমোডোর কার্ক।

বিজ্ঞানী মানুষ পার্কার, দ্বিধা না করে বলে দিয়েছে অঙ্কের হিসাব। তবে বাস্তবে এমন মহাপ্লাবন না-ও হতে পারে।

পার্কার নিরাশাবাদী হলেও আশাবাদী মানুষ স্মিতা। মন্দ কিছু হলেও ভাবে, বিপদ উৎরে যাবে মানবজাতি। স্মিতার দিকে ফিরলেন কার্ক। 'ভাবছ সব শেষ করে দেবে মহাপ্লাবন এসে?'

একবার পার্কারকে দেখে মাথা নাড়ল স্মিতা। 'আমার তা মনে হয় না। তবে একবার পরিবৃত্তি এলাকা থেকে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পানি উঠলে সাগর-সমতল হবে দুই হাজার ফুট ওপরে।'

'দুই হাজার ফুট?' ঢোক গিললেন কার্ক।

মাথা দোলাল স্মিতা।

'পাথরের বুক থেকে ওই পাঁচ পার্সেন্ট পানি উঠে আসার সম্ভাবনা কতটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্মিতা। 'বলা কঠিন। আগে এমন বিপর্যয় দেখেনি কেউ। আমরা জানি, বাড়ছে বিপদের মাত্রা। গত এগারো মাসের প্রথম ছয় মাস যে পরিমাণের পানি সাগরে বেড়েছে, তার পরের নব্বুই দিনে হয়েছে তার দ্বিগুণ। শেষ পাঁচ সপ্তাহে আবার তার দ্বিগুণ। সহজ হিসেব: ওই পাঁচ পার্সেন্টের চেয়ে দশ পার্সেন্ট পানি উৎসারণের সম্ভাবনা বেশি। বাস্তবে কী হবে কেউ বলতে পারে না। তবে এভাবে সাগর-সমতল উঠলে কমপক্ষে চার শ' ফুট উঁচু হবে ওটা।'

মাথা দোলাল পার্কার। 'অল্প কিছুদিনেই তলিয়ে যাবে এশিয়ার নিচু দেশগুলো, দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক, উত্তর ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার বিশাল এলাকা। থাকবে না উপকূলীয় কোনও শহর। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হবে ভারত উপমহাদেশের। সরে যেতে বাধ্য হবে দুই বিলিয়ন মানুষ। কিন্তু তাদেরকে রাখার জায়গা থাকবে না। খাবার আর পানির অভাবে মরবে সাড়ে চার বিলিয়ন মানুষ। আর তারপর...'

বিস্তারিত শুনতে চান না বলে হাত তুলে বাধা দিলেন কার্ক। 'সাগর উঠে আসা ঠেকাবার উপায় আছে?'

'আমরা খুঁজে পাইনি,' বলল স্মিতা, 'তবে সাগরের নিচে কী করেছে চিনারা, তা জানলে হয়তো বেরোতে পারে বিপদ ঠেকাবার উপায়।'

স্মিতার দিকে চাইলেন কার্ক।

মেয়েটার চোখে দুশ্চিন্তা ও অসহায়ত্ব। যেন বুঝে গেছে, বেশিরভাগ মানুষকে শেষ করতে কিছু দিনের ভেতর হাজির হচ্ছে পৃথিবীর বুকে ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবন।

'সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে সব ডেটা দাও,' বললেন কার্ক, 'চাই দুটো রিপোর্ট। একটায় থাকবে টেকনিকাল ডেটা। অন্যটার ভাষা হবে সহজ। যাতে কেউ পড়ে বুঝতে পারে। আগামী একঘণ্টার ভেতর দুই রিপোর্ট পাঠাবে আমার অফিসে।'

'সাধারণ মানুষকে জানাব আমরা?' বলল স্মিতা।

'না।' মাথা নাড়লেন কার্ক। 'কিছুই বলব না। বললে প্রাণের ভয়ে আগেই প্রলয় ডেকে আনবে তারা। টেকনিকাল রিপোর্ট সম্ভবত যাবে চিন সরকারের কাছে। সহজ রিপোর্ট তুলে দেব আমাদের প্রেসিডেন্টের হাতে।'

তেতাল্লিশ

গভীর মনোযোগে মানচিত্র দেখছে রানা। বুঝতে চাইছে ঠিক্ কোথায় গেছে লো হুয়াং লিটনের হেলিকপ্টার।

'ওটা গেছে এদিক দিয়ে,' মাউস দিয়ে স্ক্রিনে রেখা তৈরি করল সোহেল। 'ওই বাড়িটা টপকে বন্দর পার হয়ে সাগরে।'

যে রেখা তৈরি করেছে, সেটা গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

'হয়তো চিনের ভূখণ্ডে নিয়ে গেছে অফিসার হিমুরাকে,' বলল হিনা।

'তা হলে এত ঘুরে যাবে কেন?' মাথা নাড়ল রানা। 'কাছের শহর শাংহাই। সেটা আছে পশ্চিমে।'

'অনেক বেশি দূর,' বলল সোহেল, 'ওই হেলিকপ্টার শর্ট রেঞ্জের। শাংহাই কমপক্ষে পাঁচ শ' মাইল দূরে। চিনের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুতে পারবে না। অন্তত একবারে না।'

'রিফিউয়েলিং করলে?' জানতে চাইল রানা।

সোজা হয়ে বসল সোহেল। 'মাঝ আকাশে রিফিউয়েলিং করবে বলে মনে হয় না। হয়তো নামবে জাহাজে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'দেখতে হবে শিপ ট্র্যাকার।'

প্রোগ্রামে ক্লিক দিতেই স্ক্রিনে ফুটল নাগাসাকি বন্দর থেকে চারপাশের এক শ' মাইলের সব জাহাজের আইকন। চাইলে আরও কয়েক শ' মাইল মানচিত্র দেখতে পাবে ওরা। কিন্তু তাতে সুবিধা হবে বলে মনে হলো না ওদের।

'চারপাশে শত শত জাহাজ,' বলল হিনা।

'আশপাশে হুয়াঙের কোনও ইয়ট আছে?' জানতে চাইল সোহেল।

অনলাইনে দেখল রানা। 'তিনটে।'

'ওসব ইয়ট থেকে খুঁজতে শুরু করতে পারি।'

হুয়াঙের ইয়টের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর সার্চ উইণ্ডোতে দিয়ে লোকেশন চাইল রানা। ফুটে উঠল পৃথিবীর মানচিত্র। 'একটা আছে মোনাকোয়। আরেকটা শাংহাই বন্দরে। তৃতীয়টা আপগ্রেড হচ্ছে ইতালিতে।'

'ইয়ট বাদ,' বলল সোহেল।

আগের স্ক্রিনে ফিরল রানা। ব্যস্ত হয়ে টাইপ করল নতুন সার্চ এরিয়া। এবার বাদ দিয়েছে পাঁচ হাজার টনি জাহাজের চেয়ে ছোটগুলোকে। ওদের চাই এমন জাহাজ, যেটায় নামবে কপ্টার। 'এক শ' মাইলের ভেতর রয়েছে পঞ্চাশটা জাহাজ। ওখানে নামতে পারে হেলিকপ্টার।'

হতাশ হলো সোহেল। 'আমরা তো আর পঞ্চাশটা জাহাজ খুঁজতে পারব না।'

'জাতীয়তা দেখে জাহাজ বাদ দেব,' নতুন করে টাইপ করছে রানা। 'আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান জাহাজে নামবে না হুয়াঙের কপ্টার। তার মানে, হিসেবে থাকছে চব্বিশটা।'

'উপকূলের আশপাশে আছে কয়টা?' জানতে চাইল সোহেল।

কি-বোর্ড টিপে সোহেলের দেখানো রেখা অনুসরণ করল রানা। ক'সেকেণ্ড পর বিস্মিত হয়ে বলল, 'একটাও না। সবচেয়ে কাছের জাহাজ উত্তরদিকে পনেরো মাইল দূরে। সোজা আসছে নাগাসাকি বন্দরের দিকে।'

'হয়তো কোর্স পাল্টেছে কপ্টারের পাইলট,' বলল হিনা। 'সোহেল বলেছেন, ওরা বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'অবাক লেগেছে তোর?'

'না। চোখের আড়ালে সরতে চেয়েছে। একবার বাতি

নিভিয়ে দেয়ার পর যে-কোনও দিকে যেতে পারে।’

‘ওরা তো আর ভাবেনি তুই পিছু নিবি, তাই না?’ বলল রানা।

মাথা দোলাল সোহেল। ‘জানার কথা নয়। অথচ, নিভিয়ে দিয়েছিল সব বাতি।’

‘কতটা ওপর দিয়ে যাচ্ছিল?’ জানতে চাইল রানা।

‘যথেষ্ট নিচ দিয়ে,’ বলল সোহেল, ‘ধর, একহাজার ফুট।’

‘আরও ওপরে উঠছিল?’

‘মনে হয় না। উচ্চতা সমান ছিল।’

ম্যাপের দিকে ফিরল রানা।

‘কিছু ভাবছিস?’ জানতে চাইল সোহেল।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। এগোল ম্যাপে আগের কোর্স ধরে। ‘আমার ধারণা, ওরা এড়াতে চেয়েছে নাগাসাকির রেইডার। জানা ছিল না পিছু নিয়েছিস তুই। ওরা আসলে চেয়েছে সবার চোখ থেকে সরে যেতে। যাতে ভূখণ্ড থেকে দেখা না যায় কোথায় চলেছে তারা।’

এবার জাহাজ বাদ দিয়ে দ্বীপ খুঁজতে লাগল রানা। জাপানের উপকূলের কাছে দ্বীপের অভাব নেই।

‘গানকানজিমা,’ বলল হিনা।

ওর দিকে তাকাল রানা ও সোহেল।

‘ব্যাটলশিপ আইল্যাণ্ড,’ ব্যাখ্যা দিল হিনা, ‘ওটার আসল নাম হাশিমা। উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে ওই দ্বীপে আগে ছিল কয়লার খনি। এক হাজারেরও বেশি মজুর কাজ করত ওখানে। থাকত পরিবারসহ। তাই ওদের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল কংক্রিটের বাড়ি আর সি-ওয়াল। ওই দ্বীপ যেন পাহারা দিচ্ছে নাগাসাকি শহরের মুখে। তাই নাম হয়েছে ব্যাটলশিপ আইল্যাণ্ড।’

কমপিউটার স্ক্রিনে দ্বীপটা দেখাল হিনা। পেনিনসুলা আছে বলে উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ওটা। সতেরো

মাইল দূরে লিটনের ফ্যাক্টরি।

হাশিমার নাম শুনেছে রানা। পরিত্যক্ত হয়েছে বহু বছর আগেই। 'ওটা না হয়ে উঠেছিল টুরিস্ট স্পট?'

'ছিল,' বলল হিনা। 'একবছর আগেও হাজার হাজার টুরিস্ট যেত। তারপর জানা গেল, মাটি আর বাড়িগুলোয় আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসবেস্টস, আর্সেনিক আর নানান ধরনের বিষ। শরীরের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

ল্যাপটপ কমপিউটার ঘেঁটে জাপানের রহস্যময় ক'টি দ্বীপ নিয়ে একটি আর্টিকেল খুঁজে বের করেছে রানা। ওখান থেকে পড়ে বলল, 'এগারো মাস আগে ওই দ্বীপে যাওয়া নিষিদ্ধ করে ফেডারেল গভর্নমেন্ট। একইসময়ে নাগাসাকিতে ফ্যাক্টরি করে হুয়াং। এ-দুটো ব্যাপার কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমিও একমত,' বলল সোহেল।

ওর দেখানো ফ্লাইট পাথ অনুসরণ করল রানা। সরাসরি গেছে হাশিমা দ্বীপের ওপর দিয়ে। 'আশপাশে আরও কিছু দ্বীপ আছে। টাকাশিমা আর নাকানোশিমা।'

'টাকাশিমায় জনবসতি আছে,' বলল হিনা, 'জাদুঘরও আছে। এ ছাড়া, আছে ছোট হোটেল।'

'সবার অগোচরে নামতে পারবে না হেলিকপ্টার,' বলল সোহেল।

'আর নাকানোশিমা আসলে ছোট দু'তিনটে পাথর ছাড়া কিছুই নয়,' বলল হিনা। 'হেলিকপ্টার নামবে না।'

ব্যাটলশিপ আইল্যাণ্ডের স্যাটেলাইট ইমেজ দেখল রানা। 'ওরা বোধহয় ওখানেই গেছে।'

'জনশূন্য বলে ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে হুয়াং,' বলল সোহেল, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওখানে কেন? নাগাসাকিতেই তো আছে তার বিশাল ফ্যাক্টরি।'

'গোপন করতে চায় কিছু,' বলল রানা, 'জাপানিয় সেফটি ইন্সপেশন হবে, সে ঝুঁকি নেয়নি।'

'আমরা কথা বলতে পারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে,' বলল হিনা।

না-সূচক মাথা দোলাল রানা। 'লাভ হবে না। ওপর মহলে বন্ধু আছে লিটনের। হয়তো তাদেরকে ব্যবহার করেই দখল করেছে ওই দ্বীপ। কর্তৃপক্ষকে কিছু বলতে গেলে খুন হবেন উবোন হিমুরা। তাঁকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে ওখানে। হাতে সময় নেই।'

চুয়াল্লিশ

দু'ঘণ্টা পর।

নাগাসাকি উপসাগর।

ত্রিশ ফুটি বো-রাইডার বোটে চেপে এগিয়ে চলেছে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ ও হিনা। শক্তিশালী ইনবোর্ড মোটরের জোরে মাঝারি ঢেউ কাটছে ভি আকৃতি বো। মাত্র ষোলো মাইল দূরে আঁধারে ভরা হাশিমা দ্বীপ।

নুমার হাইটেক গিয়ার সংগ্রহ করার সময় ছিল না, তাই বড় এক কোম্পানির পাওয়ারবোট 'ধার' নিয়েছে রানা। ভাড়া দেয় এমন এক কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করেছে ডাইভিং গিয়ার। চেষ্টা করবে সব ফেরত দিতে। কিছু নষ্ট হলে, সে ক্ষতির জন্যে নগদ টাকা গুনবে নুমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

হুইলে আছে হিনা।

বাতাসের বেগ পরখ করছে রানা।

ডাইভিং গিয়ার গুছিয়ে নিচ্ছে সোহেল।

'উত্তর-পশ্চিমে চলো,' হিনাকে বলল রানা। 'কয়েক মাইল

যাওয়ার পর আবারও ফিরবে দ্বীপের দিকে।'

হিনা ডানে হুইল ঘোরাতেই কাত হয়ে আবার সোজা হলো বোট।

স্টার্নে এসে দূরে তাকাল সোহেল। 'কী করা উচিত ভাবছিস, রানা? দ্বীপ কিন্তু ওদিকে। সাঁতরে যেতে হলে খুন হব। বহু দূর।'

'শতখানেক ছবি আর স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে মনে হয়েছে, সাঁতরে দ্বীপে ওঠা বুদ্ধির কাজ হবে না।' ল্যাপটপে হাই রেযোলিউশন এরিয়াল ফোটো দেখাল রানা। 'দ্বীপ ঘিরে রেখেছে চল্লিশ ফুটি বাঁধ বা দেয়াল। সর্বক্ষণ এসে আছড়ে পড়ছে মস্ত সব ঢেউ। নিচে তলস্রোত। আমরা পাথরে বাড়ি খেয়ে না মরলে, জোরালো স্রোতের টানে চলে যাব সাগরের মাঝে।'

মৃদু মাথা দোলাল সোহেল। 'দ্বীপে ডক আর পাইলিং আছে। এ ছাড়া, তিন দিকে তিনটে সিঁড়ি। যে-কোনওটা ব্যবহার করতে পারি।'

'বড় বোটের জন্যে তৈরি করেছে কংক্রিটের ওই ডক,' বলল রানা। 'অনেক দূরে দ্বীপের শেষে কংক্রিটের পাইলিং। ওখানে ঢেউ ও স্রোত দুটোই জোরালো। এদিকে সিঁড়ি বেয়ে দ্বীপে ওঠা সহজ হলেও, ধরে নিতে পারিস, ওগুলোর ওপর চোখ রাখবে লো হুয়াং লিটনের লোক।'

'না সাঁতরালে এত ডাইভিং গিয়ার কেন?'

'কাজ শেষে যাতে বেরোতে পারি,' বলল রানা। 'সম্ভব হলে উবোন হিমুরাকে নিয়ে নতুন ভাটার আগেই বেরিয়ে যাব। সহজেই পৌঁছুতে পারব উপসাগরে।'

'তুই বলছিস বেরোবার কথা,' বলল সোহেল, 'আগে বল, ঢুকবি কী করে?'

'তোর মনে হয়নি কেন ধার নিলাম এই বিশেষ বোট?'

'দেখতে সুন্দর। আবার কী!'

'এটার ড্রামে অনেক কেবল। মোটরের টেনে নেয়ার শক্তি প্রচণ্ড। নতুন স্পোর্টসের নাম শুনেছিস— উইংবোর্ডিং? অ্যাড্রেনালিন জাঙ্কিরা দারুণ পছন্দ করে।'

ভুরু কুঁচকে বন্ধুকে দেখল সোহেল। 'উইংবোর্ডিং?'

'প্যারাসেইলিঙের মতই, তবে মাথার ওপরে থাকবে প্যারাশ্যুট, আর পায়ের নিচে ডানা।'

'তুই ভাবছিস উড়ে গিয়ে নামব ওই দ্বীপে?'

'ভাসতে ভাসতে,' বলল রানা, 'বোট চালিয়ে আমাদের দু'জনকে আকাশে তুলে দেবে হিনা। টেনে নিয়ে যাবে দ্বীপের কাছে। তারপর এক বা দেড় মাইল দূরে থাকতে কেবল ছুটিয়ে ভোঁকাট্টা ঘুড়ি হব। সাগরের বাতাস বইছে দ্বীপের দিকে। তাতে ভর করে আকাশ থেকে নামব পেঁচার মত।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'তুই সত্যিই প্যাঁচামুখো। আমি আবার অত্যন্ত সুদর্শন যুবক হলেও মনে হয় না সুন্দরী কেউ থাকবে ওই দ্বীপে। ...তবে ওদের রেইডার থাকলে?'

'আছে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'বহু দিন হলো পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বীপ। কেউ যায় না। লো হুয়াঙের লোক চাইলেও ব্যবহার করতে পারবে না রেইডার বা সার্চলাইট। নইলে চোখে পড়বে কারও না কারও। ওরা নিজেরাই আছে চোরের মত। ধরে নে, ওখানে আছে সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম। গোপন ক্যামেরা আর মোশন ডিটেক্টর। কিন্তু সেসব থাকবে সাগরের দিকে তাক করা। ভেতরে নজর দেবে না কেউ। আমরা আকাশ থেকে নামব গিয়ে দ্বীপের মাঝখানে।'

'ওই দেয়াল টপকে মাঝে গিয়ে নামলাম, তারপর?'

দুটো বিদঘুটে লেন্সের গগল্‌স্ দেখাল রানা। 'এগুলোর ইনফ্রারেড সেন্সর আছে। আকাশ থেকে নামার সময় দ্বীপের চারপাশে চোখ বোলাব। হুয়াঙের লোক থাকলে, সেখানে থাকবে বাতি, বিদ্যুৎ আর ইকুইপমেন্ট। আর তার মানেই তাপ। সেসব না দেখলে বুঝব দ্বীপে মানুষ নেই।'

মৃদু মাথা দোলাল সোহেল। 'নামার সময় তাপের পথ খুঁজব। ওটা হবে হলদে ইঁটের রাস্তার মত।'

'স্ক্যান করব আমি,' বলল রানা। 'তুই হচ্ছিস পাইলট। পৌঁছে দিবি গন্তব্যে। নামবি উঁচু কোনও বাড়ির ছাতে।'

পাওয়ারবোটের স্টার্নে কালো নিয়োপ্রেন সুট পরে বারো ফুটি ডানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও সোহেল। দাঁড়াবার ভাব দেখে কেউ ভাবতে পারে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দুই বন্ধু। সামনে এক পা, অন্য পা একফুট পেছনে বাঁকা করে রাখা। এ ভঙ্গিতে দাঁড়ালে সবচেয়ে বেশি ব্যালান্স পাওয়া যায়।

ওদের কাঁধের স্ট্র্যাপে ঝুলছে ছোট্ট অক্সিজেন বোতল, মুখোশ ও ফিন। সাঁতরে উবোন হিমুরাকে নিয়ে দ্বীপ থেকে বেরোবার সময় কাজে লাগবে ওসব। ওদের দ্বিতীয় কাজ, খুঁজে বের করা কী করছে হুয়াঙের লোক।

পা শক্ত করে গাইড কেবল চেপে ধরল ওরা। একবার উড়ে গেলে ওই কেবল ব্যবহার করে সরবে নানাদিকে। সংক্ষিপ্ত ভিডিয়ো দেখেছে, বুঝে গেছে কীভাবে চালাতে হবে ডানা।

'কঠিন বলে মনে হচ্ছে না,' বলল সোহেল, 'বামে ঝুঁকলে বামে যাবে, আবার ডানে ঝুঁকলে ডানে যাবে।'

'আরও কঠিন হলে তোর ভাল লাগত?' জানতে চাইল রানা।

উদাস হয়ে সাগরের দিকে তাকাল সোহেল।

'আপনাদেরকে কতটা দূরে নেব?' জানতে চাইল হিনা।

আগেই হিসাব করেছে রানা। 'দ্বীপের দুই মাইল আগে। সামান্য টেনে নেবে। তারপর খুলে দেব আমরা কেবল।'

'দুই মাইল?' মাথা নাড়ল হিনা। 'তা হলে তো দ্বীপে যেতে গিয়ে আকাশ থেকে পড়েও যেতে পারেন।'

‘অনলাইনে দেখেছি, বারো ফুট এগোলে গ্লাইডার নামে মাত্র একফুট,’ বলল রানা। ‘কেবল আমাদের তুলে দেবে প্রায় পনেরো শ’ ফুট ওপরে। পেরোতে পারব সাড়ে তিন মাইল। কিন্তু সামনে থেকে আসতে পারে বাতাস, তা ছাড়া আমরা অত দক্ষ নই, কাজেই দু’মাইল আগে থেকে রওনা হব।’

মৃদু মাথা দুলিয়ে জিপিএস রিসিভার দেখে নিয়ে রানা ও সোহেলের দিকে তাকাল হিনা। ‘আপনারা রেডি তো?’

নাইট ভিশন ডিযাইনের গগল্‌স্‌ চেক করল সোহেল। ওটা দেখাবে যে-কোনও আলো। রানা শুধু দেখবে কোথায় আছে তাপ। দ্বীপে পৌঁছে গগল্‌স্‌ পরে কোথায় নামবে ঠিক করবে সোহেল।

কপালের গগল্‌স্‌ দেখে নিয়ে হিনাকে বুড়ো আঙুল দেখাল সোহেল। শক্ত হাতে ধরেছে গাইড লাইন।

একই কাজ করল রানা। ‘খুলে দাও কেবল!’

হুইলে একহাত রেখে ডানের লিভার টানল হিনা।

ক্ল্যাম্প খুলতেই রানা ও সোহেলের পেছনে বেলুনের মত ফুলে উঠল প্যারাসেইল। টানটান হতেই পায়ের নিচে মুরিং থেকে ছুটে গেল কেবল। পরক্ষণে ঝড়ের বেগে ওপরে উঠল ওরা। বোটের পেছনের ড্রাম থেকে বেরোচ্ছে কেবল।

দু’ডানায় ভর করে সাঁই-সাঁই করে উঠছে ওরা। রানা দেখল, দূরে বৈদ্যুতিক আলোয় ভরা ঝলমলে নাগাসাকি শহর। সব পড়ে আছে অনেক পেছনে।

বারকয়েক সাধারণ কৌশল পরীক্ষা করল ওরা। চট্‌ করে সাড়া দিচ্ছে উইংবোর্ড। ওপরের প্যারাসেইলের সঙ্গে কাজ করছে নিখুঁতভাবে। রাতের আঁধারে শীতল হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলেছে ওরা।

‘উড়ে যাওয়া কিছুই না,’ বাতাস ছাপিয়ে বলল সোহেল, ‘তবে কেবল খুলে দেয়ার পর এটাকে চালাতে হবে। ডানা পুরনো বাইপ্লেনের মত। প্যারাসেইল বাতাসে ভরা থাকলে

যেতে পারব যে-কোনও দিকে। কিন্তু গতি কমলে ধুপ্ করে গিয়ে পড়ব সাগর বা মাটিতে।'

মাথার ওপরে প্যারাসেইল দেখল রানা। ওটা দেখতে বাঁকা চাঁদের মত। 'পতন শুরু হলে ব্যবহার করবি ইমার্জেন্সি রিলিয। ডানা খসে পড়লে নামব প্যারাশুটিস্টের মত। দ্বীপে নামা যায় এমন কোনও জায়গা দেখলি?'

'স্যাটেলাইট ইমেজ অনুযায়ী দ্বীপে আছে অন্তত চল্লিশটা বাড়ি,' বলল সোহেল, 'ছাত সব সমতল। মনে হয় না সমস্যা হবে নামতে। আরও কাছে গেলে নামার অ্যাংগেল বুঝে ঠিক করব কোথায় পায়ের ধুলো দেব।'

'তোর নোংরা, ঘেমো, ধাবড়া পায়ের ধুলো লাগার পর আরও বিষাক্ত হয়ে উঠবে ওই দ্বীপ,' মতামত দিল রানা।

চট্ করে মাথায় কিছু না আসায় উদাস হয়ে দ্বীপ দেখল সোহেল।

হাতের ব্যাণ্ডে আটকে রাখা রেডিয়োতে বলল রানা, 'দ্বীপের দিকে চলো। চোখ রাখবে জিপিএস-এর ওপর। দু'মাইল দূরে থাকতে ঝাঁকি দেবে কেবলে। এরপর কেবল খুলে দ্বীপের দিকে যাব আমরা। তখন কেবল গুটিয়ে নিয়ে ফিরবে দ্বীপ আর নাগাসাকির মাঝের সাগরে।'

'ঠিক আছে,' ইয়ারবাডে জানাল হিনা। 'গুড লাক!'

বহু নিচে বামে রানা দেখল ঢেউয়ের সাদা ফেনা।

ওদেরকে টেনে নিয়ে চলেছে পাওয়ারবোট।

পিছু নিয়ে কালো দ্বীপের দিকে উড়ে চলেছে রানা ও সোহেল। নিচে ঝিকমিক করছে রুপালি সাগর। গতি বাড়ালেও ক'মিনিট পর বাঁক নিয়ে অন্যদিকে চলল হিনা।

'কেবলে ঝাঁকি দিয়েছে,' সোহেলকে বলল রানা। নিচে ঠেলল লাল হ্যাণ্ডেল। মুহূর্তে খুলে গেল কেবলের প্রথম গিঁঠ। হ্যাণ্ডেলে দ্বিতীয় মোচড় দিতেই খট্ শব্দে খসে পড়ল কেবল। সাঁই করে ওপরে উঠল প্যারাসেইল, তবে তাতে কমে গেল

এগোবার গতি।

স্নোবোর্ডারদের মত সামনে ঝুঁকল রানা ও সোহেল। আবারও স্বাভাবিক গতি পেল যন্ত্রহীন উড়োজাহাজ। পেছনে পড়ল হিনার বোট। চারপাশে শব্দ বলতে শোঁ-শোঁ হাওয়া। দপ-দপ করছে কানের পর্দা।

'একপাশ থেকে দমকা হাওয়া,' বলল সোহেল, 'সরে যাচ্ছি দক্ষিণে।'

উইংবোর্ডে বামে ওজন চাপাতেই তাল মেলাল প্যারাশুট। যেন পায়ের তলা থেকে খসে পড়বে বোর্ড। তবে দক্ষতার সঙ্গে তৈরি নিচের দু'ডানা। সুন্দরভাবে তাল রাখল ওপরের প্যারাসেইল।

তিরিশ সেকেণ্ড বাতাস বুঝে নিয়ে সরাসরি দ্বীপ লক্ষ্য করে চলল সোহেল। আগে ব্যবহার করেছে উইংসুট বা গ্লাইডার। সেসব ছিল অতি দ্রুত, অথবা ধীর— কিন্তু এই জিনিস দারুণ মজার। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে উড়ছে ওরা মুক্ত পাখির মত।

'যেন আকাশে সার্ফ করছি,' বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসল সোহেল।

মৃদু হাসল রানাও।

'আজ রাতে প্রাণ হাতে নিয়ে দ্বীপ থেকে বেরোতে পারলে, আমার নতুন শখ হবে এটা নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ানো,' বলল সোহেল।

কবজির টাইমার ও আল্টিমিটার দেখল রানা। 'আট শ' ফুট নিচে সাগর, একমিনিট পর পৌঁছুব দ্বীপের ওপর।'

যত কাছে যাচ্ছে, কালো আর বিশাল হয়ে উঠছে দ্বীপ। উঠে আসছে ওদের দিকে। কী যেন ভয়ানক কিছু আছে ওখানে। বাইরের দেয়ালে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। সাদা ফেনা দেখল রানা। আবছা আলোয় পরিত্যক্ত সব বাড়ি যেন প্রেতাত্মার দুর্গ।

'চশমা পরে নে,' বলল রানা। নিজে চোখে আটকে নিল ইনফ্রারেড লেন্স। একই কাজ করল সোহেল। ব্যবহার করছে নাইট ভিশন গগল্‌স্‌। হঠাৎ ওর মনে হলো দ্বীপ ভরে গেছে সবুজ-ধূসর আলোয়। পরিষ্কার দেখল বাড়ির কোনা। মাঝে সরু সব গলি। এখানে ওখানে উঁচু জঞ্জাল।

উনিশ শ' চুয়াত্তর সালে বন্ধ হয়েছে খনি ও বসতি। এরপর দ্বীপের ওপর দিয়ে গেছে কিছু প্রচণ্ড টাইফুন ও সাধারণ শত শত ঝড়।

ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও বহমান কালের অত্যাচারে ধসে পড়ছে পুরনো সব দালান। একটা জানালাতে নেই কবাট। যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। থমথম করছে চারপাশ। নির্জন ও পরিত্যক্ত।

'একপাশ থেকে বাতাস থাকলেও ঠিক দিকেই যাচ্ছি,' বলল সোহেল। 'প্রথম সারির বাড়ি পার হয়ে নামব দ্বিতীয় সারির কোনও বাড়ির ছাতে। সহজেই যেতে পারব দ্বীপের মাঝখানে।'

'ছাতের হাল বুঝেছিস?'

'এখনও না,' বামে ঝুঁকল সোহেল, 'সে তুলনায় এখনও অনেক দূরে।'

দ্বীপের প্রায় কিছুই দেখেনি রানা। চারপাশের সাগরের চেয়ে শীতল কংক্রিট, ফলে অন্ধকারে দ্বীপটাকে মনে হচ্ছে এবড়োখেবড়ো ধূসর গর্তের মত। এখানে ওখানে ছোট কিছু বিন্দু। ওখানে তাপ আছে। তবে আকার দেখে রানা ধারণা করল, ওগুলো ইঁদুর বা পাখি।

'হলদে ইঁটের রাস্তা পেলি?' জানতে চাইল সোহেল।

'না।' স্ক্যান করছে রানা। অসংখ্য বাড়ির মাঝে দেখা যাচ্ছে না জমি। 'সামান্য ডানে সর, পেছনে রাখবি হাওয়া। মাঝের সব গলি দেখতে চাই।'

'কাছে পৌঁছে গেছি বলে বেশি সময় পাবি না,' বলল

সোহেল।

ডানে উইংবোর্ডে ওজন চাপাতেই রাজহংসের অলস ভঙ্গিতে বাঁক নিল ওরা। অসংখ্য বাড়ির মাঝের গলি দেখল রানা। কোথাও কোথাও আবছা আলো। ওসব জায়গার কথা মনে রাখল ও। 'আরও একটু এগোতে পারবি?'

'সময় পাবি দশ সেকেণ্ড,' বলল সোহেল। 'এরপর ঠিক করতে হবে দিক।' মনে মনে ক্ষণ গুনছে। কোনও নড়াচড়া দেখতে নিচে চেয়ে আছে রানা।

'সময় শেষ,' বলল সোহেল। 'এবার বামে ওজন দে।' একইসময়ে বামে ঝুঁকে কন্ট্রোল কেবল টান দিল ওরা। গতি কমিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল দু'পাখার গ্লাইডার। 'সোজা হ।'

গতি বেড়ে যাওয়ায় পেছনে হারিয়ে গেল সাগর। হঠাৎ যেন ওদের বুকের কাছে উঠে এল জীর্ণ সব দালান। ডানার সামান্য নিচে ছাত।

'গতি অনেক বেশি,' সতর্ক করল রানা।

প্যারাশুট টেনে নেয়ায় ওপরে উঠে গতি কমাল গ্লাইডার। তবে সামলে নিতেই আবারও শুরু হলো পতন। সোহেল বুঝল, ওরা নামতে পারবে না বাছাই করা ল্যাণ্ডিং যোনে। হতাশ হয়ে বলল, 'যাহ্, বাড়িঘর পার হয়ে আছড়ে পড়ব পাহাড়ের কাঁধে। বামে গেলে নামব দ্বীপের খোলা জায়গায়।'

পাথুরে প্রাচীরের মত পাহাড়ি চূড়া ও সবচেয়ে উঁচু বাড়ির মাঝের ফাঁকা অংশ লক্ষ্য করে চলেছে উইংবোর্ড। অবাক হয়ে সোহেল দেখল, এখনও থার্মাল ইমেজিং গগল্‌স্‌ পরে তাপ খুঁজছে রানা। এক সেকেণ্ড পর সতর্ক করল সোহেল, 'ডানা সোজা কর!'

একইসঙ্গে ঝুঁকল দু'বন্ধু। পাহাড়ের উঁচু চূড়া আর বামের বাড়ির মাঝে ঢুকবে গ্লাইডার। জায়গাটা গলির মত, ওদের দু'দিকে থাকবে বড়জোর দশ ফুট। কিন্তু হঠাৎ কেবল-এ হ্যাঁচকা টান দিল রানা, 'ফিরে চল!'

‘ফিরব! কেন?’

‘বামে বাঁক নে!’ উইংবোর্ডে কাত হলো রানা। কথাটা মেনে নিজেও তাই করল সোহেল। এক শ’ আশি ডিগ্রি বাঁক নেয়ায় কমল গতি। পরক্ষণে নতুন গন্তব্য লক্ষ্য করে চলল গ্লাইডার।

একটা বাড়ির ছাতের পাশে জন্মেছে মাঝারি গাছ। ওটার ওপরদিকে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল উইংবোর্ড। নামার মত জায়গার জন্যে সামনে তাকাল সোহেল। সরাসরি দু’ শ’ ফুট দূরে চওড়া এক ছাত। কিন্তু ওই পর্যন্ত যেতে পারবে বলে মনে হলো না ওর।

‘আমার দিকে ডানে ঝুঁকে পড়!’ তাড়া দিল সোহেল।

কাত হয়ে ডানে যাওয়ায় আরও কমল উচ্চতা। আগের বাড়ির পাশের এক দালানের ছাতে ধুপ্ করে নামল ওরা। তাতে থামল না গতি। টেনিস বলের মত ড্রপ খেতে খেতে চলেছে ছাতের শেষপ্রান্ত লক্ষ্য করে। দশতলা থেকে মাটিতে পড়লে স্রেফ খুন হবে ওরা। কিন্তু পাখার ডানদিক বেধে গেল সরু এক ভেন্ট-এ। ছিটকে ছাতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিল সোহেল। কোথায় যেন পড়ল নাইট ভিশন গগল্স্। শরীর স্থির হতেই প্রিয় বন্ধু কোথায় দেখতে মুখ তুলে তাকাল ও।

একটু দূরেই উইংবোর্ড। জোর হাওয়ায় আবার উঠতে চাইছে আকাশে। দু’হাতে দড়িদড়া ও সেইল গোছাচ্ছে রানা। মেঝে ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে প্যারাসেইলের অন্যদিক চেপে ধরল সোহেল। কাপড়ে পা চাপিয়ে দেয়ায় বেরিয়ে গেল ভেতরের বাতাস। এখন আর ঘুড়ির মত উড়বে না।

হঠাৎ কেন এত বিপজ্জনক কাণ্ড করেছে রানা, বুঝে গেল সোহেল। মাঝের পাহাড়ের পাশ থেকে আকাশে উঠল কপ্টার। বজ্রপাতের শব্দ তুলে মাথার ওপর দিয়ে গেল ওটা। এখনও কোনও বাতি নেই।

‘পাহাড়ের পাশেই কপ্টারের ইঞ্জিনের তাপ দেখে ওদিকে

যাইনি,' জানাল রানা, 'আরেকটু হলে রোটরে কেটে কিমা হতাম।'

'দেখেছে কি না কে জানে,' যান্ত্রিক ফড়িঙের দিকে তাকাল সোহেল। নাগাসাকির দিকে চলেছে ওটা। 'আমার ব্যাকআপ ল্যাণ্ডিং যোন ছিল ওদের হেলিপ্যাড। ওখানেই বসে ছিল। আমি পাইলট হলে দু'পাশের সরু জায়গার দিকে খেয়াল দিতাম। ভাবতামই না আকাশ থেকে নামবে কিছু।'

'দেখলে ঘুরে আসত,' বলল রানা। 'আয়, গুছিয়ে রাখতে হবে প্যারাশুট।'

প্যারাসেইল ভাঁজ করে গাইড ওআয়্যার দিয়ে পেঁচিয়ে রাখল ওরা। উইংবোর্ড ওপরে তুলল সোহেল, পালের মত কাপড় ওটার নিচে গুঁজল রানা।

বহু দূরে গিয়ে বাতি জ্বেলে শহরের দিকে চলেছে হেলিকপ্টার।

'মনে হয় না দেখেছে,' বলল সোহেল, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, সঙ্গে পুলিশ সুপার হিমুরাকে নিয়ে যায়নি তো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখানে এনে আবারও অন্য কোথাও নেয়া অর্থহীন। ওরা এসেছিল দলের লোক নামাতে। কারও চোখে পড়বে, সে ভয়ে সময় নষ্ট করেনি পাইলট। ধরে নে, এ দ্বীপেই আছেন হিমুরা। আর সঙ্গে পাবি তোর প্রিয় কমোডো-দোস্ত ওরে চিচিওয়াকে।'

'শয়তানটা মরুক কমোডো ড্রাগনের গরম পেটে গিয়ে,' বিড়বিড় করল সোহেল।

পঁয়তাল্লিশ

হাশিমা দ্বীপে প্রায় ধসে পড়া এক বাড়ির ভেতর জানালায় দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টার চলে যেতে দেখছে ওরে চিচিওয়া। যান্ত্রিক ফড়িঙে চেপে চলে যেতে পারলে খুশি হতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়। ওসব তলোয়ার আসল, তা প্রমাণ হলে তখন টাকা পাবে সে।

এসব তলোয়ার খাঁটি, ভাবছে ওরে। ওগুলোর জন্যে কম পরিশ্রম করেনি সে, খুন করেছে তিন পুলিশ অফিসার আর ডযনখানেক শিনটো সাধুকে।

হাতের তলোয়ার দেখল চিচিওয়া। চকচক করছে হঞ্জো মাসামিউনে। মন্দিরের প্রধান সাধু মরার আগে শপথ করে বলেছে, এটাই সেই অস্ত্র। তবে নিশ্চিত নয় ওরে। আলো পড়লেই সোনালি ঝিলিক দিচ্ছে হালকা অস্ত্রটা।

চারপাশে ভাঙা কংক্রিটের জঞ্জাল ও দেয়ালে বেড়ে উঠেছে সাপের মত সবুজ লতাগাছ। আকাশে জমছে ঘন মেঘ। যে-কোনও সময়ে শুরু হবে ঝড়। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলেই সে-আলো প্রতিফলিত করছে তলোয়ারটা।

গুজব আছে, তৈরির সময় দামি সবুজ রত্নের গুঁড়ো অস্ত্রের ফলায় মিশিয়ে দিয়েছিলেন মাসামিউনে। অবশ্য ওরের ধারণা, এটা স্রেফ বাজে কথা। ধাতুর সঙ্গে পাথর মেশালে বারোটা বাজবে সে তলোয়ারের। তবে এ-ও ঠিক, ইস্পাতের চেয়ে বেশি ঝিকমিক করছে জিনিসটা।

ওরের পেছনে খুলে গেল দরজা। গলা বাড়িয়ে দিল হুয়াঙের বিজ্ঞানী সাবা সাবেলা। তাকে দেখলেই ওরের মনে হয়, একটা মস্তবড় ধেড়ে ইঁদুর, উঁকি দিচ্ছে গর্ত থেকে।

'আমার সঙ্গে চলুন,' বলল সাবেলা, 'মিস্টার হুয়াং বলেছেন সবাইকে থাকতে হবে ভেতরে।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ওরে। বেশ ক'বছর থেকেছে জেলখানায়, তাই বদ্ধ জায়গা ভাল লাগে না। তা ছাড়া, দরদর করে ঘামছে। আবারও ফিরে আসছে জ্বর। খেতে হবে আরও শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক। 'তুমি যাও, আমি বাইরেই থাকব।'

'ঠিক আছে, থাকুন, তবে তলোয়ারটা দিন। ল্যাবে পরীক্ষা করতে হবে ওটা।'

হাতে তলোয়ার না দিয়ে ভিতু ইঞ্জিনিয়ারের বুক লক্ষ্য করে ওটা বাড়াল ওরে। আরেকটু হলে গাঁথত পাঁজরে। 'পরে পাবে। আগে টাকা চাই।'

চমকে পিছিয়ে গেছে সাবেলা। চোখে ভয় নিয়ে ওরেকে দেখল। পেছনে কাঠের দরজা বন্ধ করে নেমে গেল ওদিকের সিঁড়ি বেয়ে।

আবারও চারপাশে তাকাল ওরে। দূরে দেখা যায় না এ ঘর থেকে। চারপাশে শুধু পুরনো, ভাঙাচোরা কংক্রিটের বাড়ি। একটু দূরেই ন্যাড়া পাহাড়ের এখানে ওখানে গর্ত। এখন আর কয়লা নেই। সবই পরিত্যক্ত।

আসন্ন বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ পেল। খারাপ লাগছে শরীর, জ্বর ছেড়ে গেলে ভাল লাগবে। বিরক্তি নিয়ে আঁধারে হেলিপ্যাডের দিকে চলল সে।

হাশিমা দ্বীপের ছত্রিশ নম্বর বাড়ির রেলিংহীন ছাতে শুয়ে ইনফ্রারেড গগল্‌স্ পরে চারপাশ দেখছে রানা। ডানে পাহাড়, বামে নয়তলা বাড়ি। ওরা যে বাড়িতে আছে, সেটার কয়েক তলা নিচে কংক্রিটের সেতু সরাসরি গেছে পাশের বাড়িতে।

আলোর কোনও চিহ্ন নেই পাহাড়ে।

নিচে কংক্রিট সেতুর ওদিকের বাড়িতে একটার ওপর একটা ফাঁকা ঘর, যেন সব প্রাচীন আমলের গুহা।

ক্রল করে রানার পাশে থামল সোহেল।

ওর দিকে তাকাল রানা। 'গগল্‌স্‌টা খুঁজে পেলি?'

'না,' মাথা নাড়ল সোহেল, 'বোধহয় পড়ে গেছে ছাত থেকে।'

'আমরা নিজেরা পড়িনি সেটাই কপাল।'

'ঠিক,' বলল সোহেল। 'কিছু দেখলি?'

'ওদিকে গোল জায়গায় ঘাস,' বলল রানা, 'তাপ আছে, কারণ গত দু'ঘণ্টা ওখানে বসে ছিল হেলিকপ্টার।'

'যাত্রীদের কাউকে দেখেছিস?'

'না। তাপ বেরোচ্ছে না কোনও ভেন্ট বা দরজা থেকে। আঁধার সব বাড়ি।'

'হলদে ইঁটের রাস্তা আর পেলি না,' বলল সোহেল।

বাড়ি স্ক্যান করবে রানা, তখনই পড়তে শুরু করল কাঠবাদামের সমান সব বৃষ্টির হিমঠাণ্ডা ফোঁটা। আকাশের দিকে তাকাল দুই বন্ধু। ঘন হয়ে জমেছে ধূসর মেঘ, বোধহয় একাধারে ঝরাবে সারারাত। নতুন করে বাড়িগুলো স্ক্যান করতে লাগল রানা। পাশে শুয়ে ভিজছে সোহেল।

চারপাশের সারি সারি বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল কয়েক দশক আগে। সবই এখন কংক্রিটের কঙ্কাল। কোনও গলি এতই সরু, সাইকেল চালানোও কঠিন। নানাদিক গলি মিশেছে অন্যগুলোর বুকে। জায়গায় জায়গায় ধসে গেছে দু'পাশের বাড়ির দেয়াল। খাঁ-খাঁ করছে ফাঁকা ঘরগুলো।

কোনও বাড়িতে হুয়াঙের লোক থাকবে, ভেবেছিল রানা। বলল, 'যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা এসব বাড়ির। কে বলে বাংলাদেশের কন্ট্রাক্টররা খারাপ— এদের কাছে দশ-শূন্য গোলে হেরে ভূত হয়ে যাবে। ডেমোলিশন টিম

কয়েক ঘণ্টাতেই ধসিয়ে দিতে পারবে গোটা শহর।'

'তাও লাগবে না,' বলল সোহেল, 'এমনিতেই ধসে গেছে অর্ধেক বাড়ি।'

হঠাৎ একটা চিন্তা আসতেই বলল রানা, 'আমি বোধহয় জানি ওরা কোথায় আছে।'

'কাউকে দেখলি?'

'না। তবে এ দ্বীপে এলে এসব বাড়িতে থাকতি তুই? যে-কোনও সময়ে মাথার ওপর নামবে ছাত। তা ছাড়া, ঝড় আর বৃষ্টির ভেতর রয়ে যেতি?'

মৃদু হাসল সোহেল। 'না থাকতাম না। তুই ভাবছিস ওরা নেমে গেছে খনির ভেতর?'

মাথা দোলাল রানা। 'কয়েক দশক আগে দ্বীপ থেকে কয়লা তুলত। ওই খনিতে আছে সুড়ঙ্গের মুখ। ভেতরে থাকবে ঘরের মত বড় গুহা। ভিজতে হবে না।'

'শুনে ভালই তো লাগছে,' বলল সোহেল, 'চল, যাই।'

প্রথম সিঁড়ি ওরা পেল বাড়ির বাইরে— ফায়ার এস্কেপ। লোহার, বাজেভাবে ক্ষয়ে গেছে হলদেটে জং-এ। কয়েক তলা নিচে সিঁড়ি, সেটাও ধসে পড়েছে গলিতে।

রানা ওপরের ধাপে পা দিতেই ভীষণ ক্যাঁচকোঁচ শব্দে দুলে উঠল গোটা সিঁড়ি। 'ওজন নেবে না।'

'অন্য কোনও সিঁড়ি চাই,' বলল সোহেল।

একটু এগোতেই ওরা দেখল সামনে ধসে গেছে ছাত। কংক্রিটের চাপড়া ঢালু হয়ে নেমেছে নিচের মেঝেতে। ওটা র‍্যাম্পের মত। বৃষ্টিতে ভেজা, পিচ্ছিল। সাবধানে স্ল্যাবে বসে সরসর করে নেমে এল ওরা।

বাড়ির ভেতর স্যাঁতসেঁতে ও পূতিগন্ধময়। ছাতের শত শত ফাটল থেকে টপটপ করে ঝরছে বৃষ্টির ফোঁটা। এখানে ওখানে লতাগাছ ও ছোট ঝোপ। কয়েক ইঞ্চি কাদার নিচে ঢাকা পড়েছে মেঝে।

আঁধার বাড়িতে কাজ করবে না ইনফ্রারেড গগল্‌স্। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সিঁড়ি পেল ওরা। দুটোতলা নামার পর পেল করিডোর। ওটা গেছে সেতুর দিকে। ওদিক দিয়ে হয়তো যেতে পারবে পাশের বাড়িতে।

সেতুর মুখে গিয়ে থামল রানা। 'সিঁড়ি বেয়ে নামলে হয়তো কারও চোখে পড়ব না।'

একটা ঝোপ এড়িয়ে রানার পাশে থামল সোহেল।

অজস্র সরু ফাটল সেতুর বুকে। গোটা কাঠামো ধসে পড়বে যে-কোনও দিন। সাবধানে সেতু পেরিয়ে ওদিকের বাড়িতে ঢুকল রানা। হাতের ইশারা করল। পা টিপে টিপে সোহেল পৌঁছে যেতেই ফিসফিস করল, 'ভুল ভেবেছি।'

'কী ভুল?' ভুরু নাচাল সোহেল।

হাতের ইশারায় পাহাড় দেখাল রানা। 'ওখানে পাহারা দিচ্ছে হুয়াঙের লোক। দু'জন। আমরা নামলেই দেখবে।'

বৃষ্টির মাঝে পায়চারি করে পাহারা দেয়া বিশ্রী অভিজ্ঞতা, এ কথা বলবে যে-কেউ। লো হুয়াঙের লোকদু'জনও ব্যতিক্রম নয়। তবে কাজটা ভাল না লাগলেও তাদের উপায় নেই। মাঝের টিলায় উঠছে তারা। ওপরের উঁচু চূড়া থেকে দেখবে গোটা দ্বীপের চারপাশ।

ঝোপঝাড়ে ভরা টিলা। ওঠা কঠিন। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে প্যাচ-প্যাচ করছে মাটি। একবার পিছলে কয়েক শ' ফুট নিচে গিয়ে পড়লে খুন হবে। কাজেই খুব সাবধানে চূড়ায় উঠল তারা।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে?' জানতে চাইল দলনেতা।

মাথা নাড়ল অন্য লোকটা। 'বোধহয় নষ্ট হয়েছে আমার ইকুইপমেন্ট।' চোখ থেকে নাইট ভিশন গগল্‌স্ খুলল। 'খালি দপ-দপ করছে।'

রেইন কোটের হুড মাথায় টেনে নিল দ্বিতীয়জন। তাদের

আছে নাইট ভিশন গগল্‌স্। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে ঠিকভাবে কাজ করছে না ওগুলো। সব পানির মতই আলো পড়লে বিচ্ছুরণ ঘটায় বৃষ্টির ফোঁটা, যেন ক্যালাইডোস্কোপ।

গগল্‌স্‌টা নিয়ে পরখ করল দলনেতা। ফেরত দিল সঙ্গীর হাতে। 'রেযোলিউশন কমাও।' নিজেও একই কাজ করল সে। দূরে বিদ্যুতের ঝিলিক বড় সমস্যা। গগল্‌স্-এ বিশেষ সার্কিট আছে বলে অন্ধ হবে না তারা। কিন্তু বিজলির ঝিলিক প্রতিবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিচ্ছে।

'খামোকা বৃষ্টির ভেতর পাঠাল কেন?' জানতে চাইল কমবয়সী গার্ড। পরে নিল গগল্‌স্। মাথায় টেনে নিল রেইন কোটের হুড।

'কারণ, বস্ চান তোমরা যেন ঠিকমত পাহারা দাও,' বলে উঠল তৃতীয় কেউ।

ঘুরে দাঁড়াল হুয়াঙের দুই গার্ড, কিন্তু তখনই তাদের একজনের মাথার তালুতে সজোরে নামল মোটা এক ডাল। অন্যজনের পেটে গেঁথে গেল প্রচণ্ড এক ঘুষি। পরক্ষণে খুব জোরে ঠুকে দেয়া হলো দু'জনের মাথা। জ্ঞান হারিয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ল তারা।

একটু পর চেতনা ফিরতেই দেখল, মোটা গাছের কাণ্ডে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে তাদেরকে। অস্ত্র, রেইন কোট বা নাইট ভিশন গগল্‌স্ নেই। তাদেরই রুমাল গুঁজে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। আশপাশে কেউ নেই।

হুয়াং লিটনের গার্ডদের রেইন কোট পরে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছে রানা ও সোহেল। ইনফ্রারেড গগল্‌স্ দিয়ে রানা দেখল, এখনও তাপ আছে হেলিপ্যাডে। তবে বৃষ্টির কারণে ক্রমেই শীতল হয়ে আসছে চারপাশ।

ল্যাণ্ডিং এরিয়ার পাশের দেয়াল দেখল রানা। পাহাড়ের গায়ে ওখানে কয়েকটা গুহামুখ। সবই ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ।

খালি চোখে অন্যরকম মনে হলেও হিট সেনসেটিভ গগল্সের কারণে দেখছে চকচক করছে লালচে রঙ।

‘মাঠের ওদিকে বামে শাফট,’ বলল রানা, ‘ওদিক দিয়ে ঢুকতে হবে।’

‘কেউ আসার আগেই, চল্, ঢুকে পড়ি।’

গগল্স্ কপালে তুলে দৌড়ে খোলা জমি পেরিয়ে সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছুল ওরা। সেঁটে গেল একদিকের দেয়ালে। রানার পাশ থেকে উঁকি দিল সোহেল। গগল্সের জন্যে সময় লাগল না ওদের বুঝতে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরোচ্ছে তাপ।

আকাশের দিকে তাকাল সোহেল। ঝরঝর করে ঝরছে হিমঠাণ্ডা বৃষ্টি। ‘ভেতরটা গরম আর শুকনো।’

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

নিঃশব্দে সুড়ঙ্গের গভীরে চলল ওরা।

দ্বীপ ঘুরে দেখছে ওরে চিচিওয়া। পায়ের নিচে মাটি হয়ে উঠেছে কাদাটে। আগে কখনও এত আবর্জনা ও জঞ্জাল ভরা স্বর্গ দেখেনি ওরে। মুখে বলে শেষ করতে পারবে না, কী অপূর্ব এই দ্বীপ। প্রায় ধসে পড়া বাড়িগুলো যেন ওকে মিষ্টি কণ্ঠে বলছে: ওহে, রয়ে যাও এখানে। দারুণ মজা পাবে।

মানুষগুলো মরলে পৃথিবী এমনই হবে, ভাবছে ওরে। মানুষের সব চিহ্ন মুছে দিতে প্রকৃতির বেশি সময় লাগবে না। এটাই তো হওয়া উচিত!

উঁচু বাঁধ বা দেয়ালের কাছে যেতেই বাড়ল হাওয়ার বেগ। যে-কোনও সময়ে শুরু হবে ঝড়। যথেষ্ট দেখেছে ভেবে ল্যাবের দিকে চলল ওরে। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ করেই থেমে গেল।

কী যেন চকচক করছে সামনের জঞ্জালের ভেতর। ক'সেকেণ্ড দাঁড়াবার পর ওদিকে পা বাড়াল সে। আলো আছে ওই জঞ্জালে। নিভে আবারও জ্বলছে।

সামুরাই তলোয়ার ব্যবহার করে ঝোপের কয়েকটা ডাল কাটল ওরে। জায়গাটা পরিষ্কার হতেই ভালভাবে দেখল মাটি। ওখানে আবর্জনার ভেতর পড়ে আছে লো পাওয়ারের একটা এলইডি স্ক্রিন।

ঝুঁকে জঞ্জালের মাঝ থেকে ওটা তুলে নিল ওরে। দেরি হলো না চিনতে। ভাঙা নাইট ভিশন গগল্‌স্ একটা। খসে পড়েছে সামনের প্লেট। ফাটল ধরেছে স্ক্রিনে। তবে কাজ করছে এখনও। আঁধারে এই জিনিস ব্যবহার করে মিলিটারি আর পুলিশের লোক।

চারপাশে তাকাল ওরে। ভাবছে, এবার বুকে বিঁধবে বুলেট। অথবা হামলা হবে ওর ওপর। কিন্তু আশপাশে নেই কেউ। আর যাই হোক, আকাশ থেকে পড়েনি এই হাই-টেক ডিভাইস!

ঝমঝম আওয়াজে পড়ছে বৃষ্টি। ঘোলাটে কুয়াশা ঘিরে রেখেছে পাশের ভাঙাচোরা বাড়িটাকে। ঝট্ করে ওদিকে তাকাল ওরে। বহু ওপর থেকে পড়েছে গগল্‌স্। ভেঙে তুবড়ে গেছে একপাশ। ঘষা খাওয়ার দাগ। আরেক দিক অক্ষত। খুঁজে দেখল ওরে, ধারেকাছে নেই গগল্‌সের ভাঙা টুকরো।

সত্যিই বোধহয় আকাশ থেকেই পড়েছে জিনিসটা!

ভাঙা গগল্‌সের সুইচ অফ করল ওরে। ওটা বেল্টে গুঁজে খুঁজতে লাগল কোন্ পথে উঠবে বাড়ির ছাতে।

ছেচল্লিশ

ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকছে রানা ও

সোহেল। সুড়ঙ্গের মেঝেতে কেউ তৈরি করেছে নিচু বাঁধ, কিন্তু ওটা টপকে বৃষ্টির পানির ধারা কিছুদূর গিয়ে পড়ছে খাড়া এক শাফটের মধ্যে। পাশের দেয়ালেই এলিভেটর, তবে মনে হলো না কেউ ব্যবহার করে।

'কয়েক বছরে ব্যবহার হয়নি,' মন্তব্য করল সোহেল।

জবাব না দিয়ে ইনফ্রারেড স্কোপ দিয়ে খাড়া শাফট দেখল রানা। 'ওদিকে তাপ নেই। নিচে নেই ওরা। আরও এগোতে হবে।'

সুড়ঙ্গের আরও ভেতরে যাওয়ার পর প্রথমবারের মত ওরা দেখল আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন। ছাতে পুরনো কেবলের বদলে নতুন তার। জ্বলছে কম ওয়াটের এলইডি বাল্‌ব্।

সামনে দু'ভাগ হয়েছে সুড়ঙ্গ। ইনফ্রারেড গগল্‌স্ ব্যবহার করে মেঝে দেখল রানা। পায়ের ছাপে রয়ে গেছে মৃদু তাপ। বেশিরভাগ লোক গেছে বামে।

ওদিকেই চলল রানা।

ওর বাহু স্পর্শ করল সোহেল। 'ভুল করছিস না তো?'

'হলদে ইঁটের রাস্তা,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আছি ব্যস্ত পথে।'

ওর কথাই ঠিক। আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে এক শ' গজ যেতেই দেখল প্লাস্টিকের কোট দেয়া দু'কবাটের ট্রিপল-সিল ডোর। আগেরজনের রেখে যাওয়া তাপ জ্বলজ্বল করছে হ্যাণ্ডেলে।

গগল্‌স্ খুলে বলল রানা, 'আধুনিক করেছে পুরনো খনি।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'মনে হচ্ছে না আমাদেরকে দেখলে খুব খুশি হবে এরা।'

দরজার হ্যাণ্ডেল পরখ করল রানা। নিচু গলায় বলল, 'লক করা নেই। চল, ভেতরে ঢুকে দেখি।'

পাহাড়ে হুয়াঙের দু'গার্ডের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলের সেফটি অফ করল দুই বন্ধু। বামহাতে খুব ধীরে হ্যাণ্ডেল

ঘোরাল রানা। ক্লিক আওয়াজে খুলে গেল ল্যাচ। দরজা খুলতেই ভেতর থেকে এল সামান্য বাতাস। ঘরে রয়েছে পযিটিভ প্রেশার।

রানা দরজা আরেকটু খুলতেই ঘরে পিস্তল তাক করল সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, কেউ নেই। 'ভেতরে ঢুকে দেখি কী আছে।'

সোহেলের পিছু নিল রানা। কাভার করছে বন্ধুকে। আরেক হাতে প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করল পেছনে দরজা। ঘরে নানান ইকুইপমেন্ট। বেশিরভাগই বল্টু মেরে আটকে দেয়া হয়েছে মেঝেতে। কয়েকটা তাকে বেশকিছু অঙ্গ। সবই রোবটের। জাইরো, সার্ভো, হাত ও পা।

'শালাদের মাথা কই?' বিড়বিড় করল সোহেল। 'রোবট নিয়ে খেপে উঠেছে লো হুয়াং! শালার নিজেরই মাথার ঠিক নেই। রোবট আর ওই জিনিস পাবে কই!'

'নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখ্,' পরামর্শ দিল রানা।

তাকের অঙ্গগুলো দেখছে সোহেল।

ঘরের আরও ভেতরে ঢুকল রানা। পেয়ে গেল হাই-টেক থ্রি-ডি প্রিন্টিং মেশিন। একটু আগে ব্যবহার হয়েছে বলে এখনও গরম।

কণ্ট্রোল প্যানেলের ছোট্ট স্ক্রিনে ট্যাপ করল রানা। ফুটে উঠল কয়েকটা অক্ষর আর ফাঁকা জায়গা। চাইছে পাসওঅর্ড। সময় নষ্ট না করে অন্যদিকে মন দিল রানা।

থ্রি-ডি প্রিন্টারের পাশের টেবিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালু। চাদর দিয়ে ওখানে ঢেকে রাখা হয়েছে একটা দেহ। রানা চাদর টেনে সরাবার সময় ভাবল, ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে উবোন হিমুরার লাশ। কিন্তু তা নয়। টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে মানুষের আকৃতির অর্ধেক তৈরি একটা রোবট। চেহারা নেই, শরীরের প্যানেল নেই, আছে শুধু কাঠামো, একগাদা তার ও শক্তিশালী ব্যাটারি। রোবটের বুকে আছে একটা ব্লাডার আর

তরল ভরা রিযার্ভয়ার।

দুটো রোবটিক হাত এনে সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'কাজের আরও দুটো হাত পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবি?'

জবাব দিল না রানা।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে তো দেখছি না!'

টেবিলের অর্ধ তৈরি রোবটের ওপর চাদর টেনে ঘরের পেছনে চলল রানা। ওদিকের দেয়ালে রয়েছে ঘোলা একটা বড় কাঁচ। ইনফ্রারেড স্কোপ চোখে পরে ওদিকটা দেখতে চাইল ও। পেল শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের তাপের প্রতিফলন।

গগল্‌স্ খুলে মুখের দু'পাশে হাত রেখে কাঁচে চোখ ঠেকাল রানা। তাতেও দেখা গেল না কিছু। শুনল কীসের যেন আওয়াজ। মৃদু কাঁপছে কাঁচ। ওর মনে হলো, পাশের ঘরে নিচু গলায় কথা বলছে কয়েকজন। সোহেলকে হাতের ইশারায় ডাকল। 'শুনতে পেয়েছিস?'

কাঁচে কান পাতল সোহেল। 'আলাপ করছে?'

'বারবার একই কথা,' বলল রানা, 'প্রার্থনা করা বা মন্ত্র পড়ার মত।'

'উবোন হিমুরার বদলে আমি হলে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনাই করতাম,' বলল সোহেল।

দরজা খুঁজতে শুরু করে রানা দেখল, একটা প্যানেলে আছে স্প্রিং লোডেড ম্যাগনেটিক ল্যাচ। একবার ওটাতে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। বাড়ল গলার আওয়াজ। ওদিকের প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকল রানা। এখানেও মেডিকেল টেবিলে অর্ধেক তৈরি রোবট। তবে ঘরের পেছনে আছে হাই-ডেফিনেশন স্ক্রিনের সামনে দুই লোক। স্ক্রিন দেখছে আর বলছে বারবার একই কথা।

পিস্তল হাতে এগোল সতর্ক রানা। তবে ওকে পাত্তা দিল না লোকদুটো। একপাশ থেকে দেখে রানার মনে হলো,

ঘোরের ভেতর আছে তারা।

দেয়ালে বাতির সুইচ পেয়ে লোকদু'জনের দিকে পিস্তল তাক করল রানা। থমকে গেল বাতি জ্বালতে গিয়েও। মনে পড়েছে, লো হুয়াঙের নাগাসাকির ফ্যাক্টরিতে ইংরেজিতে এ কথা নিজেই বলেছিল ও।

স্ক্রিনের লোকটা বলল, 'জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না।'

'জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না,' আবৃত্তি করল দুই লোক।

বাতি জ্বেলে দিল রানা। নড়ল না লোকদু'জন। আগের মতই বলছে একই কথা। তাদের সামনে গিয়ে থামল রানা। লোকদু'জন দেখতে একইরকম। মাথায় ক্রু-কাট চুল। চোখের মণি কুচকুচে কালো। গালে তিন দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

রানার মনে হলো, আয়নার দিকে চেয়ে আছে ও।

দুটো আয়না!

নিজের রোবটিক সংস্করণ দেখছে ও!

প্রায় ধসে পড়া বাড়ির দশতলায় উঠে থামল ওরে চিচিওয়া। চারপাশে আবর্জনা ও জঞ্জাল। ভেঙে র‍্যাম্পের মত ছাত নেমেছে মেঝেতে। মাঝের ফাঁকা অংশে দেখা যাচ্ছে আকাশের মেঘের ধূসর রঙ। ওই ঢালু স্ল্যাব বেয়ে ছাতে উঠল ওরে। ভিজছে বৃষ্টিতে। সতর্ক চোখে দেখল চারপাশ।

মিলিটারি বা পুলিশের প্যারাশুট বা ইকুইপমেন্ট নেই ছাতে। ধরে নেয়ার কারণ নেই দ্বীপে গোপনে এসেছে কেউ। কিন্তু আবছা আলোয় কালচে ছাতে কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল চওড়া, সাদাটে কিছু।

ওটা বারো ফুটি ডানার মত। হয়তো পড়েছে বিমান থেকেই, তবে অক্ষত। ডানার নিচে গুঁজে রাখা হয়েছে প্যারাসেইল।

‘মাসুদ রানা,’ বিড়বিড় করল চিচিওয়া। ঘুরেই দৌড়ে স্ল্যাবের কাছে পৌঁছুল সে। পিছলে স্ল্যাব বেয়ে নেমে এল নিচের মেঝেতে। দৌড় দিল নিচতলায় নামতে। শুনতে পেল লো হুয়াঙের অগ্রসরমাণ হেলিকপ্টারের গর্জন। ছোটার গতি আরও বাড়ল ওরের। খালাতো ভাইকে সতর্ক করতে হবে, নইলে সর্বনাশ ডেকে আনবে মাসুদ রানা!

সাতচল্লিশ

নিজের বলা কথা বিস্ময় নিয়ে শুনছে রানা।

‘জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না।’

ওরই কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে না রেকর্ড করা মেসেজ। ও নিজে বললে আবারও ঠিক এভাবেই বলত।

স্ক্রিনের ভিডিয়ো বদলে যাওয়ায় রানা দেখল, চিনের সঙ্গে জাপানের উষ্ণ সম্পর্কের বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী।

‘এসব আপনার ফালতু কথা,’ একইসঙ্গে বলল রানার নকল দুই রোবট।

এবারে কণ্ঠ উত্তেজিত। বিশেষ করে প্রথম রোবটের। কথার ভেতর স্পষ্ট টিটকারি। মনিটরে আবারও বলা হলো একই কথা।

‘এসব আপনার ফালতু কথা,’ আবারও বলল দুই রোবট। এখন আরও নিখুঁত। কণ্ঠ যেন রানারই।

‘এ-দুটোকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করছে,’ বলল রানা।

'আরও ভাল হতো প্রোগ্রাম করে দিলে,' বলল সোহেল, 'নিখুঁতভাবে কাজ করত হিমুরার পুলিশ স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্টের মত।'

'যে-কেউ বুঝবে ওটা মেশিন,' বলল রানা। 'কিন্তু এরা কথা বলছে মানুষের মত। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়ছে ঠোঁট। পিটপিট করছে চোখ। এমন কী ঘামছে। আমি এখানে না থাকলে তুই ভাবতি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে যমজ রানা।'

'তা ভাবতাম না, দেখতে তোর চেয়ে ওরা ঢের ভাল,' বলল সোহেল। 'তবে অবাক লাগছে, প্রোগ্রাম করার সময় কেউ নেই কেন!'

সারি সারি কমপিউটার টার্মিনাল দেখাল রানা। দপ-দপ করে জ্বলছে ছোট সব সবুজ বাতি। 'মনিটরিং করছে এসব কমপিউটার। মেশিন ট্রেনিং দিচ্ছে অন্য মেশিনকে। বিরাম নেই। কীভাবে মানুষের মত আচরণ করতে হবে, সেটা রোবট শিখে না যাওয়া পর্যন্ত চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর তারপর...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশের ঘরে গেল দুই রোবট। পিছু নিল রানা।

এদিকের ঘর সিমুলেটর। হুয়াঙের ফ্যাক্টরিতে এমন একটা আছে, তবে বড়। এখানে জায়গা কম বলে বাঁকা দেয়ালে রেখেছে কম স্ক্রিন। ওই আলোয় দেখা গেল চারপাশ।

সোহেলকে স্ক্রিন দেখাল রানা। 'ওটা জয়েন্ট ট্রেড প্যাভিলিয়ন। হুয়াঙের পয়সায় তৈরি। আগামীকাল সকালে ওখানে চিনের সঙ্গে নতুন সহযোগিতা চুক্তিতে সই করবেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। ওটা নিয়েই গুঞ্জন তুলেছে পৃথিবীর রাজনৈতিক সমালোচকরা।'

'আর এরপর আমেরিকার সঙ্গে জাপানের ডিফেন্স ট্রিটি বাতিল করতে ভোট হবে জাপানিস পার্লামেন্টের অধিবেশনে,'

বলল সোহেল। 'ভোটের ফলাফল আমেরিকার বিপক্ষে গেলে হাত কামড়াবে ওই দেশের বর্তমান স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট।'

ট্রেডমিলে উঠে হাঁটছে দুই রোবট। অন্যরকম হয়ে গেল চারপাশের ভার্চুয়াল পরিবেশ। যেন পেছনের কোনও দরজা দিয়ে মেইন হলে ঢুকেছে রোবটদুটো। ভার্চুয়াল ভিড়ের সামনে জায়গা করে নিল তারা। মঞ্চে উঠলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও চিনের রাষ্ট্রদূত। রয়েছে ডিজিটাল হুয়াং লিটন। তার কারণেই সম্ভব হচ্ছে এই চুক্তি। উষ্ণ হয়ে উঠছে দুই দেশের সম্পর্ক।

করমর্দন শেষে চুক্তিতে সই করতে বসলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও চিনের রাষ্ট্রদূত। চিনের দূত দেশের পক্ষ থেকে চুক্তির ডানে সই করে কলম বাড়িয়ে দিলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রীর দিকে। এবার চুক্তিতে সই করবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনসময় ঝট করে এগোল দুই রানা। কোটের পকেট থেকে নকল পিস্তল নিয়েই তাক করল ভদ্রলোকের বুকে।

'জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না!' চিৎকার করে বলল দুই রানা রোবট। পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

গুলির আওয়াজ পেল না রানা ও সোহেল। এমন কী নেই সিমুলেট করা আওয়াজ। তবে ট্রিগার টিপে দেয়ায় স্ক্রিনে ফুটল লাল কিছু বিন্দু। সিস্টেম রেকর্ড করেছে, বুকে গুলি খেয়ে মারা গেছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী, চিনা দূত এবং আরেক রাজনৈতিক নেতা। তাদের কাজ শেষ হতেই ঘুরে ছুট দিয়েছে দুই রোবট।

কাজ শেষ করল সিমুলেটর। শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দুই রোবট রানা।

স্ক্রিনে এল নতুন দৃশ্য। ওটা কোনও হোটেল লবি। চেয়ারে পায়ে পা তুলে বসে আছে দুই রোবট, নির্বিকার। বোধহয় অপেক্ষা করছে কারও জন্যে। পাশের টেবিল থেকে নিয়ে চোখের সামনে পত্রিকা ধরল একজন। কয়েক সেকেণ্ড পর জিভের লালা আঙুলে নিয়ে ওল্টাল পত্রিকার পাতা।

'ঘটনা তো মারাত্মক!' বলল সোহেল, 'এটা পরিষ্কার,

আমরা এসেছি এ দেশে নুমা বা আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে। হুয়াং ওই হত্যাযজ্ঞ ঘটালে সবাই ভাববে তুই ছিলি আমেরিকার সিক্রেট এজেন্ট। জাপান বাতিল করবে নিরাপত্তা চুক্তি, সে ভয়ে তোকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খুন করিয়েছে সিআইএ বা নুমা। নিজেরা খুন হলেও আমরা বাঙালি বলে বাংলাদেশের ওপর খড়্গ তুলবে আমেরিকা। জাপান সবচেয়ে বেশি সহায়তা দেয়, ভীষণ খেপে যাবে তারা, ফলে সবদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের দেশ।'

মাথা দোলাল রানা। 'ফ্যাক্টরিতে আমার কথা রেকর্ড করেছিল হুয়াঙের লোক। সেসব থেকে তৈরি করেছে এই প্রোগ্রাম।'

'জাপান-চিন হয়ে উঠবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর তাদের শত্রু হয়ে উঠবে আমেরিকা,' বলল সোহেল। 'তাতে ভবিষ্যতে তিন দেশ মিলে যুদ্ধে জড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু এই ল্যাব ধ্বংস করলে কিছুই করতে পারবে না,' বলল রানা।

'কিন্তু তা করতে দেয়া হবে না,' অন্ধকার থেকে বলে উঠল কে যেন!

কথাটা এসেছে ঘরের দরজার কাছ থেকে। কণ্ঠস্বর লো হুয়াং লিটনের।

ঘুরে তাকাল রানা। দরজার কাছে কেউ নেই। কথা এসেছে দেয়ালের স্পিকার থেকে। সোহেলের পেছনে খুলে গেল গোপন দরজা। ছুটে ঢুকল তিনজন। ঘরের আরেক দিকের দরজা খুলে এল আরও দু'জন লোক।

সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সময় নিল না রানা, ঘুরেই গুলি পাঠাল প্রথম রোবটের দিকে।

কয়েকটা বুলেট বিঁধল রোবটের বুক, মুখ, মাথা ও উরুতে। কিন্তু কিছুই হলো না ওটার। ঝড়ের বেগে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে ছুটে এল সেটা রানার দিকে। পাকা

কুস্তিগীরের মত ওকে ট্যাকল করল। ল্যাং মেরে ফেলল মেঝেতে। তার হাতের ঝটকায় ছিটকে পড়ল রানার হাতের পিস্তল।

শুরু হলো হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট। নিজের যান্ত্রিক সংস্করণের সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড ঘুষি বসাল রানা। কিন্তু তা পাত্তাও দিল না রোবট। ডানহাত ছুটিয়ে নিয়ে ঘুষি মারল রানা যান্ত্রিক চোয়ালে। ফেটে গেল নকল ত্বক। নিচে রয়েছে টাইটেনিয়ামের হাড় ও ছোট হাইড্রোলিক মোটর।

শক্ত হাতে রানার গলা চেপে ধরল রোবট। আটকে দিচ্ছে মগজে রক্ত সঞ্চালন। দু'হাতে যান্ত্রিক হাত খামচে ধরল রানা। ছিঁড়ে ফেলল নকল মাংস। আশা করছে পাবে তার। সেক্ষেত্রে ছিঁড়বে ওগুলো।

কিন্তু হাতে মাংসপেশি, প্রেশার পয়েন্ট বা দুর্বল কিছুই পেল না রানা। উপড়ে আনার উপায় নেই কোনও প্লাগ বা ব্যাটারি।

জ্ঞান হারাচ্ছে রানা। চোখে দেখছে কালো আঁধার। ঝট করে মাথা তুলে গুঁতো দিল রোবটের নাকে। মট্ করে ভাঙল নরম হাড়ের মত প্লাস্টিক। এতে কিছুই হলো না রোবটের। ফাঁকা চোখে ওকে দেখল ওটা। বাড়ল গলার ওপর চাপ।

প্রায় অচেতন রানা দেখল, হুয়াঙের তিন লোকের সঙ্গে লড়ছে সোহেল। কিন্তু ওকে মেঝেতে পেড়ে ফেলল তারা। সোহেলের মাথায় পিস্তলের নলের বাড়ি দিল একজন।

'বাড়াবাড়ি করলে খুন হবে,' সতর্ক করল হুয়াং।

এমনিতেই লড়াই শেষ। রোবটের শক্তি রানার চেয়ে ঢের বেশি। সোহেলের বুকে চেপে বসেছে দু'জন গার্ড। হাল ছেড়ে মেঝেতে হাত রেখে শুয়ে থাকল রানা। সুযোগ পেলে পরে লড়বে। ওর কপাল ভাল, গলা থেকে চাপ কমাল রোবট। তবে সরিয়ে নিল না হাত।

ঘরে থেমেছে ধস্তাধস্তি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লো

হুয়াং। প্রতি পদক্ষেপে ক্লিক-ক্লিক শব্দ তুলছে চামড়ার দামি জুতো। রানার পাশে এসে বসল লোকটা। মন দিয়ে দেখল নকল রানার বুক ও মুখের বুলেটের ক্ষত। ক'মুহূর্ত পর বলল, 'বোকামি কাকে বলে! আগেই রেসের ট্র্যাকে বলেছি, মানুষের সাধ্য নেই জিতবে মেশিনের সঙ্গে। আমার তৈরি মাসুদ রানা তোমার চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের যোদ্ধা। শক্তি ও গতি বেশি বলে প্রতিক্রিয়া দেখাবে তোমার চেয়ে অনেক দ্রুত। আরও বড় কথা, ওর নেই ব্যথা বা ভয়। চাইলেও ওর ধারেকাছে যেতে পারবে না তুমি, মাসুদ রানা!'

আটচল্লিশ

পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়িঘোড়ার শব্দে ঘুম আসছে না তানিয়া রেজার। তা ছাড়া, মগজে গিজগিজ করছে অসংখ্য দুশ্চিন্তা। এত বড় বিপদে পড়েছে অথচ কিছুই করার নেই, ভাবতে গিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। খুব রাগও হচ্ছে আসিফের ওপর। বেয়াক্কেলে নাকি মিনসেটা! আইএনএন প্রোডাকশন ভ্যানের মেঝেতে শুয়ে কী নিশ্চিন্তে নাক ডেকে চলেছে!

তানিয়ার মন চাইল ঠেলে তুলবে আসিফকে। কিন্তু কাজটা অন্যায়। কখনও কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয় না। শ্বশুর আর নেই জানাতে গিয়ে হঠাৎ করেই নানাকে ডেকে তুলেছিলেন নানী। ওই দুঃসংবাদ শুনেই অজ্ঞান হন মানুষটা। পরে জ্ঞান ফিরলেও পাগল ছিলেন বহু দিন।

রাত এখন তিনটে। বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার। তবে পার্কিং লটে জ্বলজ্বল করছে সিকিউরিটি বাতি। ভ্যানের ভেতর ভেজা, শীতার্ত পরিবেশ। উঠে এডিটিং স্টেশনের চেয়ারে বসল তানিয়া। চোখ পড়ল আসিফের মুখে। অসহায় দেখাচ্ছে মানুষটাকে, যেন কচি বাচ্চা। রাগ ও বিরক্তি মিলিয়ে যেতেই মৃদু হাসল তানিয়া। সত্যি, ওর কপাল ভাল, এত সুন্দর মনের একজন মানুষ পেয়েছে চলার পথে।

তানিয়ার মনে পড়ল, সাহস ছিল না বলে ওরা হোটেলে ওঠেনি। রাতে ভ্যানে থাকার অনুমতি নিয়েছে মহিলা সাংবাদিকের কাছ থেকে। তবে ভবিষ্যতে এভাবে চলবে না। চাইনিয কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা না পড়লেও যখন তখন ভ্যান ব্যবহার করবে নেটওঅর্কের কেউ। হয়তো ফিউয়েল নিতে বা মেরামত করতে মেকানিকের কাছে নেবে ড্রাইভার।

এসব বাদ যাক, বদ্ধ এই ভ্যানে কয়েক দিন কাটাতে হলে স্রেফ পাগল হয়ে যাবে ওরা দু'জন।

অন্ধকারে চোখ মেলে চুপ করে বসে রইল তানিয়া। কিছুক্ষণ পর দেখল এগিয়ে আসছে কে যেন! এবার বাধ্য হয়ে আসিফের বাহুতে টোকা দিল ও।

'অ্যাঁ? ক্বী... কে!' চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল আসিফ।

'কে যেন আসছে,' চাপা স্বরে বলল তানিয়া।

'কে?'

'চেহারা দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'সিকিউরিটি গার্ড?'

চুপ করে থাকল তানিয়া। শুকিয়ে গেছে মুখ।

উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিল আসিফ। হাড্ডির মত মেঝেতে শুয়ে সারাশরীরে বড্ড ব্যথা, কুঁচকে ফেলেছে গাল। এদিক ওদিক তাকাল। অন্ধকারে দেখল না কাউকে। বড় একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে তানিয়ার দিকে তাকাল। আর তখনই টোকা পড়ল ভ্যানের পেছন দরজায়।

'ঠক্-ঠক্-ঠক্!'

দরজার হ্যাণ্ডেলের দিকে আসিফ হাত বাড়াতেই ফিসফিস করে বলল তানিয়া, 'আসিফ! সাবধান!'

'কিছুই তো করার নেই,' নিচু গলায় বলল আসিফ। 'তা ছাড়া, যে এসেছে, সিক্রেট পুলিশ বলে মনে হয় না। হলে টোকা দিত না।' হ্যাণ্ডেল আনলক করে আস্তে করে দরজা খুলল ও। পুলিশ বা মিলিটারির বদলে দেখতে পেল মহিলা সাংবাদিক মেরিয়ান হিউবার্টের হাসিমুখ।

ভ্যানে উঠে দরজা আটকে নিল সে।

'হঠাৎ টোকা দিলেন যে?' জানতে চাইল আসিফ।

'নিজেকে ভদ্রমহিলা মনে করি, টোকা না দিয়ে কোথাও ঢুকি না। মা-র লক্ষ্মী মেয়ে ছিলাম।' মেরিয়ানের হাতে ইনসুলেটেড কাপ। 'কফি। ভাগ করে খাবেন। দুটো আনা সম্ভব ছিল না। নইলে চোখে পড়লে যে কেউ সন্দেহ করত—একা মানুষ দু'কাপ কফি দিয়ে কী করবে?'

'মাথা খেলে আপনার,' বলল তানিয়া। 'আসিফ কফির জন্যে পাগল। ওই জিনিস হাতে দিয়ে আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিতে পারবেন।'

গভীর মনোযোগে ঢ্যাঙা আসিফকে দেখল মেরিয়ান। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমি লম্বু লিটল জনকে চাই না। অপেক্ষা করব সত্যিকারের রবিন হুডের জন্যে।'

মৃদু হাসল তানিয়া।

কফির কাপ নিয়ে কালো তরলে চুমুক দিল আসিফ। 'বাহ্, দারুণ জিনিস তো!' তবে দ্বিতীয় চুমুক না দিয়ে কাপ ধরিয়ে দিল তানিয়ার হাতে।

ভ্যানের ভেতর কড়া কফির সুবাস। দু'চুমুক কফি পেটে চালান দিয়ে আসিফের হাতে কাপ ফেরত দিল তানিয়া। তাকাল মেরিয়ান হিউবার্টের চোখে। 'আপনি বলেছিলেন ভোরে আসবেন। কিন্তু এখন তো মাত্র রাত তিনটে।'

'না এসে উপায় ছিল না,' বলল মেরিয়ান। 'ব্যুরো চিফ বলে দেন যেন তাড়াতাড়ি আসি। পরে ফোন করলেন, আমেরিকান সরকার থেকে এসেছে আরেকটা রিপোর্ট। আবারও হ্যাক হবে আমাদের নেটওঅর্ক।'

'কিন্তু আপনারা তো আর হ্যাক্‌ড্ হননি?' কী বলা হয়েছে বুঝে গেছে আসিফ।

মৃদু হাসল মেরিয়ান। কোটের পকেট থেকে বের করল যিপ ড্রাইভ। 'এটা হাতে দিয়ে চিফ বললেন, ব্যবস্থা করুন। হনহন করে চলে যাওয়ার আগে জানালেন, বিমানের টিকেট বুক করতে যাচ্ছেন। বাধ্য হলে যাতে চলে যেতে পারেন চিন ছেড়ে। আমাকেও একই কাজ করতে বলেছেন।'

'যিপ ড্রাইভে কী আছে?' জানতে চাইল তানিয়া।

'এখনও জানি না,' বলল মেরিয়ান। 'এনক্রিপ্ট করা। তবে হ্যাক করা হয়েছে আমেরিকা থেকে। তচনচ করে দেয়া হবে আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিস। পুরো দুই মিনিটের জন্যে দখল করে নেবে স্যাটেলাইট। তারপর বার্তা প্রচারের পর আবারও ওটা ফিরে পাব। ওই স্যাটেলাইট ব্যবহার করেই আপনাদের সিগনাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন দুই-এ-দুই মিলে কী হয়। দেখতে চান ফাইলটা?'

ল্যাপটপ চালু করে মেরিয়ানের হাত থেকে যিপ ড্রাইভ নিয়ে স্লটে ভরল তানিয়া। কয়েক মুহূর্ত পর ওরা দেখল লগ-ইন উইণ্ডো। তানিয়ার নুমা পাসওঅর্ড দিতেই বেরোল ফাইলের একটা লিস্ট।

'কমোডোর কার্কের তরফ থেকে পাঠানো,' বলে প্রথম ফাইল খুলল তানিয়া। স্ক্রিনে ফুটে উঠল প্রেযেন্টেশন।

চোখ বড় করল আসিফ। 'উনি পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে প্রস্তাবনা তৈরি করেছেন? তার মানে নকল পাসওঅর্ড, গোপনীয়তা... সব বাদ?'

ফাইলের প্রথম পৃষ্ঠা পড়ল তানিয়া, তারপর বলল,

'তোমার অবর্তমানে জিয়োলজি টিমের সঙ্গে কাজ করছে স্মিতা। আমাদের পাঠানো ডেটা দেখার পর ওরা বুঝে গেছে, কোথা থেকে আসছে সাগরে পানি। লো হুয়াং লিটনের মাইনিং অপারেশনের কারণে পৃথিবীর বুকে তৈরি হয়েছে অনেক গভীর ফাটল। ওই পরিবৃত্তি এলাকা থেকেই উঠছে লাখ-কোটি গ্যালন পানি।'

'পরিবৃত্তি এলাকা দুই শ' মাইলেরও গভীর,' ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকল আসিফ।

'ওই পানি আছে প্রচণ্ড চাপের ভেতর,' তথ্য দেখে নিয়ে বলল তানিয়া। 'যি-ওয়েভের কারণে রিংউডাইট নামের এক মিনারেল থেকে বেরোচ্ছে এত পানি।'

'রিংউডাইট?' বলল আসিফ।

'উচ্চারণে ভুল করিনি তো?'

'না, ঠিক আছে,' দ্বিধা নিয়ে বলল আসিফ, 'পড়তে থাকো।'

চোখে চোখ রেখে ওকে দেখল তানিয়া। যথেষ্ট তথ্য দিচ্ছে না আসিফ। তবে তাড়া দিল না। পড়ল পরের কয়েক লাইন। সংক্ষেপে জানাল, 'এই ফাইলের সঙ্গে দেয়া হয়েছে আমাদের সংগ্রহ করা প্রমাণ এবং অঙ্কের হিসেব নিকেশ। এ ছাড়া, রয়েছে দুটি উপস্থাপনা। প্রথমটি অত্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর। অন্যটি সাধারণ মানুষের বোঝার জন্যে সহজ করে লেখা। যেহেতু বিশাল এলাকায় ফাটল ধরেছে রিংউডাইটে, আপাতত হিসাব কষে বের করা যাচ্ছে না কী পরিমাণের পানি উঠে আসছে। কিন্তু এভাবে নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে তুলে দিলে ফলাফল হবে ভয়াবহ। সেক্ষেত্রে আগামী দশ বছরে সাগর-সমতল হবে দু'হাজার ফুট ওপরে।'

'দু'হাজার ফুট?' চমকে গিয়ে বিড়বিড় করল মেরিয়ান।

ভুল পড়েছে কি না বুঝতে দ্বিতীয়বার পড়ল তানিয়া। মাথা নাড়ল। 'তাই তো লেখা আছে দেখছি!'

'পড়তে থাকো,' শান্ত স্বরে বলল আসিফ।

'অঙ্কের অন্য সব হিসেব অনুমান নির্ভর,' বলল তানিয়া, 'আরও লেখা হয়েছে, কীভাবে ধ্বংস হতে পারে আজকের মানব সভ্যতা। সামনে অন্তত পঞ্চাশ বছরের জন্যে ডুবে যাবে পৃথিবীর বেশিরভাগ জমি। এটা অসম্ভব বলে মনে হলেও সম্ভাবনা বেশি যে সেটাই ঘটছে। ক্রমেই অসংখ্য ফাটল হচ্ছে রিংউডাইটের গায়ে। প্রতিটি ফাটল থেকে উঠছে বিপুল পরিমাণের পানি। সেজন্যে আবার তৈরি হচ্ছে নতুন আরও ফাটল।'

কমপিউটার স্ক্রিন দেখছে তানিয়া, আসিফ ও মেরিয়ান। 'আর আমি ভেবেছি পাগলামি ভরা সব খবর দিই,' বিড়বিড় করল মেয়েটা, 'আসলে প্রলয় হবে পানির কারণে!'

'শুনলে অযৌক্তিক মনে হয়,' বলল আসিফ, 'কিন্তু এত পানি ভূগর্ভ থেকে উঠে এলে, ঠেকাতে পারবে না কেউ। সাত মহাসাগরের সব পানির অন্তত তিনগুণ বেশি পানি রয়েছে নিচের পাথরের স্তরে। প্রচণ্ড চাপে আটকা পড়েছে নানান মিনারেলের মাঝে। কিন্তু একবার পথ করে বেরোতে পারলে সোজা উঠে আসবে ওপরে।'

'এসব আগেই জানতে?' স্বামীর দিকে তাকাল তানিয়া।

মাথা দোলাল আসিফ। 'ডিপ আর্থ জিয়োলজি।'

'নুমা হেডকোয়ার্টারে যখন আলাপ করলাম, তখন তো বলোনি কী কারণে উঠে আসছে সাগর-সমতল?'

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। 'আগে ভাবলেও পরে অন্যান্য সম্ভাবনা ভেবে বাতিল করে দিয়েছি এই চিন্তা। তা ছাড়া, এভাবে এত পানি উঠবে শুধু আগ্নেয় উদ্গীরণে। কিন্তু গত বছর থেকে অনেক কমে গেছে আগ্নেয়গিরির উৎপাত।'

স্মিতা ও পার্কারের পাঠানো ডেটা দেখল তানিয়া। একটা গ্রাফে দেখানো হয়েছে, সাগরের নিচে চিনাদের খনি থেকে উত্তোলনের ফলে তৈরি হয়েছে অসংখ্য ফাটল। 'সরাসরি নিচে

গেছে এসব। বোঝার উপায় নেই কত ক্ষতি হচ্ছে ওখানে। তবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে রিংউডাইটের ফাটল।'

'ওখান থেকেই আসছে উষ্ণপ্রস্রবণ,' বলল আসিফ, 'পুরো এলাকা ঘুরে দেখার সুযোগ পাইনি। জানা নেই কতগুলো ঢিবি। হয়তো এক শ'র বেশি। বা হাজার খানেক। পানি উঠছে শত মাইল গভীর থেকে।'

নিজেও বিজ্ঞানী, গলা শুকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিল তানিয়া। চট্ করে দেখতে লাগল অন্যান্য ফাইল।

'জরুরি কিছু খুঁজছ?' জানতে চাইল আসিফ।

'হ্যাঁ, জানতে চাই এ দেশ থেকে আমাদের বের করতে কোনও ব্যবস্থা নেবে কি না নুমা,' বলল তানিয়া। নির্দেশনা নামের একটা ফাইল পেয়ে খুলল। 'আমাদের জন্যে একটা ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছেন নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন। তাঁর হয়ে চাইনিয সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন রানার বস বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।'

'তা হলে ওটা হয়তো সেফ হাউস,' বলল আসিফ।

কমপিউটারে লোকেশন টাইপ করল তানিয়া। 'এখনও জানি না।'

ম্যাপ দেখল মেরিয়ান। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'ওটা কোনও সেফ হাউস নয়। ওখানে আছে মিনিস্ট্রি অভ স্টেট সিকিউরিটির শাংহাই ব্যুরোর অফিস। সাধারণ মানুষ বলে, ওটা সিক্রেট পুলিশের স্থানীয় হেডকোয়ার্টার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছনে হেলান দিল আসিফ। 'অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি রানাকে। ওর বসকে সম্মান করি। নইলে ভাবতাম আমাদেরকে সরাসরি ছুঁড়ে দিচ্ছেন ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার ভেতর।'

'উনি হয়তো ভেবেছেন, আপনারা ওখানে গেলেই ভাল করবেন,' বলল মেরিয়ান। 'কেউ খুঁজতে যাবে না সিক্রেট

সার্ভিসের অফিসে।'

'ওখানে লুকিয়ে থাকতে বলেননি মেজর জেনারেল,' বলল তানিয়া। আবারও পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত পর জানাল, 'আমরা যেন ওখানে গিয়ে আত্মসমর্পণ করি। কিন্তু সেটা করতে হবে মাত্র একজনের কাছে। এজেন্টের নাম লিউ ফু-চুং। তিনি নাকি পরিচয় করিয়ে দেবেন তাঁর বস জেনারেল ফং মিং-এর সঙ্গে।'

বড় করে শ্বাস ফেলল আসিফ। 'শেষে যদি মরতেই হয়, তো ফায়ারিং স্কোয়াডই চাইব। চট্ করে শেষ হবে সব ঝামেলা।'

বিরক্ত হয়ে বলল তানিয়া, 'মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান কিন্তু রানার বস, কথাটা মাথায় রেখো। চিন্তাভাবনা না করে আমাদেরকে মহাবিপদে ঠেলবেন ভেবে থাকলে ভুল করছ।'

একবার স্ত্রীকে দেখে নিয়ে মেরিয়ানের দিকে তাকাল আসিফ। 'আমরা কি আপনার ভ্যানটা ধার নিতে পারি?'

মাথা নাড়ল মেরিয়ান। 'পাগল নাকি? আমিও তো যাব! জীবনের সেরা কাহিনী হারিয়ে মরি আর কী! আপনারা দু'জন কফি ভাগ করে খান, ড্রাইভ করব আমি।'

উনপঞ্চাশ

হাশিমা দ্বীপে রানার প্রথম নকল রোবটটি ওঅর্কবেঞ্চের দিকে যেতেই ওদিকে তাকাল হুয়াং লিটন। বড় মসৃণভাবে চলে এসব মেশিন। এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পায়ে গুলি

লেগেছে বলে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে। গিয়ে বসে পড়ল ওঅর্কবেঞ্চে। আহত পা চেপে ধরেছে মানুষের মত। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে পড়ছে রক্তের মত লাল তরল।

দ্বিতীয় রোবট অক্ষত।

'ওটা থেকে যে লাল তরল পড়ছে, ওটা কি হাইড্রলিক ফ্লুইড?' জানতে চাইল হুয়াং।

'না,' বলল সাবা সাবেলা। 'গঠনমূলক প্যানেলে নকল ত্বকের নিচে ওই জেল রেখেছি আমরা। ওটার কারণে নরম মনে হবে গা। তা ছাড়া, সর্বক্ষণ দৈহিক তাপ থাকবে আটানব্বুই দশমিক ছয় ডিগ্রি। হ্যাণ্ডশেক করলে মনে হবে মানুষটার নরম মাংসে আছে স্বাভাবিক পেশি। উষ্ণও থাকবে হাত। আমাদের টেকনিশিয়ানদের একজন আবিষ্কার করেছে এই জেল। পরে লাল করা হয়েছে ওটাকে। রোবট ক্ষতিগ্রস্ত হলে সবাই ভাববে, মানুষটা আহত হয়েছে বলে রক্ত পড়ছে।'

খুশি হলো হুয়াং। 'ওই টেকনিশিয়ানকে মোটা অঙ্কের বোনাস দেবেন। আমি নিজেও ওদিকটা খেয়াল করিনি।'

আবারও রোবটের দিকে তাকাল সে। মনে মনে বলল, সামনের মিশনে রোবট আহত হলে মন্দ হয় না। পরে ঠিক একইভাবে গুলি করে মাসুদ রানাকে খুন করবে সে। এর ফলে লোকটার লাশ পরে পাওয়া গেলে কারও মনে সন্দেহ থাকবে না, অপরাধটা করেছে বিসিআই-এর বিশ্বাসঘাতক এজেন্ট।

সহজ ভঙ্গিতে নিজের শার্টের বোতাম খুলল রোবট। দেখা গেল বুকে বুলেটের ক্ষত।

'কয়টা গুলি লেগেছে?' জানতে চাইল লো হুয়াং।

'চারটে,' বলল সাবেলা, 'ব্যাকআপ মেশিনে সামান্য আঁচড় কেটে গেছে আরেকটা বুলেট। ভাবতেও পারিনি অত দ্রুত এত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করবে মাসুদ রানা। তবে তার কপাল ভাল, গুলি লাগাতে পেরেছে।'

'এটা দুঃসংবাদ,' বলল লো হুয়াং। 'আমার মনে হয় না

কপালের জোরে গুলি লাগাতে পেরেছে। একগুঁয়ে ধরনের লোক। যখন বুঝল কী করছি আমরা, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও চেয়েছে মেশিনদুটোকে বিকল করতে। তাই চারবার গুলি করেছে দেহের চারদিকে।'

'দেখা যাক তাতে কাজ হয়েছে কি না,' রোবটের দিকে ফিরল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'শুয়ে পড়ো। ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট দাও মেইন কমপিউটারকে।'

ওঅর্কবেঞ্চে শুয়ে স্থির হলো রোবট। আগেই লো হুয়াং বলে দিয়েছে, এসব রোবট হতে হবে একদম মানুষের মত। চুলের ভেতর বা শরীরে কোথাও থাকবে না কোনও পোর্ট বা পাওয়ার প্লাগ। সব ডেটা আদান-প্রদান ও ব্যাটারি চার্জিং হবে বেতারের মাধ্যমে।

'দরকার হলে আমরা কাজে লাগাব ব্যাকআপ রোবট,' বলল লো হুয়াং।

'আমি হলে তা করতাম না,' বলল সাবেলা। 'প্রথমে ট্রেনিং নিয়েছে এটা, এর প্রসেসরও দ্রুত। ব্যাকআপ রোবট এর চেয়ে বেশ দুর্বল।'

'এক জিনিসই তো দুটো।'

মাথা নাড়ল সাবেলা। 'সাধারণ মানুষ ভাবে সব মেশিন একই। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তৈরির সময় কোথাও না কোথাও থাকে তফাৎ। হয়তো এটা হয় কম দক্ষ সার্ভো বা হাইড্রলিক প্রেশারের জন্যে। যন্ত্রের প্রতিটা কল থেকে বেরোচ্ছে সামান্য তাপ। তাই দৈহিক প্রতিক্রিয়াও আলাদা। মানুষকে নকল করতে শিখেছে আর্টিফিশিয়াল এই দুটো ইন্টেলিজেন্স। তবে তাদের ভেতর তৈরি হয়েছে ক্লাস। একটা আরেকটার চেয়ে বেশি দক্ষ।'

কথাটা বুঝতে পেরেছে লো হুয়াং। অবাকও হয়েছে। মৃদু মাথা দুলিয়ে বলল, 'এটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল মাসুদ রানা। সেজন্যেই গুলি করে প্রথমটাকে।'

‘আপনি তাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন,’ আপত্তির সুরে বলল সাবেলা। দেখাল রোবটের মুখের ক্ষত। ‘ভুল করে মাথায় গুলি করতে চেয়েছে সে। ধরে নিয়েছে মানুষের মত চেহারার রোবটের সবচেয়ে দুর্বল অংশ করোটি। কিন্তু ওখানে মগজ নেই এর। আমার ধারণা, লোকটা ভেবেছে গুলি লাগবে রোবটের হার্ড ড্রাইভ বা সিপিইউ-এ। একদম ভুল। বুদ্ধি করে এদের বাম উরুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি হার্ড ড্রাইভ আর সিপিইউ। এত চেষ্টা করে লোকটা ক্ষতি করেছে শুধু মুখ আর একটা অপটিকাল প্রসেসরের।’

রোবটের গলায় স্ক্যালপেল চালাল সে। চড়চড় করে তুলে নিল গলা থেকে শুরু করে মুখের সব ত্বক। চুলও বাদ পড়ল না। পুরনো মুখোশের মত সব ফেলল পাশের গার্বেজ বিনে। ‘ওই জিনিস আর মেরামত করা যাবে না।’

এক অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকাল সে। ‘চালু করো থ্রি-ডি প্রিন্টার। খেয়াল রেখো, যেন ঠিকভাবে মিশিয়ে নেয়া হয় পলিমার। নতুন চেহারা চাই। এ ছাড়া, দেবে পায়ের প্যানেলের চামড়া। এসব দেয়ার পর এনে দেবে আরেকটা অপটিকাল প্রসেসর আর সেকেণ্ডারি হাইড্রলিক অ্যাসেম্বলি।’

‘কতক্ষণ লাগবে এসবে?’ জানতে চাইল লো হুয়াং। ‘আমরা হেলিকপ্টারে করে রওনা হতে চাই একঘণ্টা পর।’

‘আধঘণ্টা লাগবে মেরামত করতে,’ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

মাথা দোলাল বিলিয়নেয়ার। ‘কাজে লেগে পড়ুন। অন্য টেকনিশিয়ানদের বলুন, যাতে তৈরি করে সোহেল আহমেদের মত একটা। মাসুদ রানার দুই নম্বর রোবটের চেসিস ব্যবহার করবেন। আপনারা তো আবার উচ্চতা আর শেপ নানানরকম করতে পারেন।’

‘এত কম সময়ে নিখুঁত হবে না,’ বলল সাবেলা। ‘ওই লোকের ভিডিয়ো বা ভয়েসপ্রিন্ট আমাদের কাছে নেই।’

'এখানেই তো আছে সে,' বলল হুয়াং, 'ধরে এনে শিখে নিন সব। নিখুঁত হতে হবে না। চাই ওরা দু'জনই যেন হাজির হয় আমার প্যাভিলিয়নে।'

'জী, স্যর, বেশ,' মাথা দোলাল ইঞ্জিনিয়ার।

'গুড।' দরজার দিকে চলল বিলিয়নেয়ার। 'এদিকে সেরে নেব ওরে চিচিওয়ার সঙ্গে জরুরি কাজ।'

পঞ্চাশ

হাশিমা দ্বীপের কয়লা খনির প্রধান সুড়ঙ্গ।

হঞ্জো মাসামিউনে শক্ত হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাক্তন ইয়াকুযা খুনি ওরে চিচিওয়া। অত্যাধুনিক ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়েই তার দেখা পেল বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটন।

'শেকলে আটকে রেখেছি ওদেরকে,' জানাল ওরে চিচিওয়া, 'তবে ভাল হতো মেরে ফেললে।'

'সেজন্যে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'কী কারণে?'

'কারণ তুমি এখন খুন করলে ওদের শরীরে শুরু হবে রিগোর মর্টিস।' কাঁধ ঝাঁকাল বিলিয়নেয়ার। 'ঠাণ্ডা হবে লাশ। পরে কর্তৃপক্ষ পেলে দেখবে, আগেই হয়েছে বরফের টুকরোর মত। তাতে প্রমাণ হবে প্রধানমন্ত্রী খুন হওয়ার আগেই লাশ হয়েছে তারা। গোটা পৃথিবীর ষড়যন্ত্র-তত্ত্ববিদরা বুঝবে, এসব খুনের পেছনে আছে মহাচিন। তোমার তো এসব আগেই বুঝে যাওয়ার কথা।'

রাগী চোখে তাকে দেখল চিচিওয়া। দু'পা সামনে বেড়ে কঠোর সুরে বলল, 'আমার মত লোক ভাল করেই জানে, কোথাও রাখতে হয় না আলগা সুতো। এটা ভাল জানি বলেই কখনও ধরা পড়িনি। আর এবারেও ভুল করব না।'

সব নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে বলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল লো হুয়াং, 'গলার স্বর নামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে।'

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেলেও খালাত ভাইয়ের উদ্দেশে নিচু স্বরে বলল ওরে, 'আমার কথা মনে রেখো: ওরা কিন্তু আমাদেরকে দেখেছে। খুন না করা হবে বিপজ্জনক ঝুঁকি।'

'আগামী বারো ঘণ্টা পেরোবার আগে নিজেরাই খুন হবে,' বলল লো হুয়াং। 'চাইলে নিজ হাতে খুন করতে পারবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কখন এবং কোথায় কাজটা করবে, সেটা ঠিক করে দেব আমি। নইলে তুমি নিজেই তৈরি করবে অসংখ্য আলগা সুতো। আপাতত বেঁচে থাকুক ওরা। ...এবার দাও তোমার হাতের তলোয়ারটা, নইলে যে-কোনও সময়ে খুন করে বসবে কাউকে। আমার সঙ্গে চলো ফ্যাসিলিটির ভেতর।'

ফ্যাসিলিটির দিকে ঘুরল বিলিয়নেয়ার।

দ্বিধা নিয়ে পেছন থেকে জানতে চাইল ওরে চিচিওয়া, 'আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলছি না কেন?'

'কারণ বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আর আমার লোক দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে তোমার হাতের ওই তলোয়ার।'

'পছন্দ করে ফেলেছি জিনিসটা,' বলল ওরে।

'ভাল লাগবে না ওটার অতীত কীর্তি জানলে।'

ওরে চিচিওয়াকে পথ দেখিয়ে সুড়ঙ্গের এক করিডোরে ঢুকল লো হুয়াং। আধুনিক করে তোলা হয়েছে এদিকটা। বামে ট্রিপল-সিল ডোর খুলে ঢুকতে ইশারা করল সে।

মাথা নাড়ল প্রেতাত্মা। 'তুমি আগে ঢোকো।'

'আপত্তি নেই।' নতুন ল্যাবে পা রাখল বিলিয়নেয়ার। এ ঘর রোবট প্রোডাকশন রুমের তুলনায় ছোট এবং বদ্ধ।

চারপাশের সব মেশিন চিনবে দক্ষ ধাতুবিদরা।

'এ ঘর কীসের জন্যে?' জানতে চাইল ওরে।

'এসব মেশিন দিয়ে আমার লোক অ্যানালাইয করে দেখবে জাপানের কোন্ খনি থেকে তোলা হয়েছিল "ওর"। সেসব খনির বেশিরভাগই বন্ধ হয়েছে।' বিড়বিড় করল লো হুয়াং, 'শত শত বছর আগে।'

প্রায় এক বছর হলো নানান জায়গা থেকে ধাতু এনে এখানে পরীক্ষা করছে তারা। তখন থেকেই ঘরের পেছনে সংগ্রহ করা হচ্ছে স্টিলের ক্যানিস্টারে নানান ধাতু। দেখলে মনে হবে সুপারমার্কেটের দোকানের জানালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য বিয়ারের ক্যান।

'আসলে কী খুঁজছ?' জানতে চাইল ওরে চিচিওয়া।

'খুব দুর্লভ একটা অ্যালয়। ওটা আছে জাপানে।'

'তলোয়ারের ভেতর? ওখানে গেল কী করে?'

লো হুয়াং ধারণা করছে, এরইমধ্যে সব বুঝে গেছে ওরে চিচিওয়া, তাই তথ্য গোপন করল না। 'এসব তলোয়ার তৈরি করেছিলেন জাপানের সেরা তলোয়ার নির্মাতা মাসামিউনে। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাঁর অস্ত্র ছিল নিখুঁত, নিরেট ও নমনীয়। জং ধরত না। আমার মনে হয়েছে, ওই অ্যালয় মিশিয়েই তৈরি করেন তিনি এসব তলোয়ার। আমরা মিশ্রণটা ঠিকভাবে বুঝতে পারলে হয়তো খুঁজে নিতে পারব, কোন্ খনি থেকে তোলা হয়েছে "ওর"।'

হুয়াঙের কথা শেষ হতেই প্লাসমা ম্যাস স্পেকট্রোমিটার চালু করে ওরের আনা একটা তলোয়ারের ফলা অ্যানালাইয করতে লাগল এক টেকনিশিয়ান। কালো কাচের ওদিকে এতই শক্তিশালী শিখা ছিটাচ্ছে প্লাসমা টর্চ, সাদা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছে গোটা ঘর। মাসামিউনের তলোয়ারে প্রয়োগ করা হচ্ছে উচ্চ তাপের শিখা। বেশ ক'সেকেণ্ড পর থেমে গেল মেশিন।

স্পেকট্রোমিটার থেকে তলোয়ার বের করতেই দেখা গেল,

প্রচণ্ড তাপে টুকটুকে লাল হয়েছে ফলা। সামান্য বেঁকেও গেছে। তলোয়ার থেকে চেঁছে তোলা সামান্য ধাতু নিয়ে অ্যানালাইয করা হলো কমপিউটারে। কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এল ছাপা রিপোর্ট।

'ও, তো এজন্যেই মাসামিউনের ডায়েরি চেয়েছিলে?' জানতে চাইল ওরে চিচিওয়া।

মৃদু মাথা দোলাল হুয়াং। 'ওটাতে আছে কীভাবে এসব অস্ত্র তৈরি করতেন তিনি। অনেক পরিশ্রম করেছেন অস্ত্র নিখুঁত করতে গিয়ে। আমার ধারণা, এসব থেকে বেরোবে কোন্ খনি থেকে পেয়েছেন ওই অ্যালয়।'

'তো জানলে?'

'না, জানতে পারিনি,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'ডায়েরির বেশিরভাগ পাতায় দার্শনিক ফালতু প্যাঁচাল। এমন এক অস্ত্র তৈরি করবেন, যেটা শায়েস্তা করবে খারাপদেরকে, কিন্তু ছুঁয়েও দেখবে না নিরপরাধকে।'

খলখল করে হাসল ওরে। 'শালার মাথা খারাপ ছিল। বিবেকের দংশনে ওই হাল।'

'হয়তো,' বলল হুয়াং। 'তবে তোমার হাতে এখন যে তলোয়ার, সেটার কথা লিখেছেন: কখনও নিরপরাধীর ক্ষতি করবে না এ অস্ত্র।'

চোখ সরু করে সোনালি রঙ ঝিকিয়ে ওঠা তলোয়ারটা দেখল ওরে চিচিওয়া।

'কপাল ভাল, অথবা দেখেই বুঝে গেছ তোমার হাতে ওটা দুনিয়ার সেরা তলোয়ার,' বলল লো হুয়াং। 'সবগুলোর ভেতর ওটার মূল্য সবচেয়ে বেশি। সাধারণ অ্যান্টিক নয়, তোমার হাতে ওটা হচ্ছে মাসামিউনে।'

চওড়া হাসল ওরে।

ধারণা করেছিল এটাই সেই তলোয়ার।

আরেকটা তলোয়ার তুলে নিল লো হুয়াং। ওটার ফলা

কালচে। ওরের হাতের তলোয়ারের চেয়ে একটু বেশি পুরু পাত। ইস্পাতে লালচে ভাব। তবে জং ধরেনি। রঙটা শুকনো গোলাপ পাপড়ি বা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মত। 'তোমার নেয়া উচিত ছিল এটা। নামঃ খয়েরি তলোয়ার। মাসামিউনে নন, এটা তৈরি করেছে অন্য এক তলোয়ার নির্মাতা। তার নাম ছিল মিউরামাসা।'

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ওরে, 'মিউরামাসা?'

মৃদু মাথা দোলাল লো হুয়াং। 'বলা হতো সে ছিল মাসামিউনের প্রিয় শিষ্য। তবে এ নিয়ে তর্ক আছে। ঘটনা যাই হোক, সারাজীবন মিউরামাসা চেষ্টা করেছে জাপানের সেরা তলোয়ার নির্মাতা মাসামিউনেকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে। ভাবত, এমন এক তলোয়ার তৈরি করবে, যেটা হবে আরও ভাল। যাতে কখনও হারতে না হয় ওটার মালিককে। ভয়ঙ্কর হবে সেই অস্ত্র। সেটা সত্যিই তৈরি করতে পেরেছিল সে। তার জীবনে সেরা তলোয়ার এই খয়েরি তলোয়ার। প্রাচীন জাপানিরা বলতঃ এই তলোয়ারের সাহায্যে যত মানুষ খুন হয়েছে, বা যত ক্ষমতা ও সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে, অন্য কোনও তলোয়ার তা করতে পারেনি। এটার মালিক হবে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। কিংবদন্তী অনুযায়ীঃ এ তলোয়ারের আরেকটা কাজ হচ্ছে মাসামিউনের কীর্তিকে ছোট করা।'

'ওটার ব্যাপারে আরও কিছু আছে?' সন্দেহ নিয়ে হুয়াঙের দিকে তাকাল ওরে।

'সবাই বলত মিউরামাসা আসলে মাসামিউনের শিষ্য, এ কথা শুনতে শুনতে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল লোকটার মন,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'মাসামিউনেকে প্রতিযোগিতায় নামাতে চাইল সে। প্রমাণ করে দেবে কে সেরা তলোয়ার নির্মাতা। এতে রাজি হয়ে যান মাসামিউনে। স্থানীয় সাধুদেরকে বলা হলো বিচারক হওয়ার জন্যে। যে যার সেরা তলোয়ার তৈরি করে পরীক্ষায় নামল দুই অস্ত্র বিশারদ। পাহাড়ে মন্দিরের কাছে

খরস্রোতা এক ঝর্নায় দুই তলোয়ার নামিয়ে দিলেন সাধুরা। ধারাল ফলা রাখা হলো উজানের দিকে।

'ও-দুটোর ওপর চোখ রাখলেন সাধুরা। উজানের পানিতে যা কিছু এল খয়েরি তলোয়ারের ফলার সামনে, কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল সব। কাঁকড়া, মাছ, ঈল— রক্ষা পেল না কিছু। কিন্তু ঝর্নার আরেকদিকে ছিল তোমার হাতের ওই মাসামিউনের তলোয়ার। পানি কাটলেও জীবিত কোনও প্রাণীকে স্পর্শ করল না ওটা। কাটা পড়ল শুধু ভাসমান জঞ্জাল ও আবর্জনা।'

মৃদু হাসল হুয়াং। 'প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ায় মিউরামাসা হেসে বলল, "বুড়ো, তোমার তলোয়ার তো কিছুই কাটতে পারে না।" অন্যভাবে বলা হয়, মাসামিউনের তলোয়ারকে বন্ধ্যা বলেছিল মিউরামাসা। যাই হোক, অস্ত্র দুটো পানি থেকে তোলার পর সাধুরা দেখলেন, ঝর্না থেকে রক্তাক্ত হয়ে উঠে এসেছে খয়েরি তলোয়ার। মাসামিউনের তলোয়ার থেকে শুধু পড়ছে টপটপ করে স্ফটিকের মত পাহাড়ি পানি।'

'কে জিতে গেছে বুঝতেই পারছি,' বলল ওরে।

'তুমি ভাবছ জিতে গেছে মিউরামাসা?' মাথা নাড়ল লো হুয়াং। 'সাধুরা ঘোষণা দিলেন, জিতে গেছে মাসামিউনে। মিউরামাসার তলোয়ার আগ্রাসী ও রক্ত ভরা, ওটা পৈশাচিক, ধ্বংস ডেকে আনে ভাল মানুষের। অথচ মাসামিউনের তলোয়ার নিষ্পাপ কাউকে ছুঁয়েও দেখে না। এবার বলো, ওরে, নিজের কাছে রাখতে ওই তলোয়ার?'

'নিষ্পাপ?' ভুরু কুঁচকে ফেলল ওরে। 'নিষ্পাপ বলে কিছু নেই।'

'হয়তো,' বলল হুয়াং, 'তবে তোমার হাতের ওই তলোয়ার সাধুর, পাপীদের নয়। ক্ষমতা কী জিনিস সেটা ভাল করেই জানি আমরা দু'জন। আর তাই এটাও বুঝতে দেরি হয়নি দুই তলোয়ারের ভেতর কোন্টা সেরা।'

ডানহাতের হঞ্জো মাসামিউনে ভাল করে দেখল ওরে, তারপর মিউরামাসার তলোয়ারের জন্যে বাড়িয়ে দিল বামহাত।

দেয়ার সময় একটু ওপরে ছুঁড়ে দিল লো হুয়াং। সামনে বেড়ে লাফিয়ে উঠে তলোয়ারটার হাতল খপ্ করে ধরল ওরে চিচিওয়া। নিখুঁত ক্যাচ। দুই হাতে দুই তলোয়ার রেখে তুলনা করল। এদিক ওদিক চালাল সাঁই করে। নানান দিকে ঘুরিয়ে দেখল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এটার ওজন একটু বেশি।' ভুরু কুঁচকে খয়েরি তলোয়ার দেখল সে। 'মনে হয় হাতে শক্তিশালী অস্ত্র আছে।'

'ওটার সঙ্গে তোমাকে মানায়,' বলল হুয়াং।

'বেশ, তো এটাই নেব,' বলেই বিলিয়নেয়ারের অনুকরণে তার দিকে হঞ্জো মাসামিউনে ছুঁড়ল ওরে।

ডানহাতে বেকায়দাভাবে তলোয়ারের হাতল ধরল হুয়াং। অস্ত্রটার ডগা মেঝেতে পড়ার আগেই অন্য হাতের দু'আঙুলে ধরল ফলা। পরক্ষণে ঝট্ করে সরিয়ে নিল হাত। ক্ষুরধার ফলা কেটে দিয়েছে দুই আঙুল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে মেঝেতে। ব্যথায় 'উহ্!' করে উঠেছে বিলিয়নেয়ার। পাশের টেবিল থেকে তোয়ালে নিয়ে চেপে ধরল্ ক্ষত।

খলখল করে হাসল চিচিওয়া। 'তোমার কপাল খারাপ যে তুমি মাছ বা ঈল নও। নইলে ভাল তলোয়ার কাটত না তোমার হাত।'

সাবধানে ল্যাব টেকনিশিয়ানের হাতে তলোয়ার দিল বিলিয়নেয়ার। 'অ্যানালাইয করো, তবে ক্ষতি করবে না।'

'নিজের জন্যে স্যুভেনিয়র?' জানতে চাইল ওরে।

'প্রতীক,' জানাল লো হুয়াং, 'এটার জন্যে আবারও একাট্টা হবে জাপানের সবাই। তুমি নিজেও এত ঝুঁকি নিয়েছ এটা নিজ চোখে দেখার জন্যে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হঞ্জো মাসামিউনে। কোটি

মানুষের ক্ষমতা আর স্বাধীনতার প্রতীক। এটা হারিয়ে যেতেই পরাজিত হয়েছিল তারা। ভবিষ্যতে ঠিকসময়ে জাপানের সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরব হঞ্জো মাসামিউনে। ফলে আমেরিকার শেকল ছিঁড়ে বেরোতে পারবে তারা।'

হাসল ওরে চিচিওয়া। 'ভাবছ, কেউ টের পাবে না আমেরিকার শেকলের বদলে হাতে-পায়ে পরে নিচ্ছে চিনা শেকল।'

চুপ থাকল লো হুয়াং। তবে কয়েক মুহূর্ত পর অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটাতে বলল, 'প্রতীক আসলে এমনই। আকাশের সূর্যের মত ঝিলিক দেয়। সবার চোখ থাকে ওদিকে। মুগ্ধ। দেখতেও পায় না পাশে কী ঘটছে।'

একান্ন

কয়লা খনির সুড়ঙ্গে বন্দি রানা ও সোহেল। কাঁচা লোহার পুরনো মোটা পাইপে শেকল দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ওদের দু'হাত। পাইপ নেমেছে পাশের কূপে। আবার ছাতের একটা গ্রেট পেরিয়ে চলে গেছে ওপরে।

মাঝে পাইপ, ধরা পড়া চোরের মত মুখোমুখি বসে আছে দু'জন। রানার বামেই গভীর কূপ। সত্যিকারের গাড্ডা যাকে বলে। লো হুয়াঙের লোক শেকলের তালা পরীক্ষা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে ফ্যাসিলিটির দিকে।

'খুবই খারাপ লেগেছে আমার, নিজের সঙ্গে লড়াই করে এভাবে হারলি তুই,' মন্তব্য করল সোহেল।

'আমারও ভাল লাগেনি,' বলল রানা। 'মানুষ পেল এক পয়েন্ট। রেসের সময়। আর রোবটও পেল: এক পয়েন্ট।'

'পিন পয়েন্ট করে বল্ কীসের পয়েন্ট।'

'না, কিছু না,' বলল রানা। 'স্কোর দেখছি।'

বন্ধুর হেঁয়ালি ভুলে চারপাশে চোখ বোলাল সোহেল। সুড়ঙ্গের ছাতে মিটমিট করছে ঘোলা এলইডি বাতি। ভালই দেখা যাচ্ছে তাতে। 'আগেও বিপদে পড়েছি। তবে এবার কিছুই আসছে না মাথায়। লোকগুলো ধরে নিয়েছে, চাইলেও আমরা পালাতে পারব না।'

দেয়ালে দু'পা রেখে গায়ের জোরে পেছনে ছিটকে পড়তে চাইল রানা। ক'ইঞ্চি নড়ল পাইপ, তবে পাথরের দেয়াল থেকে খসে এল না। 'বোধহয় প্রতি দশ ফুট পর পর রিভেট মারা।'

'তো বাকি জীবনেও ছুটতে পারব না,' বলল সোহেল।

কথা ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'শক্তি না খাটিয়েও ছুটে যাওয়া যায়।'

উঠে মাথার ওপরের গ্রেট দেখল। লোহার জালির মত জিনিসটা ময়লায় ভরা। টপটপ করে ওখান থেকে পড়ছে বৃষ্টির পানি। গ্রেটের কিনারা থেকে নেমেছে দেয়াল বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত।

'বৃষ্টির পানি,' বলল রানা। 'এটা এয়ার শাফট। সোজা গেছে ওপরে।'

পাথুরে দেয়ালে ফাটল পেয়ে ওখানে পা রেখে ওপরে উঠছে ও। দেখবে খোলা যায় কি না গ্রেট। পাইপে আটকে রাখা হাতে টান দিয়ে কাত হলো। নিচে অন্ধকার কালো কূপ। কাঁধের গুঁতো দিল লোহার জালি তুলতে।

কাঁচা লোহার পুরু পাইপের মতই সামান্য নড়ল গ্রেট। ওপরে কিছু বাধা দিচ্ছে সরে যেতে। আবারও কাঁধের গুঁতো দিল রানা। কিন্তু সড়াৎ করে পিছলে গেল পা, বেকায়দাভাবে নেমে এল ও। পাইপ ঘষে শেকল নেমেছে বলে ছিলে গেছে

দুই কবজি। তবে ওই শেকল না থাকলে সোজা গিয়ে নিচের কূপে গিয়ে পড়ত ও।

মন খারাপ করে ওর দিকে চেয়ে আছে সোহেল।

একটু পর আবারও কূপে উঁকি দিল রানা। আবছাভাবে দেখছে নিচের বিশ ফুট, তারপর সব অন্ধকার। লাথি মেরে ছোট একটা পাথর কূপে ফেলল ও। কান পাতল।

'খটাং!

'খট!

'টিং!

'ছপ্!'

'নিচে পানি আছে,' বলল রানা।

'খনির নিচের অংশ তলিয়ে গেছে,' বলল সোহেল।

মাথা দোলাল রানা। 'বহু বছর হলো চালু হয় না পাম্প। সাগরের পানি ঢুকেছে। আমরা যদি আর কোনও উপায় না পাই, চেষ্টা করব নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে সাঁতরে বেরিয়ে যেতে।'

'ভুলে গেলি লোহার পাইপে হাত আটকানো?'

'পাইপ ক্ষয়ে যাওয়ার কথা জং-এর জন্যে। বিশেষ করে নিচে যখন লোনা জল।'

নড়েচড়ে বসে কূপে উঁকি দিল সোহেল। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'বুঝলি, নেমে যাওয়া ঠিক হবে না। ধর্, তুই নেমে গেলি পানিভরা খনির খাড়া শাফটে। পাইপ ভেঙে ছুটে গেলি। খুঁজে বের করলি আনুভূমিক সুড়ঙ্গ সাঁতরে যাচ্ছিস অন্ধকারে। শেকলে আটকানো তোর দুই হাত। জানিস না সামনে কী আছে। হয়তো কিছুটা যাওয়ার পর বুঝলি, ধসে পড়েছে ছাত। বা জঞ্জালে আটকে গেছে সুড়ঙ্গ! ...তখন পারবি ফিরতে?'

হতাশ না হয়ে বলল রানা, 'বলব না যে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে শেষ ভরসা হয়তো ওই পথই।'

'বাঁচার উপায় থাকবে না,' বলল সোহেল। 'প্রথম সুড়ঙ্গ

পেরিয়ে হয়তো সামনে পড়ল খাড়া আরেক শাফট। শেকল পরা হাতে উঠে যেতে পারবি?'

'যে এলিভেটরটা দেখেছি, সেরকম পেলে উঠে যেতে ঠেকাবে কে?' হাল ছাড়ল না রানা। 'জানি, যন্ত্রপাতি পুরনো আর বিকল। কিন্তু এলিভেটরের ফ্রেমওঅর্ক বেয়ে সহজেই উঠতে পারব। আগেও এই খনির ছাতে দেখেছি এয়ার শাফট।'

'তোর প্ল্যানে অনেক বেশি "যদি"। শেষে পানি ভরা সুড়ঙ্গে দম আটকে মরব আমরা। লাশও পাবে না কেউ।'

'তাও খারাপ না,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমার লাশে রোবটের পোশাক চড়িয়ে আমাকে পচাতে পারবে না লো হুয়াং লিটন। বুঝতেই পারছিস, আগামীকাল যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হবে, সেটা হবে উনিশ শ' চোদ্দ সালে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউকের হত্যার চেয়েও বেশি সমালোচিত।'

'আশা করি ওটার কারণে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হবে না।'

'যুদ্ধ তো আগেই লেগেছে,' বলল রানা। 'ওই লড়াই প্রভাব বিস্তারের। সঠিক জায়গায় টোকা দিচ্ছে লো হুয়াং লিটন। ভবিষ্যতে হয়তো শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে জাপান ও চিন। তেমন কিছু হলে তার প্রভাব থেকে বাদ পড়বে না বাংলাদেশও।'

'সবই বুঝলাম,' বলল সোহেল। 'এবার আত্মহত্যার প্ল্যান বাদ দিয়ে এখান থেকে বেরোবার ভাল কোনও বুদ্ধি বের কর্।'

রানা জবাব দেয়ার আগেই দেখল সুড়ঙ্গ ধরে আসছে ফ্ল্যাশলাইট। দু'জন তারা। মেঝেতে হেঁচড়ে আনছে অন্য আরেকজনকে।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় রানা চিনল, জণ্ডিস রোগীর মত হলদে মুখের ওরে চিচিওয়াকে। অন্যজন লো হুয়াং লিটনের লোক। দু'হাত ধরে তৃতীয়জনকে টেনে আনছে তারা।

মেঝেতে ছেঁচড়ে আসছে পা। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা ও সোহেল বুঝল, ওই লোক পুলিশের সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরা।

ধুপ্ করে রানা ও সোহেলের পাশে তাকে ফেলল দু'জন। শেকল দিয়ে দু'হাত আটকে দিল লোহার পাইপে। ওরে চিচিওয়ার পাশের লোকটা বোধহয় জেলার। পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলে দিল সোহেলের হাতের শেকলের তালা। ঘাড় ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে।

'ব্রেকফাস্ট রেডি, না?' শুকনো গলায় বলল সোহেল। 'মেন্যু অনুযায়ী সব দিচ্ছ তো?'

কষে ওর গালে চড় দিল চিচিওয়া। তাল হারিয়ে মেঝেতে পড়ল সোহেল। উঠে মুখোমুখি হবে, এমনসময় ওর পিঠে লাগল খুব শীতল কিছু। চিরে গেল ওয়েট সুট, চিরচির করে কাটল ত্বক। সোহেল বুঝল, পিঠে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে ক্ষুরের মত ধারালো কোনও তলোয়ারের ডগা।

'লো হুয়াং বলেছে আপাতত যেন তোমাদেরকে খুন না করি,' বলল প্রেতাত্মা। 'তবে বেশি তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে বাধ্য হয়েই... বুঝতেই পারছ।'

তলোয়ারটা দেখছে রানা। আগে অন্য তলোয়ার ছিল লোকটার হাতে। 'সাবধান, সোহেল, উঠবি না,' সতর্ক করল ও। 'নইলে পিঠে গেঁথে যাবে।'

'বিশ্রাম নিচ্ছি,' বলল সোহেল। পিঠ থেকে তলোয়ারের ডগা সরে যাওয়ায় হাত ও হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল ও। হিংস্র চেহারায় ওকে দেখছে প্রাক্তন ইয়াকুযা খুনি।

'কুত্তা-শালা-শুয়োর কোথাকার, তোর মাফ নেই!' খসখসে গলায় বলল চিচিওয়া। 'এক পা হাঁটতেও টনটনে ব্যথা আমার সারাশরীরে। শয়তান, তোর জন্যেই বারবার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। আর তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে মনে হচ্ছে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব। এসবই হয়েছে, কুত্তা, তোর দোষে!

এজন্যে ভোগান্তি আছে তোর কপালে!'

'দোষটা তো, বাপু, কমোডো ড্রাগনের,' আপত্তির সুরে বলল সোহেল। 'আমি তো ছিলাম নীরব দর্শক।'

'তোরা মরবি ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায়,' বলল প্রেতাত্মা। 'পুড়িয়ে মারব আগুনে। তখন এত রসিকতা আসবে না তোর পেটে। পুড়তে পুড়তে চেঁচাবি আর মরবি।'

সোহেলকে ছেঁচড়ে নিয়ে রওনা হলো ওরে চিচিওয়া আর লো হুয়াঙের লোক। পেছন থেকে চেয়ে রইল অসহায় রানা। ভাবছে, সুযোগটা কি নিতে পারবে সোহেল? খুনিটা ভুলে গেছে শেকল দিয়ে ওর হাত আটকে দিতে।

সোহেলকে নিয়ে লোকদু'জন চলে যাওয়ার পর উবোন হিমুরার দিকে ফিরল রানা। 'সুপারইন্টেণ্ডেন্ট, কী অবস্থা আপনার?'

প্রচণ্ড ব্যথায় মুখ কুঁচকে ওকে দেখলেন হিমুরা। রানা দেখল, মারধর করেনি লোকটাকে। তবে হাতে ব্যাণ্ডেজ।

'সাধুদেরকে মেরে ফেলেছে,' বললেন হিমুরা, 'বাঁচতে দেয়নি একজনকেও।'

'ওরে চিচিওয়া?'

মাথা দোলালেন পুলিশ অফিসার। 'তলোয়ার নিতে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম ফাঁদে ফেলেছি। কিন্তু... মেরে ফেলেছে আমার সঙ্গের অফিসারদেরকে। কেটে নিয়েছে আমার একহাতের প্রায় সব আঙুলের শেষ কড়া।'

মানুষটাকে জ্বরগ্রস্ত মনে হলো রানার।

মেঝের দিকে চেয়ে বললেন, 'অনেক প্রশ্ন করেছে। কারণ বুঝলাম না। জবাব না দিলে বৈদ্যুতিক শক দিয়েছে। বারবার। যখন পড়ে গেছি, একটু পর আবারও শুরু করেছে প্রশ্ন।'

'কী ধরনের প্রশ্ন?'

'নানাধরনের,' বললেন হিমুরা, 'বলল বই পড়ে শোনাতে। কথা বলতে হয়েছে কখনও রাগী স্বরে, আবার কখনও নিচু

গলায়। মনে হয় ওটা কোনও ইন্টারোগেশনের খেলা।'

সোজা হয়ে বসল রানা। 'ওরা আপনার কণ্ঠস্বর আর বাচন ভঙ্গি রেকর্ড করেছে।'

মুখ তুলে ওকে দেখলেন অফিসার। 'কিন্তু কেন?'

'যাতে তৈরি করতে পারে আপনার নকল। আমার নকলও তৈরি করেছে।'

'কী করবে এসব দিয়ে?'

'ওরা এমন রোবট তৈরি করেছে, যেগুলো দেখতে আমাদের মত, কথাও বলবে আমাদের মত। আপনার আইডি কেড়ে নিয়েছে না?'

'সবই,' বললেন হিমুরা, 'এমন কী নিয়েছে আঙুলের ছাপ।'

কাজে ভুল নেই লো হুয়াঙের।

উবোন হিমুরার ফেডারেল পুলিশের আইডি আর আঙুলের ছাপ লাগবে অথেনটিফিকেশনের জন্যে। যাতে রোবট যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায়। তার সঙ্গে যাবে রানার রোবট।

'এবার একইভাবে সোহেলের মুখ খোলাবে ওরা।'

চোখ বিস্ফারিত হলো হিমুরার। 'জবাব না দিলে প্রচণ্ড নির্যাতন করে।'

তাতে সন্দেহ নেই রানার। আপাতত সাহায্য করতে পারবে না সোহেলকে। তবে এ কারণেই জরুরি মুক্ত হওয়া। 'আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?'

চেষ্টা করেও মেঝেতে পড়ে গেলেন হিমুরা। 'না, পারছি না। শরীরে শক্তি নেই।'

মানুষটাকে উঠিয়ে বসাল রানা। 'বিশ্রাম নিন। শক্তি ফিরে পাবেন।'

বড় করে শ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন উবোন হিমুরা। কূপে সাবধানে নামতে লাগল রানা। 'কেউ এদিকে এলে আগে থেকে জানাবেন।'

'কী করবেন আপনি?' জানতে চাইলেন হিমুরা।

'এমন এক ইঁদুর খুঁজব, যেটার লোহার দাঁত। তারপর ওটাকে দিয়ে কাটিয়ে নেব শেকল।'

বায়ান্ন

আধুনিক এক ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল। খুলে নেয়া হয়েছে ওর বুট। ঘরের মেঝে চকচকে লোহা বা ইস্পাতের তৈরি। পায়ের স্পর্শে মনে হচ্ছে ওটা বরফের মত শীতল। ছাতে কিছু উজ্জ্বল বাতি। চোখ সইয়ে নিচ্ছে ও। কুঁচকে ফেলেছে ভুরু।

'কী তোমার নাম?' গোপন স্পিকারে এল প্রশ্ন।

কণ্ঠস্বর চিনল সোহেল। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলা। লো হুয়াং লিটনের ডানহাত। ঘরের চারপাশ দেখল ও। প্লাস্টিকের চার দেয়ালে ঝুলছে ওয়ান-ওয়ে সব আয়না।

'নিজের নাম বলো, নইলে ক্ষতি হবে তোমার।'

প্রতিটি অ্যাংগেল থেকে রেকর্ড হচ্ছে, বুঝল সোহেল। ওয়ান-ওয়ে আয়নার ওদিকে ক্যামেরা। তোলা হচ্ছে থ্রি-ডিমেনশনাল মেযারমেন্ট, সঙ্গে চলছে ডিজিটাইযিং। রানার মতই তৈরি হবে ওর রোবট। কারণ পরিষ্কার। চিচিওয়া বলে ফেলেছে, ওর রোবট কাজ শেষ করলে ওদেরকে মেরে ফেলবে সে।

হেরে যেতে রাজি নয় সোহেল। ঠিক করেছে, নিজ ইচ্ছেয় স্বাভাবিক কথা বলবে না। প্রতিটি কথা ডিজিটাল করে রিমিক্স

শেষে তৈরি হবে নতুন বাক্য। এমন কী শত্রুর সঙ্গে তর্ক করলে বা গালি দিলেও সেটা উপকারে আসবে তাদের।

'নাম বলো!' কড়া সুরে বলল সাবা সাবেলা।

কিছু না কিছু বলতে হবে। নাকি সুরে শুরু করল সোহেল, 'আঁন্নে আঁরে ইতান কী যিঙ্গান্, বাঁউ? আঁরে ডিনার খাওয়াইবেন নি? আফনের বাফে হুয়াং কইসিলো...'

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বুঝে গেছে মস্করা চলছে তার সঙ্গে। সোহেল কথা শেষ করার আগেই এল প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক। থরথর করে কাঁপতে লাগল সারাশরীর। ব্যথা এতই তীব্র, তাল হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সোহেল।

'এর পরেরবার দ্বিগুণ সময় নিয়ে শক দেব,' শান্ত গলায় জানাল সাবেলা। 'এবার দেরি না করে উঠে নিজ নাম বলো।'

যতটা পারা যায় ধীরেসুস্থে উঠল সোহেল। বুঝে গেছে, তাড়া আছে এদের। কাজেই নষ্ট করতে হবে সময়।

এক সেকেণ্ড পর এল আরেকটা শক। শরীরের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে গেল ব্যথা। আড়ষ্ট হলো মাংসপেশি। নিজেকে সামলাতে গিয়ে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে ফেলেছে সোহেল। পাকা তালের মত পড়ল মেঝেতে। শক কেটে যেতেই বড় করে শ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে, ঘুরে এসেছে নরক থেকে।

'উঠে তোমার নাম বলো,' জানাল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। ভাবছে, সে, শালা, এবার রেকর্ড কর কুঁজো আমাকে। মুখ তুলে কাটল ভয়ঙ্কর ভেঙচি। বাঁদরও ওটা দেখলে লজ্জায় মুখ ঢাকত— যা, শালা, কিছুই শিখলাম না সারাজীবনে!

ক্যামেরার দিকে ঘুরে সৌদি আরবের নর্তকীদের মত কোমর ও নিতম্ব দুলিয়ে নর্তন-কুর্দন শুরু করল সোহেল। সেইসঙ্গে বিকট, বেসুরো গলায় নামকরা বাঙালি পপ গায়ক আজম খানের গান: 'আরে, আলালো-দুলাল... আলালো-

দুলাল... তাদের বা...বা... হা...জি...চা...ন, চাঙ্খার পুলে প্যাডেল মেরে...'

'অ্যাই! অ্যাই, চোপ!' কড়া ধমক দিল সাবেলা। 'তোমার নাম বলো!'

গান ও নাচ থামিয়ে অভিমানে গাল ফোলাল সোহেল। 'আঁরে, বাঁউ, আঁর নামডা দি কী কইরবা? ঠিআসে, আঁর নাম গিরিসের দা গেরেট ইস্কান্দার মিয়া!' পরক্ষণে ঝেড়ে দিল বরিশালের খাস ভাষাঃ 'ওরে মোর আল্লা, মোরে সেনো না, হামি অইলাম গিয়া করিম আলী খোন্দকার, তুমার আফন দুলাবাই!'

কথা শেষ হতে না হতেই এল শক। এবার আরও অনেক জোরালো। মেঝেতে পড়ে পানি থেকে তোলা মাছের মত ছটফট করতে লাগল সোহেল। আবছাভাবে ভাবছে, চাইলেও ওকে খুন করতে পারবে না এরা। আগে চাই নকল জিনিস!

পুরো বিশ সেকেণ্ড পর থামল শক। কাঁপছে সোহেলের প্রতিটা পেশি। কনকন করছে দাঁত থেকে শুরু করে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত। হাড্ডি-মাংস গলে যাচ্ছে কি না আল্লা-মাবুদ জানে!

'আমরা হিসাব কষে দেখেছি, কতটা সময় ধরে শক দিলে বড় ক্ষতি হবে না,' চিবিয়ে চিবিয়ে জানাল সাবা সাবেলা। 'চাইলে সারারাত এটা চালাতে পারো। ঠিক আছে, এবার উঠে দাঁড়াও। নাম বলবে, তারপর পড়বে দেয়ালে ফুটে ওঠা প্যারাগ্রাফ।'

দেয়ালে ফুটেছে কালো প্যারাগ্রাফ, আবছা দৃষ্টিতে দেখল সোহেল। ধীরে ধীরে উঠে বসল, যেন পরাজিত। বুঝতে চাইছে, কতক্ষণ নির্যাতন সহ্যের পর খুন হবে। ভাল করেই জানে, প্রাণ থাকতে তৈরি হতে দেবে না ওর রোবট।

দেয়ালে শক্ত করে পা রেখে, জং ভরা পাইপে দু'হাত রাখল

রানা, নামতে লাগল অন্ধকার কূপে। মাত্র দশ ফুট নিচেই লোহার বৃত্তাকার ক্ল্যাম্প। ওটার জন্যে আর নামতে পারবে না ও।

তবে ক্ল্যাম্প ঢিলা হয়েছে গত ষাট বছরের প্রাকৃতিক অত্যাচারে। শেকল পরা দু'হাত সামনে-পেছনে নিয়ে বাধা উপড়ে নিতে চাইল রানা। দেড় মিনিট পর মট্ করে ভাঙল ক্ল্যাম্প্।

হাতের শেকল ওটা পার করিয়ে নেমে চলল রানা। পরের ক্ল্যাম্প জং-এ ভরা, মুচমুচে। শেকল দিয়ে সামান্য চাপ দিতেই মট্ করে দু'টুকরো হলো জিনিসটা।

সাবধানে নামছে রানা। নিচের দিকে বাড়ছে পাইপের জং-এর পরিমাণ। ঘষা লাগতেই জং থেকে পড়ছে লালচে তুষারের মত কণা। জায়গায় জায়গায় পাইপের গায়ে ফাটল, সেখানে আটকা পড়ছে শেকল।

এত দীর্ঘ হয় না কোনও পাইপ। নিশ্চয়ই মাঝে আছে কানেক্টর। ওটা খুঁজছে রানা। অভিজ্ঞতা থেকে ভাল করেই জানে, আগে জং ধরবে সংযুক্ত করার অংশে। সবচেয়ে দুর্বল হবে ওই জায়গা।

ওপর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে বৃষ্টির পানি। নিচে সাগরের পানি উঠে আসছে জোয়ারের কারণে। রানা আশা করছে, একটু পর পাবে পাইপের দুর্বল অংশ। দেখে হয়তো মনে হবে ওটা ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে পচা গাছের কাণ্ডের মত।

কানেক্টর খুঁজছে রানা, হঠাৎ করেই ওর পা ঝুপ করে নামল পানিতে। পিছলে তলিয়ে গেল অন্ধকার কূপের জলে। খড়-খড় শব্দে পাইপ ঘষে নেমে চলেছে শেকল। আরও কয়েক ফুট যেতেই রানার আঙুলে লাগল পাইপের খসখসে এক অংশ। বুঝে গেল, পেয়ে গেছে ঠিক জায়গা। জং-এর এবড়োখেবড়ো অংশে শেকল বসিয়ে পরক্ষণে হ্যাঁচকা টান

দিল রানা।

মড়াৎ শব্দে ভাঙল পাইপের নিচের অংশ। তাতে মুক্ত হলো না রানা। কাটল না বিপদ। পাইপে করাতের মত করে শেকল চালাল ও। খসে পড়ছে জং-ধরা লোহার টুকরো।

হঠাৎ করেই পাইপ ভেঙে বেরিয়ে এল শেকল।

ফুরিয়ে এসেছে দম, সাঁতরে উঠতে লাগল রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর ভুস্ করে ভেসে উঠে বুক ভরে টেনে নিল বাতাস। তাকাল ওপরে। ওদিকের বৃত্তাকার জায়গা থেকে আসছে মৃদু আলো।

চল্লিশ ফুট ওপরে মুক্তি!

রেকর্ডিং বুথে সোহেলের ইন্টারোগেশন দেখছে হুয়াং লিটন, চেহারা গম্ভীর। মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বেশ ক'বার শক দেয়ার পরেও তার মুখ থেকে স্বাভাবিক কথা শুনতে পায়নি তারা। একবার অদ্ভুত এক গান গেয়েছে, অন্য দু'বার বিদঘুটে দুই ভাষায় কী যেন বলেছে। ওগুলো কোনও কাজেই আসবে না।

লোকটা পড়ে আছে স্তূপের মত। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। গাল বেয়ে নামছে দরদর করে ঘাম।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল লো হুয়াং।

'কিন্তু আমরা ভয়েসপ্রিন্ট পাইনি,' বলল সাবা সাবেলা। 'কাজে লাগবে এমন কিছুই বলেনি। রোবটকে কী শেখাব!'

'আপনাকে হারিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছেন না?' বলল লো হুয়াং।

বসকে দেখল সাবেলা।

'ওই লোক জানে আমরা কী চাই,' বলল বিলিয়নেয়ার। 'তাই মরতেও রাজি, দেবে না ভয়েসপ্রিন্ট। আরও চাপ দিলে খুশি মনে মরবে।'

'তা হলে আমাকে কী করতে বলেন, স্যার?' বলল

সাবেলা।

'একে হিসাব থেকে বাদ রাখুন,' বলল হুয়াং। 'তৈরি করুন এর রোবট। ওটা হবে প্রায় বোবা। বাধ্য না হলে মুখ খুলবে না। যা বলার বলবে রানার রোবট। তার সঙ্গে দেখা গেছে সোহেল আহমেদকে, সেটাই দেখুক লোকে। তারপর গাড়িতে করে পালিয়ে যাবে ওরা।'

হতাশ হলেও বসের কথা মেনে নিল সাবেলা। 'ঠিক আছে, স্যর। হয়তো কাজে লাগতে পারে, তাই ওর রোবটের মুখে দেব ব্রিটিশ উচ্চারণের ইংরেজি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি,' বলল লো হুয়াং, 'আমার পাইলটকে জানিয়ে দিন, একটু পর রওনা হব আমরা।'

চরম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সোহেল। ঘামছে কুলকুল করে। ভাবছে, একটু পর আবারও শক দেবে। প্রতিটা শক আরও বেশি সময় ধরে দিচ্ছে। প্রতিবার বাড়ছে ব্যথা। থরথর করে কাঁপছে শরীরের সমস্ত পেশি। মনে হচ্ছে, ভালুকের সঙ্গে কুস্তি করে মরার দশা ওর। এত শক্তি নেই যে উঠে দাঁড়াবে।

পেরিয়ে গেল পুরো এক মিনিট। শক দেয়া হলো না। নিজেকে একটু সামলে নিল সোহেল। ঠিক করেছে, ভুলেও উঠে বসবে না। কে জানে, ওর গান শুনে আর শক দিতে গিয়ে নিজেরাই শক্‌ড্‌ হয়ে গেছে এরা। মেনে নিয়েছে হার।

চুপ করে পড়ে থাকল সোহেল।

একটু পর খুলে গেল ঘরের দরজা। ভেতরে ঢুকল লো হুয়াঙের দু'লোক। সোহেলের দু'হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল তারা। তাদের ওপর ভার চাপিয়ে ঝুলে রইল সোহেল।

প্রথম লোকটা বলল, 'শালার শরীরে আর কিছু নেই।'

ঘর থেকে ছেঁচড়ে সুড়ঙ্গে সোহেলকে আনল তারা। দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি। কয়েক সেকেণ্ড পর সোহেল বুঝল, ওটা হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন। দ্বীপ ছেড়ে

যাচ্ছে হুয়াং লিটন। আগামীকাল ঘটিয়ে দেবে সর্বনাশ। অথচ, সুড়ঙ্গে বন্দি রানা আর হিমুরা। নিজে ও হারিয়ে ফেলেছে শক্তি। হেঁটে যাওয়াই কঠিন। হঠাৎ মনটা দমে গেল সোহেলের।

সুড়ঙ্গ ধরে ওকে হেঁচড়ে নিয়ে চলল লোকদু'জন।

বাঁক নিয়ে এয়ার শাফটের কাছে পৌঁছুল ওরা।

তখনই আবছা আলোয় সোহেল বুঝল, দেয়ালের পাশের পাইপে এখন উবোন হিমুরা থাকলেও উধাও হয়েছে রানা!

তেপান্ন

একজন বন্দি পালিয়ে গেছে বুঝতেই সোহেলকে মেঝেতে ফেলে পাইপের দিকে দৌড় দিল লো হুয়াঙের লোকদু'জন। ডানদিকের গার্ড হিমুরার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধমকে উঠল, 'মাসুদ রানা কোথায়?'

'জানি না,' বললেন পুলিশ অফিসার। 'মনে হয় পালিয়ে গেছে।'

'কী করে? কোথায় গেছে সে?'

'শেকল খুলে ফেলেছিল,' বললেন হিমুরা। 'আপনারা বোধহয় অনেক বেশি ঢিলা রেখেছিলেন।'

'তা হলে তোমাকে ফেলে গেল কেন সে?'

মাথা নাড়লেন অফিসার। 'অকৃতজ্ঞ। চরম অকৃতজ্ঞ! অথচ, কত কিছুই না করেছি তার জন্যে।'

প্রতিটা কথা শুনছে রানা। আছে এয়ার শাফটের দশ ফুট

নিচে। এরপর কী হবে ভাল করেই জানে। পা রেখেছে একটা ক্ল্যাম্পের ওপর। বামহাতে জড়িয়ে ধরেছে পাইপ। ডানহাতে দেয়াল থেকে খসিয়ে নেয়া পাথর।

'পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না,' বলল বামের গার্ড।

ধাক্কা দিয়ে উবোন হিমুরাকে মেঝেতে ফেলল তারা। সুড়ঙ্গের আরও গভীরে ফেলল ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

ওদিকে কেউ নেই।

এবার শাফটে উঁকি দিল বামদিকের গার্ড।

লোকটার মুখ দেখামাত্র গায়ের জোরে পাথর ছুঁড়ল রানা। সরাসরি গার্ডের চোয়ালে লাগল ওটা। ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে গেল মাথা। ওই একইসময়ে তার হাঁটুর নিচে দু'পায়ের জোরালো লাথি বসালেন উবোন হিমুরা।

ধড়াস্ করে কূপের পাশে পড়ল লোকটা।

ওদিকে পাইপ বেয়ে উঠে এসেছে রানা। কাঁধ চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল নিচ থেকে। হুড়মুড় করে কূপে পড়ে দেয়ালে নাক-মুখ ছেঁচে গেল গার্ডের, পরক্ষণে রওনা হলো চল্লিশ ফুট নিচের পানি লক্ষ্য করে। পাঁচ সেকেণ্ড পর এল জোরালো ঝপাস্ আওয়াজ।

একই মুহূর্তে পেছন থেকে দ্বিতীয় গার্ডকে ট্যাকল করেছে সোহেল। সামনের দেয়ালে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা। মেঝেতে পড়েছে সোহেলও। উঠে বসেই গার্ডের কিডনিতে বসাল প্রচণ্ড ঘুষি। বিরতি না দিয়ে পরক্ষণে কপাল নামাল লোকটার চোয়ালের ওপর।

এদিকে কূপ থেকে উঠে এসেছে রানা। ধস্তাধস্তি করছে সোহেল আর গার্ড। একপাশ থেকে লোকটার ঘাড়ে লাথি মেরে তাকে অজ্ঞান করল রানা। নরম সুরে বলল, 'কী রে, তিন টাচে না এর খুন হওয়ার কথা?'

'বুঝলি না, আমি শকড্,' বলল সোহেল। 'তুই যখন আরাম করে সাঁতরে বেড়াচ্ছিস, আমি তখন জীবনের সেরা

অভিনয় করেছি।'

গার্ডের পকেটে চাবি পেয়ে সোহেলের হাতের শেকল খুলল রানা। এরপর মুক্ত করল উবোন হিমুরাকে। নিজের শেকল খুলে ব্যস্ত হাতে গার্ডের শার্ট খুলে গোল্লা তৈরি করে গুঁজে দিল তারই মুখে। হাত-পা শেকলে জড়িয়ে মেরে দিল তালা। উঠে দাঁড়াল গার্ডের পিস্তল হাতে।

'কূপে যে ব্যাটা সাঁতরে বেড়াচ্ছে, তার কী হবে?' জানতে চাইল সোহেল।

মাথা নাড়লেন হিমুরা। 'সাঁতার জানে না, তলিয়ে গেছে।'

পিস্তল হাতে ফিরতি পথ ধরল রানা। পাশে সোহেল। পিছনে ধীর পায়ে হিমুরা। বাঁক নেয়ার আগে থামল ওরা। ওদিক থেকে আসছে পায়ের আওয়াজ।

ছায়া থেকে সাবধানে উঁকি দিল রানা ও সোহেল।

এগিয়ে আসছে হুয়াঙের এক লোক। পরনে সাদা ল্যাব কোট। চোখে ভারী কাঁচের চশমা। পিঠ ভরা দীর্ঘ কালো চুল। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে রেখেছে লম্বা দুটো কাঠের কেস। প্লাস্টিক পেইন্ট করা দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে চোখ থেকে সরিয়ে দিল চুল। টিপল দরজার পাশের বাটন। জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। মৃদু আওয়াজে খুলে গেল কবাট। লোকটা ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ হলো হুশ্ আওয়াজে।

'ব্যাটা বেরিয়ে আসার আগেই, চল্, জায়গাটা পার হয়ে যাই,' বলল সোহেল।

'না,' রাজি হলো না রানা, 'আগে গিফ্ট শপ দেখব।' বাঁক ঘুরে দরজাটার সামনে থামল ও। টেকনিশিয়ানের মতই চাপ দিল বাটনে। জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। হ্যাণ্ডেল মুচড়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

ঘরের দূরে পলিশ করা এক তলোয়ার গভীর মনোযোগে দেখছে টেকনিশিয়ান। নিঃশব্দে তার দশ ফুট পিছনে পৌঁছে গেল রানা। খুকখুক করে কেশে উঠে কক করল পিস্তল।

আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল লোকটা। রানাকে দেখেই তলোয়ার টেবিলে নামিয়ে ঝট্ করে দু'হাত তুলল মাথার ওপর।

'ইংরেজি জানো?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল টেকনিশিয়ান।

'গুড, তো চিনা ভাষায় বলছি, হাঁটু গেড়ে বসো,' বলল রানা।

বেকায়দাভাবে মেঝেতে বসল লোকটা। দু'হাত মাথার ওপর। চোখে পড়ল চুল। গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে সরাতে চাইল ওগুলোকে।

'মাঝে মাঝে চুল কাটলেও তো পারো,' বলল রানা।

মাথা দোলাল টেকনিশিয়ান। কাছের কেস থেকে তলোয়ার নিল রানা। চমৎকার অস্ত্র। ঝিকমিক করছে ল্যাবের ফ্লুরেসেন্ট বাতির আলোয়।

খুলে গেল ঘরের দরজা। ভেতরে ঢুকল সোহেল ও উবোন হিমুরা।

'পেলি স্যুভেনিয়র?' জানতে চাইল সোহেল।

তলোয়ার তুলে দেখাল রানা।

ওটা দেখেই চমকে গেলেন পুলিশ অফিসার। মৃদু কাঁপা গলায় বললেন, 'সাবধান! আপনার হাতে জাপানের জাতীয় সম্পদ!. ওটার নাম হঞ্জো মাসামিউনে। তিয়াত্তর বছর আগে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল শিনটো মন্দিরে।'

টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল রানা। 'লো হুয়াং এসব তলোয়ার দিয়ে কী করবে?'

'ওটা জাপানের প্রতীক,' বলল টেকনিশিয়ান।

'আর অন্যগুলো?'

দ্বিধা করল লোকটা। 'আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।'

'তা বুঝলাম,' ল্যাবের নানা ইকুইপমেন্ট দেখছে রানা। 'কিন্তু কেন? তলোয়ারে কী খুঁজছে লো হুয়াং?'

‘একটা অ্যালয়,’ বলল টেকনিশিয়ান, ‘সোনালি শিখা। খুবই দুর্লভ। এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে সামান্য পরিমাণে। আগ্নেয় ফাটলের ভেতর। আমরা ধারণা করছি, ওটা আছে জাপানে। আর এসব তলোয়ারের একটা তৈরি হয়েছে ওই অ্যালয় দিয়ে। জানতে হবে কীভাবে তৈরি হলো তলোয়ারটা। তার চেয়েও বড় কথা, কোন্ খনি থেকে এল ওই অ্যালয়।’

ভুরু কুঁচকে ফেলল সোহেল। ‘আমরা এখন জানি, চিনের পুব সাগরে কী খুঁজছিল লো হুয়াঙের লোক।’

‘প্রথমে ওখান থেকেই সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়,’ বলল টেকনিশিয়ান। ‘কিন্তু তারপর ফুরিয়ে গেল খনি।’

‘সাগরের নিচে কীভাবে খনি চালু করেছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘আল্ট্রাসনিক ওয়েভ ও হাই-ইনটেনসিটি ভাইব্রেশনের মাধ্যমে। সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কার্বন সিলিকন ফ্র্যাকিং লিকুইড। ইউনিক সিস্টেম, গভীর খনিতে ড্রিল না করেও তোলা যায় “ওর”।’

‘ওই “ওর”-এর সঙ্গে গভীর থেকে উঠছে কোটি কোটি গ্যালন পানি, সেটা জানো?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘প্রসেসের সময় পানি বেরোয়ই,’ বলল টেকনিশিয়ান, ‘তবে সেটা বেশি নয়।’

‘বেশি নয়?’ ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ‘তোমরা তো হলে কিছুই জানো না। তোমাদের তৈরি ফাটল থেকে প্রতি সেকেণ্ডে বেরোচ্ছে কোটি কোটি গ্যালন পানি। আমরা ঠেকাতে না পারলে আগামী একবছরে তলিয়ে যাবে অনেকগুলো নিচু দেশ।’

‘অসম্ভব,’ মাথা নেড়ে বলল লোকটা।

‘হাড়ে হাড়ে সব টের পাবে,’ বলল রানা।

‘চল, বেরিয়ে যাই,’ তাড়া দিল সোহেল। ‘যে-কোনও সময়ে কেউ বুঝবে আমরা শাফটে নেই।’

ঠিকই বলেছে সোহেল। টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল রানা। 'প্রথম যখন এলাম, সঙ্গে ছিল একটা ইকুইপমেন্ট ব্যাগ। ওটা এখন কোথায়?'

লোকটার চোখ গেল লকারের দিকে। চোখ অনুসরণ করেছে সোহেল। লকার খুলে ওদের ব্যাগ বের করে নিল ও। ভেতরে রয়েছে সুইম ফিন, মাস্ক আর অক্সিজেনের ছোট বোতল। পাশেই ইনফ্রারেড গগল্‌স্। 'সবই আছে। বাদ পড়েনি আমাদের রেডিয়ো ট্র্যান্সিভার।'

'অস্ত্র?' জানতে চাইল রানা।

আরও ক'টা লকার ঘেঁটে দেখল সোহেল। 'না। নেই।'

নিজের পিস্তল ওর হাতে দিল রানা। তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, 'এটাই সই। কাজ শেষে ফেরত দেব সত্যিকারের মালিকের কাছে।'

পিস্তলের চেম্বারে গুলি আছে, দেখল সোহেল। তলোয়ার নাচিয়ে টেকনিশিয়ানকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করল রানা। 'আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ। আরও অনেক কিছু বেরোবে তোমার পেট থেকে।'

তোয়ালে দিয়ে লোকটার মুখ বাঁধলেন উবোন হিমুরা। তার বেল্ট থেকে নিলেন রেডিয়ো। দরজা খুলে সুড়ঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কেউ নেই। 'এবার যাওয়া যাক।'

সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চলেছে ওরা। কিছু দূর যেতেই সামনে পড়ল অ্যাসেম্বলি রুম। ওটা পাশ কাটিয়ে যেতেই হঠাৎ খুলে গেল পেছনের ওই ঘরের দরজা। বেরিয়ে এসেছে দুই চিনা কর্মী। রানা আর সোহেলের মাঝে মুখ বাঁধা টেকনিশিয়ানকে দেখেই সব বুঝে নিল তারা।

ধাক্কা দিয়ে টেকনিশিয়ানকে সরিয়ে তলোয়ার হাতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। কিন্তু দু'লাফে দরজার ওদিকে গেল লোকদুটো। পেছনে আটকে দিল কবাট। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর ইণ্টারকমে এল ঘোষণা: 'ছুটে গেছে বন্দিরা! প্রধান সুড়ঙ্গে! আবারও

বলছি: বন্দিরা এখন প্রধান সুড়ঙ্গে!'

ঠেলা দিয়ে টেকনিশিয়ানকে মেঝেতে ফেলল রানা। তাকে নিলে ধীর হবে গতি। এবার পালাতে হবে লেজ তুলে। 'চল্, চল্, হিমুরা আসুন!'

সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা তিনজন।

চুয়ান্ন

রেডিয়ো রুম থেকে বিমর্ষ মনে বেরোতে যাচ্ছে সাবা সাবেলা, এমনসময় ইন্টারকমে শুনল ঘোষণা। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে যোগাযোগ করল সে, 'ওরা কোথায়?'

'প্রধান সুড়ঙ্গে। অ্যাসেম্বলি রুমের বাইরে। হাতে অস্ত্র, স্যর! ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক টেকনিশিয়ানকে!'

সাবেলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চিচিওয়া। কড়া সুরে বলল, 'অ্যালার্ম বাজিয়ে দিন।'

'এটা কি মিলিটারি বেস পেয়েছেন?' বিরক্ত হয়ে বলল সাবেলা। 'আমাদের কোনও অ্যালার্ম নেই।'

চোখে আগুন নিয়ে তাকে দেখল প্রেতাত্মা। আরও কিছু বলতে গিয়েও চুপ মেরে গেল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ইন্টারকমের প্যানেলে টিপল অন্য বাটন। যোগাযোগ করছে কন্ট্রোল রুমে। 'অ্যাই, আমি সাবা সাবেলা! পালিয়ে গেছে বন্দিরা। ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এক টেকনিশিয়ানকে। লোক জড় করে ধরো ওদেরকে!'

ওদিক থেকে সাড়া নেই। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর বলল

একজন, 'দ্বীপের বাইরের দিকে আমাদের লোক পাহারা দিচ্ছে।'

'ডেকে আনো।'

'তাতে লাভ হবে না। লোকগুলো প্রধান সুড়ঙ্গে থাকলে এতক্ষণে কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'আগেই হুয়াংকে বলেছি, এরা শেষ করবে আমাদেরকে,' আফসোস করল ওরে চিচিওয়া।

'আপনি খামোকা ঘাবড়ে যাচ্ছেন,' বলল সাবেলা। 'খনি থেকে বেরোলেও দ্বীপ থেকে বেরোবার উপায় নেই। হেলিকপ্টার চলে গেছে। কোনও বোটও নেই। কী করবে তারা? সাঁতরে যাবে?'

রক্তচক্ষু করে তাকে দেখল ওরে। 'ঠিক তাই করবে ওরা। নুমার লোক। পরনে ছিল ওয়েট সুট। সাধে তো আর সঙ্গে করে ফিন আর মুখোশ আনেনি।'

'সাঁতরে যাওয়া অসম্ভব,' তর্ক জুড়ল সাবেলা। 'এখান থেকে মূল ভূখণ্ড পুরো তিন মাইল দূরে। সাগরে নামলে জোর স্রোত নিয়ে ফেলবে বিশ মাইল দূরে। লাশ পাব পরে।'

'পুলিশ অফিসারের কথা জানি না, তবে অন্য দু'জন নুমার লোক, তার ওপর ওরা বাঙালি। ওই দেশে একটু পর পর বিশাল সব নদী। মায়ের পেট থেকে পড়েই সাঁতার শেখে ওরা। যদি ভাবেন জাপানের মূল ভূখণ্ডে গিয়ে উঠতে পারবে না, তো আপনি আছেন বোকার স্বর্গে। একঘণ্টার বেশি লাগবে না তীরে উঠতে। তা ছাড়া, হয়তো সাগরে রেখে এসেছে বোট। ওখানে লোক আছে তাদের।'

বিপদ কত বড়, ভাবতে গিয়ে সত্যিই ঘামতে লাগল সাবা সাবেলা। হুয়াঙের কথা মেনে দ্বীপে বোট রাখা হয়নি। কিন্তু একবার মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ আর উবোন হিমুরা দ্বীপ থেকে সাগরে নামলে কে ঠেকাবে তাদেরকে? আবারও ইন্টারকমের বাটন টিপল সে। 'কন্ট্রোল রুম, তোমাদের সঙ্গে

ক'জন আছে?'

'দলে সিকিউরিটির দশজন, এ ছাড়া আছেন আপনি আর টেকনিশিয়ানরা।'

এত কম লোকে কিছুই হবে না।

'চালু করো ওঅর-বট,' জানাল সাবেলা, 'ওগুলোকে রাখবে সার্চ অ্যাণ্ড ডেস্ট্রয় মোডে।'

'কিন্তু বাইরে আমাদের লোক আছে,' আপত্তির সুরে বলল ইনচার্জ।

'হাতে সময় নেই যে নতুন করে ওঅর-বট রিপ্রোগ্রামিং করব,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, 'বাইরে যারা আছে, বলো দেয়ালের কাছে যেন থাকে। পাহারা দিক সিঁড়ি। আটকে দেবে সাগরে যাওয়ার পথ। এদিকে ওঅর-বট ছড়িয়ে দিয়ে পলাতকদেরকে ধাওয়া দেব আমরা। তাড়া খেয়ে আমাদের লোকের হাতে ধরা পড়বে তারা। সাগরে কাউকে দেখলে দেরি না করে গুলি করবে। এবার ধরতে হবে না কাউকে।'

'জী, স্যর।'

শিরার মাঝে অ্যাড্রেনালিন টগবগ করছে সাবেলার।

নতুন চোখে তাকে দেখছে চিচিওয়া। আগে ভাবেনি, এ লোকের মেরুদণ্ড আছে।

'জানতাম না যে আপনার ভেতর এই জিনিস আছে।'

'কী জিনিস?'

'এত সাহস! বুঝিনি এত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে বলতে পারবেন।'

'হয় ওরা মরবে, নইলে আমরা,' বলল সাবেলা। 'এর এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। পলাতকরা জাপানের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুলে এ দ্বীপ হবে আমাদের জন্যে বন্দিশালা।'

সুড়ঙ্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রানা, সোহেল ও হিমুরা। রাতের আকাশ ভেঙে ঝরছে বৃষ্টি। পরিবেশ বেশ শীতল।

পাহাড়ের গায়ে থোকা থোকা ধূসর কুয়াশার ফুল।

নিশ্চয়ই এবার খুন করতে পিছু নেবে হুয়াঙের লোক। সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে এক শ' গজ দূরের প্রথম ব্যাড়িটাতে ঢুকল ওরা। অন্ধকারে বসল মেঝেতে। টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া রেডিয়ো চালু করতেই শুনল বিপক্ষ দলের কথাবার্তা।

রানার দিকে তাকালেন হিমুরা। 'সব বুঝতে পারছি না। চিনা ভাষা।'

'বলছে, যাতে তাদের লোক সাগরের তীরে বাঁধের কাছে থাকে,' বলল রানা। 'এদিক থেকে তাড়া করবে ওঅর-বট। বোধহয় সশস্ত্র রোবট।'

প্রায় ধসে পড়া বাড়ি থেকে সুড়ঙ্গের দিকে চেয়ে রইল ওরা। সবার আগে প্রথমে দেখল রানা, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল লন মোয়ার আকৃতির এক মেশিন। ছয়টা পা ওটার। প্রকাণ্ড মাকড়সার মত। মাথায় এলইডি বাতি। ওটা যেন ভয়ঙ্কর দানবের চোখ। এ বাড়িটার দিকে ঘুরল ওঅর-বট।

'আড়ালে থাকুন,' হিমুরাকে বলল রানা।

কংক্রিটের দেয়ালের ওদিকে সরে বসল ওরা। সাবধানে পিলারের পাশ থেকে উঁকি দিল রানা। রীতিমত মার্চ করতে করতে উল্টো দিকে রওনা হয়েছে কুৎসিত মেশিনটা।

'যাচ্ছে কোথায়?' জানতে চাইলেন হিমুরা।

'ডকের দিকে,' বলল রানা। 'যাতে ওদিক দিয়ে সাগরে নেমে যেতে না পারি।'

'ওটা কি যান্ত্রিক মাকড়সা?' জানতে চাইল সোহেল।

'লো হুয়াং লিটন বলেছিল ওই জিনিস ওঅর-বট,' বলল রানা। 'ফ্যাক্টরির ভেতরে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে লড়াই করে।' সোহেলের হাতের পিস্তল আর নিজের তলোয়ার দেখাল ও। 'এসব দিয়ে সুবিধে হবে না।'

সুড়ঙ্গ থেকে বেরোল আরও দুটো মাকড়সা-মেশিন।

আলাদা দুটো পথে গেল ওগুলো। 'ছড়িয়ে পড়ছে,' বলল রানা। 'কতগুলো আছে জানি না, তবে একটা না একটা এদিকে আসবে।'

'তা হলে সাগরতীরে যাওয়া কঠিন হবে,' বলল সোহেল, 'দ্বীপ থেকে নেমে যাওয়ার মত পথ মানেই হয় সিঁড়ি, নইলে ডক।'

'ধরে নিন ওদিকটা পাহারা দিচ্ছে,' বললেন হিমুরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'শেষ উপায় বোধহয় ওই উঁচু দেয়াল থেকে সাগরে ঝাঁপ দেয়া।'

'পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে পড়ব বিক্ষুব্ধ সাগরে,' মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু ওখানে আছে বড় বড় পাথরখণ্ড আর কংক্রিটের পাইলিং। ভুল ঢেউয়ে ঝাঁপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে মরব। তা ছাড়া, বেঁচে গেলেও বড় ঢেউ আছড়ে ফেলবে পেছনের দেয়ালের ওপর।'

'বেশ ক'বছর আগে এখানে ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম,' বললেন হিমুরা। 'সাগরে ওখানে আছে চোরাস্রোত। এই হাত নিয়ে সাঁতরাতে পারব না। আমাকে বরং রেখে যান। মেশিনগুলোকে নেব ভুল দিকে। সেই সুযোগে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাবেন আপনারা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে এখানে আসিনি। তা ছাড়া, সাঁতার কাটতে না পারলে উড়ে যাব।'

মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ ও উবোন হিমুরা খনি থেকে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে নিরাপদ রেকর্ডিং রুম থেকে বেরোল চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলো। চলেছে কণ্ট্রোল রুম লক্ষ্য করে। পাশেই ওরে চিচিওয়া। পাশের দেয়ালে তলোয়ার দিয়ে বিশ্রী আওয়াজ করে, হাড় জ্বালিয়ে মেজাজ বিগড়ে দিচ্ছে লোকটা। কপাল ভাল, ওই তলোয়ার হঙ্গো মাসামিউনে নয়।

মিউরামাসার তলোয়ারের ডগা থেকে বারবার ছিটকে উঠছে কমলা ফুলকি।

'বিশ্রী আওয়াজটা বন্ধ করবেন?'

কথা পাত্তা দিল না চিচিওয়া। কন্ট্রোল রুমে যাওয়ার পুরো পথ তলোয়ার ঘষল দেয়ালে। যেন শান দিচ্ছে ফলা।

সাবা সাবেলা ও ওরে চিচিওয়া ঘরে ঢুকতেই চমকে তাদের দিকে তাকাল গার্ডদের নিয়ন্ত্রক।

'বুঝলে ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সাবেলা।

'এখনও না।'

কাছের কন্সোলের সামনে থামল সাবেলা। নানান এলাকায় ষোলোটা ওঅর-বটের ক্যামেরা থেকে আসছে ষোলোটা স্ক্রিনে ভিডিয়ো। ওই ষোলো ওঅর-বটের পেছনে চলেছে আরও ষোলোটা। একটা বাড়ির ছাতে বসানো ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা গেল, খনি থেকে বেরিয়ে গোটা দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ছে বত্রিশটা ওঅর-বট।

সাবেলার পাশে থেমে ওই দৃশ্য দেখল ওরে। 'আপনি তো দ্বীপের পশ্চিম দিক খালি করে রেখেছেন।'

কথা ঠিক।

সহজ সুরে বলল সাবেলা, 'ওদিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে সাগরে নামতে পারবে না কেউ। তা ছাড়া, মূল ভূখণ্ডে যেতে চাইলে যাবে পুবে। নইলে চোরাস্রোত টেনে নেবে মাঝ সাগরে।'

'আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না, ওরা কত ভয়ঙ্কর লোক,' বলল ওরে।

'জানি ওরা ট্রেইণ্ড ডাইভার, তবে এত বোকা নয় যে জেনেবুঝে আত্মহত্যা করবে,' বলল সাবেলা। 'ওরা যদি সাগরে নামতেও পারে, ওপর থেকে গুলি খেয়ে মরবে। যেতে হলে তারা যাবে পুব দিকে।'

তর্কে গেল না ওরে চিচিওয়া।

নতুন নির্দেশ দিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, 'সাগর-তীরে পাঠাও কয়েকটা ওঅর-বট। তীর পাহারা দেবে। লোকগুলোকে দেখামাত্র যেন গুলি করে।'

দ্বিধায় পড়ল কন্ট্রোলার। 'যত ছড়িয়ে দেয়া হবে জাল, ফাঁক তৈরি করে বেরোবার সম্ভাবনা তত বাড়বে।'

'প্রতিটি ওঅর-বটের আছে ওয়াইড-ফিল্ড ইনফ্রারেড সেন্সর,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সাবেলা। 'সাধারণ এক শ' সৈনিক যে এলাকা কাভার করবে, সেটা করবে দশটা ওঅর-বট।'

'কিন্তু লোকগুলো কোনও বাড়িতে লুকিয়ে থাকলে?'

'তা হলে সরাসরি আমাদের পাতা ফাঁদে পড়বে তারা। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে নাগাসাকির অপারেশন। খুন হবে প্রধানমন্ত্রী আর কেবিনেট মন্ত্রী। সবাই দেখবে হত্যার পেছনে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ আর উবোন হিমুরা। পুলিশ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর হাজার হাজার লোক পাগল হয়ে উঠবে তাদেরকে গ্রেফতার করতে। কোথাও পালাতে পারবে না তারা।'

পরবর্তী বাড়ির কোণে পৌঁছে উঁকি দিল রানা। সরু সব গলির চৌমাথায় পাহারা দিচ্ছে ওঅর-বট। অন্যগুলো চলেছে আরও দূরের টার্গেটে।

বাড়ির আরেক কোনা থেকে রানার কাছে ফিরল সোহেল। 'বাড়ির ওদিকে আরেকটা।'

'এদিকে আসছে?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'চৌমাথা পাহারা দিচ্ছে।'

'এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে,' বললেন হিমুরা। 'পালিয়ে যাওয়ার পথ রাখছে না। এরপর শুরু করবে সার্চ। ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা।'

হুয়াঙের কথা মনে পড়ল রানার। একসময় পুলিশের কাজ

করবে এসব মেশিন। 'চারপাশের কয়েক ব্লক কাভার করছে,' বলল ও। 'ওঅর-বট এড়াতে পারলেও সাগর-তীরে থাকবে হুয়াঙের সশস্ত্র লোক।'

দ্বীপের কোথায় আছে ওরা, মনের চোখে দেখল রানা। ক'মুহূর্ত পর বলল, 'সিঁড়ি খুঁজে ওপরে উঠতে হবে।'

'তারপর?' জানতে চাইল সোহেল।

'আমার ভুল না হলে, এ বাড়ির ছাত থেকে সরু একটা বিম গেছে পাশের বাড়ির ছাতে। সেতু নয়, তবে সতর্ক থাকলে পেরোতে পারব ওটা।'

'তাতে এড়াতে পারব এসব ওঅর-বট,' বলল সোহেল, 'কিন্তু তারপর?'

'এরপর খাটাতে হবে নতুন কৌশল,' বলল রানা।

গম্ভীর হয়ে গেল সোহেল। 'যা ভাবছি, তুই সেটা ভেবে থাকলে, ভাল হতো তুই না ভাবলেই।'

'এ ছাড়া উপায় নেই,' বলল রানা।

'আপনারা গোয়েন্দা বইয়ের লেখকদের মত সূত্র গোপন করছেন,' বললেন হিমুরা, 'আসলে কী করতে চান?'

'ওঅর-বটগুলোকে লোভ দেখিয়ে সরাতে হবে,' বলল রানা। 'যে ক'টাকে পারা যায়।'

'আর তারপর?'

'এ বাড়ির ছাতে উঠবেন আপনারা। এদিকে আমি চারপাশে জড় করব ওঅর-বট। পরে ছাতের বিমে উঠে যাব পাশের বাড়ির ছাতে। চাইলেও পিছু নিতে পারবে না।'

'এসব মেশিন পিছু নিলে?' জানতে চাইলেন হিমুরা।

'মনে হয় না পারবে,' বলল রানা, 'হুয়াঙের গাড়ির রোবট শুধু চিনত পরিচিত পথ। যখন মাঝের মাঠ পেরোলাম, তখনও ওটা গেছে ট্র্যাক ধরে। ওঅর-বটকে ওই ধরনের প্রোগ্রামিং দিলে, প্রায় ভাঙা বিমে উঠে পিছু নেবে না।'

মৃদু মাথা দোলালেন পুলিশ অফিসার। 'তার মানে, ওরা

যখন আবারও নেমে পিছু নেবে, ততক্ষণে আমরা পেরিয়ে গেছি বেশ কয়েকটা বাড়ি?'

'মন্দ নয় প্ল্যান,' বলল সোহেল। 'তো এবার আকর্ষণ করতে হবে ওগুলোর মনোযোগ।'

'তোরা সিঁড়ি বেয়ে উঠবি, আমি জানিয়ে দেব আমরা এখন এখানে,' বলল রানা।

'ঝুঁকিটা বরং আমিই নিই,' বলল সোহেল। 'তুই ছাতে ওঠ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। তুই থাকবি অফিসার হিমুরার পাশে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি তাঁকে।'

রানা গম্ভীর দেখে তর্ক করল না সোহেল।

উবোন হিমুরা ও সোহেল সিঁড়ি খুঁজে উঠতে শুরু করার পর সতর্ক পায়ে বাড়ির সামনের দিকে এল রানা। দু'দিকের কোণে ছয়টা করে পা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই ওঅর-বট। বামেরটা কাছে। প্রতিটা বটের আছে শক্তিশালী ক্যামেরা। ভালভাবেই দেখবে। বাড়ি থেকে এক পা বেড়ে থমকে গেল রানা। যে-কেউ ভাববে, ওঅরবট দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওর দিকে ঘুরে গেল দুই মাকড়সা-রোবট।

বুকে লাল লেযারের বিন্দু তাক হতেই ঝাঁপ দিয়ে বাড়িতে ঢুকল রানা। খ্যাট-খ্যাট আওয়াজে গর্জে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র। মেঝেতে পড়ে আছে রানা। মাথার ওপর দিয়ে গেল অন্তত দশটা গুলি।

দ্রুত ক্রল করে বাড়ির সিঁড়ি লক্ষ্য করে চলল রানা। বুঝে গেছে, পিছু নেবে মেশিনগুলো। পেছনে আবারও গর্জে উঠেছে রাইফেল। ওপরের দেয়ালে লাগল গুলি।

'দেখে ফেলেছিস?' বিড়বিড় করল রানা, 'তো এবার ধর্ তো দেখি!'

টাইটেনিয়ামের পা ফেলে কংক্রিটের মেঝেতে খট-খট শব্দে আসছে ওগুলো। উঠেই দুই লাফে সিঁড়ির সামনে পৌঁছুল

রানা। ঝড়ের বেগে উঠে এল দোতলায়। ততক্ষণে বাড়িতে ঢুকেছে ওঅর-বট। মাথা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে স্ক্যান করছে একতলা।

ধুপ-ধাপ শব্দে আরও চারতলা উঠে গতি কমাল রানা। দু'দিকের খালি ঘরে জানালার কোনও চৌকাঠ নেই। সামনের ঘরের হাঁ করা চৌকো গর্ত দিয়ে নিচে দেখল রানা। নানাদিক থেকে এই বাড়ির দিকে আসছে ওঅর-বট।

ওর প্ল্যানে কাজ হলেও বেড়েছে বিপদের মাত্রা। যা ভেবেছে, তার চেয়ে ওঅর-বটের গতি অনেক বেশি। উঠে আসছে খট-খট শব্দ তুলে। মাত্র দুইতলা নিচেই প্রথমটা।

পরের কয়েকতলা রকেট বেগে উঠল রানা। আশপাশে দরজা নেই যে আটকে দেবে। বাধা দেয়ারও উপায় নেই। ঠেকাতে পারবে না মেশিনের গতি। তা ছাড়া, নিজেই সিমুলেশনের সময় ফ্যাক্টরিতে দেখেছে, সব দরজা ভেঙে ঢুকেছিল ওই জিনিস।

অষ্টমতলায় উঠে সোহেল আর হিমুরার তৈরি আওয়াজ শুনল রানা। কী যেন ভাঙতে চাইছে তারা। 'কী করিস্, সোহেল?' জানতে চাইল ও।

'তোর প্রথম ভুল শুধরে নিতে চাইছি,' বলল সোহেল। 'ছাতে ওঠার দরজায় বিশাল তালা। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছি।'

'একটা ভুল কিছুই না,' আত্মসমর্থন করল রানা। পরক্ষণে জানাল, 'আরও ভুল হয়েছে। অন্যগুলোর জন্যে থামছে না প্রথম ওঅর-বট। উঠে আসছে সাক্ষাৎ ইবলিসের মত।'

'গতি কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর,' বলল সোহেল।

'কাজটা অত সহজ না,' বলল রানা। 'খারাপই লাগছে, সে আমলে তলোয়ারের বদলে রকেট লঞ্চার তৈরি করেননি মাসামিউনে!'

'অন্য উপায় বা পথ খুঁজব?' ওপর থেকে জানতে চাইল

সোহেল।

প্রায় অন্ধকারে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। ওর মনে হলো কাজে লাগতে পারে একটা জিনিস। পাল্টা চেঁচাল ও, 'না, নিজেদের কাজ চালিয়ে যা!'

'তুই কী করবি?'

'জরুরি কাজে নিয়োজিত।'

'ঢাকার মিউসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ির মত হাল তোর?'

জবাব দিল না রানা।

দরজা ভাঙতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সোহেল ও হিমুরা।

সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে প্রায় ভাঙা রেলিঙে সাঁই করে হঞ্জো মাসামিউনে চালাল রানা। কয়েকবার তলোয়ার চালাবার পর কাটা পড়ল নিচের জং ধরা কয়েকটা লোহার, রড। ঝুলছে সিমেন্টের বড়সড়ো পিণ্ড। ওটাকে সিঁড়ির মুখে রাখল রানা। কাজ শেষে উঠে এল ওপরতলায়। এদিক ওদিক তাকাল। একটু দূরে দেয়ালের বড় এক অংশ ধসে পড়ে তৈরি করেছে স্তূপ। মেঝে থেকে মাঝারি কংক্রিটের খণ্ড তুলতে চাইল ও। কিন্তু অনেক বেশি ওজন। এবার নিচু হয়ে দু'পায়ে ওটাকে ঠেলে নিল সিঁড়ির দিকে। মেঝেতে বিশ্রী আওয়াজ তুলছে কংক্রিট। কয়েক মুহূর্ত পর ওটা রাখল ভাঙা রেলিঙের পাশে। হাঁপিয়ে গেছে। অপেক্ষা করছে ধৈর্যের সঙ্গে।

মাত্র দোতলা নিচেই ওঅর-বট। স্ক্যান করছে, তারপর উঠে আসছে একতলা করে। হিট সিগনেচার পেলেই শুরু হবে গুলি।

আরেকতলা ওঠ, দুষ্ট মাকড়সা, বিড়বিড় করল রানা। ক'মুহূর্ত পর সিঁড়ির বাঁক ঘুরে দশ ফুট নিচে পৌঁছে গেল ওঅর-বট। এজন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা, দু'হাতের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দু' শ' পাউণ্ডের কংক্রিটের পিণ্ড ফেলল সরাসরি ওঅর-বটের ওপর। যন্ত্রটা চাপা পড়ল কংক্রিটের চাকার

নিচে। খটাং আওয়াজ শুনে মনে হলো ভেঙে গেছে কয়েকটা পা। রুটির মত চ্যাপ্টা হয়েছে যন্ত্রটা।

ছয় পা ছয় দিকে ছড়িয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো বারোটা বেজে গেছে ওটার। কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর নড়ল মেশিন, অবিশ্বাস্য শক্তি ব্যয় করে ঝেড়ে ফেলল পিঠ থেকে কংক্রিটের পিণ্ড। আবার উঠে দাঁড়াল ছয় পায়ে ভর করে।

'চেপ্টে গেলেও এত সহজ প্রাণী না তেলাপোকা,' বিড়বিড় করল রানা।

ওপরে মাথা তাক করল ওঅর-বট। রানাকে দেখেই তাক করল টার্গেটিং লেযার। পরক্ষণে পাঠাল গুলি।

ডাইভ দিয়ে দূরে গিয়ে পড়েছে রানা। গুলি খেয়ে মরতে হলো না ওকে। নিচ থেকে এল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা সিঁড়ি।

এগিয়ে রেলিঙের পাশ থেকে উঁকি দিল রানা। গুলি ছুঁড়তেই ফেটে গেছে ওঅর-বটের অস্ত্রের ব্যারেল। ওপর থেকে পড়া ভারী কংক্রিটের স্ল্যাবের চাপে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল ওটা। ফলাফল ওই বিস্ফোরণ।

মেশিনটা পুরো ধ্বংস হয়নি, তবে গুলি করতে পারবে না। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা। ওপরতলায় পৌঁছে দেখল দরজা খুলেছে সোহেল ও হিমুরা। বৃষ্টির মাঝে ছাতে উঠে পেছনে দরজাটা আটকে দিল রানা। ছাতের কিনারায় পৌঁছে পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে আছে সোহেল ও হিমুরা। চেহারা দেখে মনে হলো খুব নাখোশ।

'বুঝলি, রানা, ইন্তেকাল করেছে ওই বিম,' শুকনো গলায় বলল সোহেল।

'থাকার তো কথা,' বলল রানা।

আঙুল তাক করে দেখাল সোহেল। ছাতের এদিকে বিমের ভাঙা অংশ রয়েছে মাত্র ছয় ইঞ্চি। ইতিহাসবেত্তার ভঙ্গিতে

বলল ও, 'আজ থেকে বহুকাল আগে এখানেই ছিল সেই বিম, সময়টা ছিল বাদশা আকবরের আমল।'

মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল রানা, 'পুরনো ছবি কখনও বিশ্বাস করতে নেই!'

ছাতের কিনারা থেকে নিচে তাকাল ও। নানাদিক থেকে এ বাড়ির দিকে আসছে অন্তত এক ডযন ওঅর-বট! অন্যগুলো বোধহয় ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতর।

'তোর প্ল্যানের আর সব ঠিক,' ঢোক গিলল সোহেল, 'আসছে লড়াকু মেশিন।'

'এবার?' রানার দিকে ফিরলেন হিমুরা।

পাশের বাড়ি দেখল রানা। মাঝের ব্যবধান মাত্র ছয় ফুট। আধতলা নিচে ওদিকের বাড়ির ছাত। তলোয়ার তাক করে পাশের বাড়ি দেখাল ও। 'একমাত্র উপায় লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া।'

পরস্পরকে দেখল ওরা তিনজন, তারপর পিছিয়ে গেল কয়েক ফুট। দৌড়ে গিয়ে পেরোতে হবে মাঝের দূরত্ব। বহু নিচে কংক্রিটের চাতাল বুকে নিয়ে হাঁ করে আছে কালো অন্ধকার।

'বিকল হয়েছে নয় নম্বর ওঅর-বট,' জানাল কন্ট্রোলার।

ফাঁকা স্ক্রিনের দিকে তাকাল সাবেলা। 'কী হয়েছে?'

'বুঝলেন না?' খেঁকিয়ে উঠল চিচিওয়া। 'বিস্ফোরিত হয়েছে ওটার রাইফেলের ব্যারেল। কংক্রিটের চাকা পড়ে বাঁকা হয়েছিল। মানুষ হলে আপনার পোকা ভুলেও গুলি ছুঁড়ত না। আবার আপনারা বলেন এসব রোবট নিখুঁত!'

'অন্যগুলো খতম করবে ওদেরকে,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সাবেলা। 'ওই ছাত থেকে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।'

অন্যান্য ভিডিয়ো ফিডের দিকে তাকাল সে। ক্ষতিগ্রস্ত

ওঅর-বট পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে অন্যগুলো। একটু পর পৌঁছুবে গন্তব্যে। মাত্র বিশ সেকেণ্ড পর দরজা বিধ্বস্ত করে ছাতে উঠে গেল ওগুলো।

আধমিনিট পর বলল কন্ট্রোলার, 'আশপাশে কোনও টার্গেট নেই।'

'অন্যতলায় নেই তো?' বলল সাবেলা, 'হয়তো গোপনে নেমে গেছে?'

ডেটা স্ক্রিন দেখল কন্ট্রোলার। 'ওই বাড়ির প্রতি তলায় আছে আমাদের ওঅর-বট। কোথাও থার্মাল সিগনেচার নেই। নড়ছে না কিছু। ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা।'

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে নিজে ডেটা দেখতে লাগল চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবেলা। বিড়বিড় করে বলল, 'এটা হতে পারে না। নিশ্চয়ই ওই বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে!'

তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডেটা দেখছে ওরে চিচিওয়া। মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ। দম আটকে ফেলল সাবেলা। ভাবছে, ওঅর-বট লাগে নাকি, এই লোক ফুঁ মেরেই তো যে কাউকে খুন করতে পারবে!

'দ্বীপের ম্যাপ দেখান আমাকে,' বলল নৃশংস খুনি।

'ম্যাপ দিয়ে কী করবেন?'

'সময় নষ্ট করবেন না। এখন তর্কের সময় নয়।'

রেগে গেলেও নির্দেশ পালন করল সাবেলা। স্ক্রিনে ফুটে উঠল দ্বীপের প্রতিটি বাড়ির ছবি। সাগরের দিক বাদ পড়ল না। 'লাল বিন্দু দেখাচ্ছে ওঅর-বটের অবস্থান। আর একটু আগেও ওই বাড়িটাতে ছিল লোকগুলো। ওখানেই জড় হয়েছে বেশিরভাগ ওঅর-বট।'

কয়েক মুহূর্ত দেখার পর সব বুঝে গেল ওরে চিচিওয়া। 'এমন কোনও উপায় আছে, আমি বেরিয়ে গেলে আমাকে খুন করবে না ওসব মেশিন?'

'আইডেন্টিফায়ার দিতে পারব,' বলল সাবেলা। পাশের

এক কন্সোলে ফিতা থেকে ঝুলছে কয়েকটা ডিভাইস। 'ওই জিনিস থাকলে মেশিন মনে করবে আপনি তাদের বন্ধু। ভুলেও গুলি করবে না।'

শুনে খুশি হলো ওরে। তলোয়ার তাক করল সাবেলার দিকে। চাপা স্বরে বলল, 'তো দিন একটা। নিজেও পরবেন আরেকটা।'

'আমি?' চমকে গেল সাবেলা, 'আমি ওখানে গিয়ে কী করব?'

'জরুরি কাজ,' বলল প্রেতাত্মা। 'ওদেরকে ধরব। সঙ্গে আপনিও থাকবেন।'

পঞ্চান্ন

'অত ওপর থেকে লাফ দিয়ে পায়ে চোট লেগেছে,' বলল সোহেল। পড়ে যাচ্ছিলেন হিমুরা, ডান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ওজন নিয়েছে ও।

খুঁড়িয়ে হাঁটছেন পুলিশ অফিসার। ব্যথায় কুঁচকে গেছে গাল। তবে কথাটা শুনে মৃদু হাসলেন। 'লাফ ঠিকই ছিল। কিন্তু নেমে ব্যথা পেয়েছি।'

'গোটা ছয়েক বিয়ার শেষ করলেই সুস্থ হয়ে যাবেন,' ভরসা দিল সোহেল।

আর চলতে পারছেন না হিমুরা।

রানা গেছে সামনের বাড়ি দেখে আসতে।

এই সুযোগে বসে পড়লেন পুলিশ অফিসার।

পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, তারপর ফিরল রানা। ‘আশপাশে আমাদের বন্ধু রোবটদের দেখলাম না।’

‘কপাল ভাল নরকের কীটগুলোর ডানা নেই,’ মন্তব্য করল সোহেল।

মাথা দোলাল রানা। চালু করল নুমার ট্র্যান্সিভার। ‘এবার সাহায্য চাইব।’ সিনক্রোনাইয হওয়ার পর রেডিয়োর ডানে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। ট্র্যান্সমিট বাটন টিপল রানা। ‘হিনা, তুমি কোথায়?’

পেরোল বেশ কয়েক সেকেণ্ড। জবাব দিল না কেউ।

‘কে জানে, হয়তো মডার্ন টেকনোলজি ভেবে বোট থেকে ট্র্যান্সিভার ফেলে দিয়েছে মেয়েটা,’ বিমর্ষ সুরে বলল সোহেল।

‘হিনা, আমি মাসুদ রানা। শুনছ? রিসিভারের বামে বাটন টিপে কথা বলো।’

স্ট্যাটিক এল। তারপর শোনা গেল মেয়েটার কণ্ঠ: ‘ভাল করেই জানি কীভাবে রেডিয়ো ব্যবহার করতে হয়।’

‘গুড,’ বলল রানা। ‘কোনও সমস্যায় পড়েছ?’

‘না, তবে সারারাত ভিজে সকালে জ্বর আসবে।’

‘আমরা আছি সমস্যায়,’ বলল রানা। ‘ভাল সংবাদ হচ্ছে: পেয়েছি পুলিশ অফিসার উবোন হিমুরাকে। খারাপ সংবাদ: তাড়া করছে আমাদেরকে একদল ওঅর-বট। আমরা অর্ধেক পথ যেতে পারব, তবে বাকি পথ এগিয়ে আসতে হবে তোমাকেই। পারবে?’

‘নিশ্চয়ই,’ বলল মেয়েটা। ‘কোনও ব্যাপারই নয়।’

‘আমরা এলে খুঁজে নিয়ো,’ বলল রানা। ‘ব্যবহার করব ডানা আর প্যারাসেইল।’

‘সাগরে নেমে এলেই বোটে তুলে নেব।’

‘ঠিক আছে।’ রেডিয়ো অফ করে সরিয়ে রাখল রানা। ‘তিনতলা নিচে ওদিকের বাড়িতে যাওয়ার সেতু। চলুন, রওনা হওয়া যাক।’

নেমে এসে সেতুর মুখে পৌঁছুল ওরা। সতর্ক চোখে দেখল আশপাশে নেই রোবট। সাবধানে সেতু পেরিয়ে সামনের বাড়িতে ঢুকল ওরা। চলে এল সিঁড়ির কাছে। তিন মিনিটও লাগল না উঠতে। দশতলার মেঝেতে নেমেছে ছাতের ঢালু, বড় স্ল্যাব। ওটা বেয়ে উঠতে হবে ছাতে।

বৃষ্টিতে ভিজে ভীষণ পিছলা স্ল্যাব, ওঠা কঠিন। হাত ও হাঁটু ব্যবহার করে উঠতে লাগল রানা। ডানহাতে হজো মাসামিউনে। গতি কম ওর।

ওকে পাশ কাটিয়ে ছাতের কাছে পৌঁছুল সোহেল। উঠে ছাতে পা রাখবে, এমনসময় চারপাশে লাগল একরাশ গুলি। ছাত থেকে ছিটকে উঠল কংক্রিটের চল্টা। চমকে গিয়ে পিছলে গেল সোহেল। নামার সময় সঙ্গে নিল রানা ও উবোন হিমুরাকে।

নিচের মেঝেতে কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে বসল রানা। 'এত সমাদর আশা করিনি।'

'দেখি গিয়ে কে সে,' বলল সোহেল। আবারও স্ল্যাব বেয়ে উঠল ও, নিচু করে রেখেছে মাথা। হাতে নাইন এমএম পিস্তল। ছাতের কিনারা লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার। গুলির ভয়ে হঠাৎ করে ছুটে আসবে না শত্রুপক্ষ।

দ্বিতীয়বার উঁকি দিয়ে আবারও মাথা নামাল সোহেল।

'রোবট?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'ইয়াকুযা খুনি। এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে মস্ত এক তলোয়ার।'

'একা?'

'না, সঙ্গে হুয়াঙের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলা।'

'অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ কর,' কঠোর সুরে বলে উঠল ওরে চিচিওয়া।

'যাতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী খুনের দায়ে সব দোষ চাপিয়ে দিতে পারো আমাদের ঘাড়ে?' পাল্টা চেঁচাল সোহেল, 'মর্,

ব্যাটা!'

'সাহস থাকলে লড়বি, নইলে অপেক্ষা করবি,' বলল ওরে। 'তাতে পৌঁছে যাবে ওঅর-বটগুলো। ঝাঁঝরা হবি গুলি খেয়ে। কীভাবে মরবি, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই।'

'মহাবিপদে ফেলেছে,' মন্তব্য করলেন হিমুরা।

'রোবট এলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে,' স্বীকার করল রানা।

'এক কাজ করি, তেড়ে গিয়ে লড়াই করি,' বলল সোহেল।

'তুই না আত্মহত্যা পছন্দ করিস না?' বলল রানা।

'উপায় কী?' মাথা নাড়ল সোহেল। 'আর তো কোনও পথ নেই!'

'আমার মনে হয় আছে,' বলল রানা। 'ব্যস্ত রাখ লোকটাকে। মাঝে মাঝে একটা দুটো গুলি পাঠাবি। যাতে মনোযোগ দিতে না পারে আমার দিকে।' মেঝে থেকে উঠে তলোয়ার বাগিয়ে ধরল ও। 'এরপর লড়াই হবে সামুরাই স্টাইলে!'

রানা বিদায় নেয়ায় স্ল্যাবের আরও সামান্য ওপরে উঠে এক রাউণ্ড গুলি পাঠাল সোহেল। আলাপের সুরে বলল, 'মনে হয় না খোলা ছাতে বাঁচবে। আড়াল বলতে কিছুই নেই। একটা গুলিই যথেষ্ট তোমাকে লাশ বানাতে।'

'এত কপাল নেই তোর,' খলখল করে হাসল প্রেতাত্মা, 'চাইলে ছাতে উঠে লড়াই কর। সমান সুযোগ দেব।'

'ধরে নিতে পারেন মিথ্যা বলছে,' বললেন হিমুরা।

'ধরে নিয়েছি,' মৃদু হাসল সোহেল। হাত ওপরে তুলে ছাতের কিনারা লক্ষ্য করে পাঠাল আরেকটা গুলি।

সোহেলের দিকে মনোযোগ দিয়েছে চিচিওয়া, সেই সুযোগে বাড়ির অন্যদিকে এল রানা। একবার উঁকি দিয়ে দেখল

বাইরে। গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছে ছয়পায়া মেশিনগুলো। কিছু ঢুকছে ভেতরে। সংখ্যায় কমপক্ষে এক ডযন। এবার নিয়ম মেনে সার্চ করবে না, সোজা হামলা করবে ওদের ওপর।

সময় বিপক্ষে। কাজেই ঝুঁকি নিয়ে করতে হবে যা করার। জানালা দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশ ধরে বাড়ির আরেক পাশে চলল রানা। দু'মিনিট লাগল জং ধরা ফায়ার এস্কেপের কাছে পৌঁছুতে। প্রথম যখন এসেছিল, ওটা ব্যবহার করেনি ওরা। কিন্তু এবার আর উপায় নেই।

রানা শুনল, চিচিওয়ার উদ্দেশে বলল সোহেলঃ 'রোবট দিয়ে আমাদের ঝাঁঝরা করলে করোনার বুঝে যাবে, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে খুন করিনি।'

'তোদের লাশ সাগরে ফেলে হাঙরের পেট পূর্তি করাব,' পাল্টা বলল প্রেতাত্মা। 'বাকি জীবন তোদের খুঁজেও পাবে না পুলিশ।'

ফায়ার এস্কেপের রেলিং টপকে লোহার ধাপে পা রাখল রানা। অপেক্ষা করল। আবারও গুলি পাঠাল সোহেল। ওই আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই লোহার সিঁড়িতে পুরো ভর দিল রানা। এদিক ওদিক দুলছে গোটা সিঁড়ি। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। এক পা এক পা করে উঠতেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে গুঙিয়ে উঠছে লোহার ধাপ। কপাল ভাল, এখনও খসে পড়েনি বহু নিচের চাতালে।

ধীরে উঠছে রানা। জীবনে কখনও এত সতর্ক হয়ে সিঁড়ি বায়নি ও। প্রতি পা ফেলছে বুক ভরা ভয় নিয়ে। অস্ত্র বলতে সঙ্গের এই তলোয়ার।

ছাতের কাছে পৌঁছুবার আগেই টের পেল, দেয়াল থেকে খুলে আসছে ফায়ার এস্কেপ। ফাটল ধরা মুড়মুড়ে কংক্রিটের বুক থেকে উধাও হয়েছে ব্র্যাকেট। গোটা কাঠামো টিকে আছে এখন স্রেফ এক প্রস্থ তারের কল্যাণে। ওটা ছিঁড়লেই খসে পড়বে গোটা লোহার সিঁড়ি।

প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনের নিচু দেয়ালে উঠল রানা। বাইরে সরল লোহার মই। আস্তে করে এনে ওটাকে দেয়ালের পাশে রাখল ও।

ছাতে চলেছে তুমুল মৌখিক বিবাদ।

'গুলি জমিয়ে রাখ্, শালা! মাকড়সাগুলো এলে বুঝবি!'

জবাবে তিনটে গুলি পাঠাল সোহেল। ওই আওয়াজ কাজে লাগিয়ে দেয়াল টপকে ছাতে নামল রানা। সামনে বাগিয়ে ধরেছে হঞ্জো মাসামিউনে। একটু দূরেই কাভার নিয়ে বসে আছে সাবা সাবেলা আর ওরে চিচিওয়া।

রানাকে আগে দেখল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'সাবধান!'

চরকির মত ঘুরেই উঠে দাঁড়াল চিচিওয়া। দেরি হলো না গুলি পাঠাতে। কিন্তু তলোয়ারের আঘাতে তার হাত থেকে পিস্তলটা উড়িয়ে দিল রানা। কাটা পড়েছে প্রেতাত্মার বুড়ো আঙুলের অর্ধেক।

ছাতে পড়েই 'বুম!' শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল। বোঝা গেল না কোথায় গেল নিশানাহীন গুলি। কাটা আঙুলের ব্যথায় ঘুরেই প্রায় বসে পড়ল ওরে চিচিওয়া।

তার দিকে খেয়াল দিল না রানা। পিস্তল পেতে ডাইভ দিয়েছে সাবেলা। ঝড়ের বেগে সামনে বেড়ে তার চোয়ালে মোক্ষম এক লাথি মারল রানা। পরক্ষণে তলোয়ারের ডগা দিয়ে দূরে ঠেলে দিল পিস্তলটা।

খয়েরি তলোয়ার দুলিয়ে ছুটে এল ওরে চিচিওয়া। ফলা নামাল রানার মাথার ওপর। কিন্তু হঞ্জো মাসামিউনে দিয়ে কোপ ঠেকিয়ে দিল রানা। পরের আক্রমণে সরল আরেক দিকে। চিচিওয়ার বুড়ো আঙুলের ক্ষত থেকে দরদর করে ঝরছে রক্ত, কিন্তু প্রচণ্ড রাগে বেসামাল সে। তেড়ে গেল রানার দিকে।

হঞ্জো মাসামিউনে দিয়ে খয়েরি তলোয়ারের হামলা ঠেকাল রানা। পরক্ষণে পাশ থেকে চালাল তলোয়ার। এ হামলা

ঠেকাতে না পারলে কাটা পড়বে খুনিটার মাথা।

তলোয়ারবাজি ভালই জানে চিচিওয়া। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। তলোয়ারের প্রচণ্ড এক মোচড়ে উড়িয়ে দিতে চাইল প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্র।

হাত থেকে হঞ্জো মাসামিউনে ছুটে যাওয়ার আগেই পিছিয়ে গেল রানা। আক্রমণে এসে টিটকারির সুরে বলল চিচিওয়া, 'তলোয়ারে তুই আমার তুলনায় কিচ্ছু না! এবার একটা একটা করে কেটে নেব তোর হাত-পা!'

ঠং-ঠনাৎ আওয়াজে লাগছে দুই তলোয়ারের ফলা।

একপাশ থেকে চিচিওয়া তলোয়ার চালাতেই দক্ষতার সঙ্গে আবারও ঠেকিয়ে দিল রানা। শ্রদ্ধার ভাব ফুটল জাপানীর কাঠবাদাম চোখে।

'রক্তের স্বাদ নেবে বলে দু' শ' বছর অপেক্ষা করছে এ তলোয়ার,' খলখল করে হাসল চিচিওয়া। লাফিয়ে এগোল রানার দিকে। 'আজ তোর রক্তে প্রাণ জুড়াবে এর!'

বিরাম নেই রানার। নানাদিকে সরে হামলা করছে ওরে চিচিওয়া। একবার তলোয়ারের ডগা রানার বুকে প্রায় ছুঁইয়ে দিল সে। তবে হাঁটু ভাঁজ করে কাত হয়ে ওকে বিফল করে দিল রানা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে সাঁই করে চলে গেল খয়েরি ফলা।

এই সুযোগে হঞ্জো মাসামিউনে চালাল রানা।

পাসাটা-সোট্টো।

লাফিয়ে পেছাল চিচিওয়া। পরক্ষণে আবারও এগোল উন্মাদের মত। খেপে গেছে রানাকে খুন করতে না পেরে। শুরু হলো দু'জনের মুখোমুখি লড়াই। দুই তলোয়ারের ফলার সংঘর্ষে নানাদিকে ছিটিয়ে পড়ছে লাল ফুলকি। চিচিওয়ার বুড়ো আঙুলের রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছে খয়েরি তলোয়ারের হাতল ও ফলা।

প্রচণ্ড হামলার মুখে বারবার পিছাতে হচ্ছে রানাকে।

পেছনেই ছাতের কিনারা। এত বিপদের মুখে আরও একটি নতুন বিপদ দেখল রানা। পিস্তলের জন্যে ক্রল শুরু করেছে সাবেলা।

'সোহেল! জলদি!' ডাক দিল রানা।

এরই মধ্যে স্ল্যাব বেয়ে ছাতে উঠেছে সোহেল। দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দিল সাবেলার ওপর। শুরু হলো পিস্তল দখলের লড়াই। ওদিকে আবারও রানার ওপর হামলে পড়ল ওরে চিচিওয়া।

সামনে বেড়ে রানার বুক ভেদ করতে চাইল সে। ঝট্ করে সরল রানা। কিন্তু পরক্ষণে দু'হাতে খয়েরি তলোয়ার ওর মাথার ওপর নামাতে চাইল ওরে চিচিওয়া।

এ আঘাতে মাথা থেকে পেট পর্যন্ত দু'ভাগ হবে রানা।

হঞ্জো মাসামিউনে তুলে ঠেকাল দা-র মত কোপটা। কিন্তু টলে গেছে ভারসাম্য। প্রায় বসে পড়তে হয়েছে ওকে। এখন নিজেকে রক্ষা করা অসম্ভব। বুঝল, খুন হবে এবার।

চিচিওয়া তলোয়ার চালাবার আগেই সামনে বেড়ে কাঁধ দিয়ে তার ঊরুতে প্রচণ্ড গুঁতো দিল রানা। বামহাতে জড়িয়ে ধরেছে শত্রুর হাঁটু। গায়ের সব শক্তি খাটিয়ে লোকটাকে তুলেই ছুঁড়ে ফেলল ফায়ার এস্কেপ লক্ষ্য করে।

নিচু দেয়াল টপকে লোহার সিঁড়িতে পড়ল চিচিওয়া। খামচে ধরেছে ওপরের ধাপ। দুলে উঠল ফায়ার এস্কেপ। কয়েক ইঞ্চি সরতেই টানটান হলো তার।

লাফ দিয়ে নিচু দেয়ালে উঠল রানা। ওকে দেখছে ওরে চিচিওয়া। চোখে ভয়ের অদ্ভুত চাহনি। হাত থেকে পড়ে গেল খয়েরি তলোয়ার। মাঝের ধাপে ঠং করে লেগে উধাও হলো নিচের অন্ধকারে।

পেট চেপে ধরে রেখেছে চিচিওয়া। হাত সরাতেই রানা দেখল, নিজের রক্তে ভিজে গেছে তার পেট ও ঊরু। ফায়ার এস্কেপে নামার সময় তলোয়ারের ডগার ওপর পড়েছে তার

পেট। ক্ষতটা গভীর, কিন্তু মারাত্মক নয়।

লোকটা নতুন অস্ত্র বের করবে বা কৌশল খাটাবে, সে-সুযোগ দিল না রানা, হঞ্জো মাসামিউনে দিয়ে এক কোপে কেটে দিল তার। বাম পায়ে ঠেলে দিল ফায়ার এস্কেপটা।

বাড়ির গা থেকে সরে ধাতব গোঙানি তুলে বহু নিচের গলিতে খসে পড়ল লোহার সিঁড়ি। ওটার সঙ্গে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে ওরে চিচিওয়া।

ছাপ্পান্ন

'আমার রোবট শেষ করবে তোদেরকে,' বেসুরো কণ্ঠে বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাবা সাবেলা। তাকে ছাতে গেঁথে ফেলেছে সোহেল। তবে মুখ বন্ধ করার লোক নয় চিনা প্রকৌশলী। 'শুনছিস না ওরা আসছে? অপেক্ষা কর্, খুন হবি! মাফ পাবি না ওদের কাছ থেকে!'

সাবেলার গলায় ঝুলন্ত আইডেন্টিফায়ারের ফিতা পাশ থেকে ধরল রানা, পরক্ষণে একটানে খুলে নিল জিনিসটা। সহজ সুরে বলল, 'আমি ভাবছি, তোমাকে আইডেন্টিফায়ার ছাড়া দেখলে কী ভাববে ওরা।'

'ওটা কী?' জানতে চাইলেন উবোন ইমুরা।

'ট্র্যান্সমিটার, এটা থাকলে গুলি করে না রোবট,' বলল রানা। 'হুয়াঙের ফ্যাক্টরিতে দেখেছি। খুবই কাজের জিনিস।'

সোহেলের তলা থেকে শরীর মুচড়ে উঠে বসতে চাইল সাবেলা। কাজটা তার পক্ষে অসম্ভব। 'আইডেন্টিফায়ার মাত্র

একজনকে বাঁচাবে।'

'তার চেয়েও বড় কথা, তোমাকে বাঁচাবে না,' বলল রানা। সোহেলের দিকে তাকাল। 'ওঠ তো, সোহেল।'

সোহেল দাঁড়াতে ধড়মড় করে উঠে বসল সাবেলা। খামচি দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল ডিভাইসটা রানার হাত থেকে।

কিন্তু হাত পিছিয়ে নিয়েছে রানা। তলোয়ারের ডগা দিয়ে বাধ্য করল লোকটাকে বসে থাকতে। 'বাড়ির উত্তর দিকে সিঁড়ি আছে। যদি প্রাণপণে দৌড়াতে পারো, রোবট আসার আগেই হয়তো পালাতে পারবে। তোমার বদলে আমি হলে দেরি করতাম না। তুমিই বলেছ, ওরা আসছে।'

প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে রানাকে দেখল চিনা লোকটা। বুঝে গেছে, একটু পর কপালে কী আছে। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল বাড়ির উত্তরদিকের সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

'বাঁচার সুযোগ দিলি, তবে ব্যাটা ধন্যবাদ দেয়ার লোক নয়,' বলল সোহেল।

'বাঁচবে না,' বলল রানা। 'ছেড়ে দিয়েছি, যাতে ওদিকে মনোযোগ দেয় ছয়পেয়ে মাকড়সা। চল, ছাতের সামনে নেব ডানা আর প্যারাসেইল। গতি পাওয়ার জন্যে প্রথমে প্রায় খাড়া ডাইভ দিতে হবে।'

প্যারাসেইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। ছাতের দিকে নিচু রেলিঙে ডানা রেখে পেছনে বিছিয়ে দিল প্যারাশুট। ত্সুমুরাকে ডানায় উঠতে সাহায্য করল ওরা। বসে পড়লেন পুলিশ অফিসার, একহাতে শক্ত করে ধরেছেন ডানার নাইলনের স্ট্র্যাপ। নিজেরা যার যার জায়গায় দাঁড়াল রানা ও সোহেল। টান দিয়ে ওপরে তুলল প্যারাশুট। বাতাস পেতেই ফুলে উঠল কাপড়ের বিশাল দানব।

ক'তলা নিচ থেকে এল দুই পশলা গুলির আওয়াজ। করুণ দীর্ঘ এক আর্তনাদ ছাড়ল কেউ। পরক্ষণে এল আরেক পশলা গুলির আওয়াজ। এরপর নামল নীরবতা।

‘সাবা ব্যাটা নিজে পরখ করে দেখল কেমন কাজ করে ওর রোবট,’ বলল সোহেল।

‘চল, যাই,’ তাড়া দিল রানা। ‘সামনে ঝাঁপ দিবি। ভঙ্গি করবি আমরা স্লোবোর্ডার।’ বন্ধুর গলায় আইডেন্টিফায়ার ঝুলিয়ে দিল ও। ‘তুই পাইলট। হিমুরা বা আমাকে রোবট গুলি করলেও বেরিয়ে যাবি প্যারাসেইল চালিয়ে।’

হাওয়ায় ভরে যেতেই আকাশে উঠেছে প্যারাশুট। ছাতের রেলিং থেকে ডানা সামনে বাড়াল ওরা। ঝপ্ করে নেমে গেল প্যারাসেইল। বাড়ছে পতনের গতি। পেছনে পড়ল পুরনো বাড়ি। রানার মনে হলো, ওরা তিনটে ঈগল, পাহাড়-চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়েছে শিকার ধরতে। তিনজনের ওজনে বাড়ছে এগোবার বেগ। বাতাসে ভেসে উড়ে চলল অযান্ত্রিক উড়োজাহাজ।

পেছনে পড়ল হেলিপ্যাড। সত্তর ফুট ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে বাঁধের দিকে চলেছে ওরা। একটু দূরে দেখল সাগরের ঢেউয়ের সাদা ফেনা।

গুলি এল না ওদের দিকে। হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নেই।

সমুদ্র-প্রাচীরের বিশ ফুট ওপর দিয়ে সাগরের আকাশে বেরোল ওরা। মন দিল গতি কমিয়ে উচ্চতা বাড়াতে। কিন্তু গ্লাইডারের মত বাতাস পেল না ডানা ও প্যারাসেইল। একটু একটু করে নেমে যেতে লাগল সাগরের দিকে।

‘যে-কোনও সময়ে সাগরে পড়ব,’ সতর্ক করল রানা।

‘পাইলটের দোষ নেই,’ জানাল সোহেল। ‘কপাল ভাল হলে আমাদের দেখে এগিয়ে আসবে হিনা।’

হাওয়ায় চেপে ছুটে চলেছে ডানা ও প্যারাসেইল। ক্রমেই নেমে চলেছে সাগরের দিকে। একটু পর পায়ের কাছে উঠে এল ঢেউয়ের সাদা ফেনা। প্যারাশুট টেনে ওপরে তুলল ওরা। যতটা পারা যায় এগোতে চায়।

‘সাগরে নামতে তৈরি হোন!’ হিমুরাকে বলল সোহেল।

পরের ঢেউ পেরিয়ে ঝপাস করে নামল প্যারাসেইল সাগরে। ঝটকা খেয়ে পানিতে পড়ল রানা। তলিয়ে গেল ওরা। ঠোঁটে লবণাক্ত পানি। ক'সেকেণ্ড পর ভেসে উঠে দেখল রানা ঢেউয়ে বিছিয়ে আছে প্যারাশুট। ওটার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে সোহেল। দড়িদড়া সরিয়ে বেরিয়ে এল। ওর পাশেই সাঁতার কাটছেন হিমুরা। ক্ষতে লবণ লাগছে বলে ব্যথায় ভীষণ কুঁচকে ফেলেছেন মুখ।

ভাসছে ফাঁপা ডানা। ওটার কিনারা ধরে ভেসে থাকল ওরা।

‘বোট দেখেছিস?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘না, তবে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি,’ বলল রানা।

এবার বোটের ইঞ্জিনের গর্জন শুনল সোহেল ও হিমুরা। তীব্র বেগে আসছে ওটা। একটু পর কালো সাগর থেকে আলাদা করা গেল বো-র সাদা ফেনা। ডেকে জ্বলে উঠল মৃদু আলো। গতি কমিয়ে রানাদের পাশে থামল বোট। হুইল থেকে বলল হিনা, ‘বৃষ্টির ভেতর ভিজছে একটা লক্ষ্মী মেয়ে, আর এতক্ষণে সময় হলো আপনাদের আসার?’

বোটে উঠে হিনার মাথায় হাত রাখল রানা। ‘সত্যিই লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। আমরা দুঃখিত।’

‘বাদ দেন ওসব, জলদি তোলেন সবাইকে। এখনই গুলি করবে ওরা!’

হিমুরাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল রানা। সবার শেষে ডেকে উঠল সোহেল। বোট রওনা হওয়ার আগেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল চারপাশের সাগর। দ্বীপের বাঁধ থেকে আসছে রাইফেলের অসংখ্য গুলি, খলবল করছে পানিতে পড়ে।

ডেকে শুয়ে পড়ল রানা, সোহেল ও হিমুরা। রানা চড়া গলায় বলল, ‘হিনা, বাতি! নাগাসাকির দিকে!’

থ্রটল ঠেলে হুইল ঘুরিয়ে নিল হিনা। আগেই নিভিয়ে

দিয়েছে বাতি। লাফ দিয়ে ছুট লাগাল বোট। তবে পেছন থেকে আসছেই রাশি রাশি গুলি।

বাহু ছুঁয়ে গেছে একটা বুলেট, টের পেল রানা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ। বিস্ফোরিত হলো মেরিন রেডিয়ো। ট্র্যানসম ও বোটের পেছনে বিঁধল অন্তত এক ডযন বুলেট। তারপর রেঞ্জের বাইরে চলে গেল ওরা।

থ্রটল খুলে রেখেছে হিনা।

'সবাই ঠিক তো?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলালেন উবোন হিমুরা। সোহেলের ঊরুর ত্বক চেঁছে গেছে বুলেট। ফাইবারগ্লাসের কুচিতে ভরে গেছে হিনার চুল।

তীর বেগে চলেছে বোট। অনেকটা পেছনে পড়েছে লো হুয়াং লিটনের লোক, রোবট ও দ্বীপ। কিন্তু রানাদের বোটের ইঞ্জিন হাউসিং থেকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। দেড় মাইল যাওয়ার পর কাউলিং থেকে দাউ-দাউ করে বেরোল লালচে শিখা।

'ইঞ্জিন অফ করো,' বলল সোহেল। হুইলের পাশ থেকে নিল এক্সটিংগুইশার।

বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করল হিনা। ভাসতে ভাসতে চলেছে ওরা। ক্রমেই কমে আসছে গতি।

ইঞ্জিনের কাউলিং খুলে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করে আগুন নেভাল সোহেল। যন্ত্রপাতি দেখে মাথা নাড়ল। 'আপাতত মেরামত হবে না।'

'এবার?' জানতে চাইল হিনা।

মূল ভূখণ্ডের দিকে তাকাল রানা। ফর্সা হয়ে উঠেছে নাগাসাকির পুবাকাশ। একটু পর উঠবে সূর্য। 'তোমরা দু'জন বোটে থাকবে,' হিমুরা ও হিনার উদ্দেশে বলল ও। 'পাশ দিয়ে জাহাজ গেলে উঠে পড়বে। এদিকে সাঁতরে তীরে যাব সোহেল আর আমি।'

‘এখান থেকে পুরো একমাইল দূরে তীর,’ আপত্তির সুরে বলল হিনা।

‘কমপক্ষে,’ বলল রানা।

‘আশা করি জোয়ারের সাহায্য পাব,’ বলল সোহেল।

বোট থেমে যেতেই সাগরে নামল দুই বন্ধু।

সাতান্ন

ভোর হতে এখনও অন্তত একঘণ্টা।

শাংহাই শহর কেন্দ্রে পিপল্‌স্ স্কয়্যারের ফাঁকা প্লাযা পার হয়ে আঁধারে হাঁটছে আসিফ রেজা ও তার স্ত্রী তানিয়া। ওদের সঙ্গে রয়েছে মহিলা সাংবাদিক মেরিয়ান হিউবার্ট। সে বলল, ‘আগে এ জায়গাটা ছিল ঘোড়ার রেসের মাঠ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি চাইল না জুয়া নিয়ে মাতামাতি করুক মানুষ। তখন তারা এখানে তৈরি করল এই পার্ক।’

‘অথচ এখন সেই জুয়াই খেলতে হচ্ছে,’ বলল আসিফ। ‘জীবন-জুয়া। বন্দি হলে বাকি জীবনেও জেল থেকে বেরোতে পারব না।’

পার্ক পার হয়ে সরকারী ভবনের কাছে পৌঁছুল ওরা। লোকে ওটাকে বলে শামুক বাড়ি। এর কারণ, একতলায় বেশ ক'টি দরজা থাকলেও কংক্রিটের ভাঁজ ও কাঁচের কারণে দেখা যায় না নিচের কয়েক তলা।

আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ, তাই দ্বিধা ঝেড়ে হেঁটে চলেছে আসিফ, তানিয়া ও মেরিয়ান। নির্দিষ্ট ভবনের গেটে গিয়ে

থামল ওরা। নিজের ক্রেডেনশিয়াল বাইরের গার্ডকে দেখাল মেরিয়ান।

'ভাল হতো না আমি একা গেলে?' বলল আসিফ। 'বন্দি হলে সেই সুযোগে পালাতে পারতে তোমরা দু'জন।'

মাথা নাড়ল তানিয়া। 'মনে নেই, বিয়ের আগে দু'জন দু'জনকে কথা দিয়েছি, ঘটনা যাই ঘটুক, সবসময় পাশে থাকব আমরা?'

'কিন্তু তোমার খারাপ কিছু হবে ভাবতে গেলে...'

'আমরা ভালই থাকব,' স্বামীকে থামিয়ে দিল তানিয়া। 'তা ছাড়া, মেরিয়ানের ওই ভ্যানে ঘুমানোর চেয়ে জেলখানাও ভাল।'

সামনের গার্ড ছেড়ে দেয়ায় চেক পয়েন্টে গিয়ে থামল ওরা। এ জায়গা পাহারা দেয়া হয় চব্বিশ ঘণ্টা। ওদেরকে ঘিরে ফেলল কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক। পরীক্ষা করে দেখছে ওদের সঙ্গের জিনিসপত্র। কঠোর গলায় দলনেতা বলল, 'ক্রেডেনশিয়াল?'

ওর নেটওঅর্কের আইডি বাড়িয়ে ব্যাখ্যা দিল মেরিয়ান, 'এরা আমার নতুন প্রোডাকশন ক্রু। ওদেরকে...'

মহিলা সাংবাদিককে পাত্তা না দিয়ে কড়া চোখে আসিফ ও তানিয়াকে দেখল গার্ডদের দলনেতা। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ল সে। চিনা ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলে হাতের ইশারা করল। জড় হলো আরও কয়েকজন গার্ড।

'আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে জেনারেল ফং মিং-এর সঙ্গে দেখা করতে,' ঘাবড়ে গিয়ে বলল আসিফ। 'তাঁর জন্যে জরুরি কিছু জিনিস এনেছি।'

ওর কথা চাইনিয ভাষায় অনুবাদ করল মেরিয়ান।

মাথা নাড়ল গার্ডদের দলনেতা। পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। তার সঙ্গীরা বের করেছে অস্ত্র। একজন পিস্তল তাক করল আসিফের হাঁটু লক্ষ্য করে।

'ওদেরকে আসতে দাও,' কণ্ঠস্বর এল ছায়ার ভেতর থেকে। সবার চোখ চলে গেল ওদিকে।

থমকে গেছে গার্ডরা।

বিশাল লবি থেকে বেরিয়ে এল সুদর্শন এক চিনা যুবক। পরনে ধূসর সুট। তাকে দেখে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল গার্ডরা।

'তোমাদের সার্চ হয়ে গেলে এঁদেরকে নেব আমাদের অফিসে,' বলল ধূসর সুট। 'বডি সার্চ।'

'কিন্তু, স্যর, এরা পলাতক অপরাধী,' বলল গার্ডদের দলনেতা। 'আমাদের লিস্টে আছে। দেশের শত্রু।'

কড়া চোখে তাকে দেখল যুবক। 'আমি কিন্তু তোমাকে একটা নির্দেশ দিয়েছি।'

'জী, স্যর।'

কী বলা হয়েছে, ইংরেজি করে আসিফ ও তানিয়াকে জানাল মেরিয়ান।

'যাক্, মনে হচ্ছে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কথা রাখবে এই লোক,' বলল আসিফ।

পরিষ্কার বাংলায় জবাব এল যুবকের, 'অবস্যই!'

'ক্যালকাটার বাংলা বলচে, গো,' বলল তানিয়া।

ওদেরকে সার্চ করল গার্ডরা।

সরিয়ে নিল সব ইকুইপমেন্ট।

মেরিয়ানের কাছ থেকে আসিফ ও তানিয়াকে আলাদা করে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর। তুলে আনা হলো সপ্তমতলার এক অফিসে। এরই ভেতর পরস্পর পরিচিত হয়েছে চাইনিয যুবক, আসিফ ও তানিয়া।

চমৎকারভাবে গুছিয়ে রাখা অফিসে বসতে বলে বিদায় নিল চাইনিয যুবক।

'এবার কী?' স্ত্রীর দিকে তাকাল আসিফ।

'অপেক্ষা,' বলল তানিয়া। 'আশা করি আমাদের কথা

জেনেছেন জেনারেল ফং মিং।'

চুপ করে বসে থাকল ওরা। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে বিশাল পিকচার উইণ্ডো দিয়ে দূরে তাকাল আসিফ। নিচে ধূসর হয়ে উঠেছে প্লাযা। ভোর হচ্ছে।

আরও ক'মিনিট পর অফিসে ঢুকলেন বয়স্ক এক লোক। পরনে সবুজ রঙের পিপল্স্ লিবারেশন আর্মির ইউনিফর্ম। বুক ভরা মেডেল। মাথার ক্যাপের নিচ থেকে চেয়ে আছে তীক্ষ্ণ দুটো চোখ। জেনারেলের পর অফিসে ঢুকল সেই যুবক, হাতে আসিফদের ল্যাপটপ।

'স্যর, এঁদের কথাই বলেছেন বিসিআই চিফ।'

মৃদু মাথা দোলালেন চাইনিয সিক্রেট সার্ভিস চিফ ফং মিং। আসিফ জানালার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললেন, 'খোলা যায় না এসব জানালা। পালাতে পারবেন না।'

'পালাতে চাইলে এখানে আসতাম না,' বলল আসিফ, 'আপনিই তো ফু-চুঙের বস, জেনারেল ফং মিং?'

'হ্যাঁ,' বললেন জেনারেল, 'ফু-চুঙের কাছে শুনলাম আপনারা আসিফ ও তানিয়া রেজা। কাজ করেন নুমার হয়ে। অনেকের ধারণা: আপনারা গুপ্তচর। এর কারণও আছে। বেআইনীভাবে পা রেখেছেন এ দেশে। হয়তো জানেন না, এ অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।'

কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল আসিফের। ভেবেছিল বড়জোর জেল হবে। কিন্তু এই লোক বলছে মেরেও ফেলা হতে পারে!

'আশা করি আপনাদের জেল-জরিমানা বা বিপদ হবে না,' বললেন জেনারেল ফং মিং।

'আমাদের ব্যাপারে সবই মিস্টার ফু-চুংকে জানিয়ে দিয়েছেন বিসিআই চিফ,' বলল তানিয়া। 'মিস্টার ফু-চুং আপনাকে কিছু জানাননি?'

মৃদু হেসে যুবককে দেখালেন জেনারেল, বললেন, 'ইনিই

ফু-চুং। হ্যাঁ, জানিয়েছেন। তবুও আরেকবার বলুন কেন এসেছেন।'

লজ্জিত দৃষ্টিতে যুবককে দেখল তানিয়া।

'সব শুনলে বিশ্বাস করবেন না,' বলল আসিফ।

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখলেন জেনারেল। 'বিশ্বাস করব কী করব না, সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন। নিন শুরু করুন।'

সংক্ষেপে বলতে লাগল আসিফ ও তানিয়া।

টেবিলের কিনারায় বসে শুনছেন জেনারেল। কিছুক্ষণ পর আরও গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর চেহারা।

'আমরা বরং দেখাই কী ঘটছে,' ফু-চুঙের হাতের ল্যাপটপ দেখাল আসিফ।

মাথা দোলালেন জেনারেল। ল্যাপটপ আসিফের হাতে দিল চাইনিয সিক্রেট সার্ভিসের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী কর্মকর্তা লিউ ফু-চুং।

কমপিউটার চালুর পর প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা দিতে লাগল আসিফ ও তানিয়া। জেনারেলকে বলল, কীভাবে ওরা জানল উঠে আসছে সাগর-সমতল, কীভাবে পাঠাল পুব চিন সাগরের নিচে রোভ, কী দেখেছে পানির গভীরে। ঢিবি থেকে উঠে আসছে বিপুল পরিমাণের পানি।

ওরা আরও জানাল, ক্রমেই বাড়ছে রিংউডাইটের বুকে ফাটল। অল্পদিনেই তলিয়ে যাবে বহু দেশ। শেষে সাগরের উচ্চতা হবে শত শত ফুট। তারপর ছাড়িয়ে যাবে মাউন্ট এভারেস্টকেও।

চুপচাপ শুনছেন জেনারেল মিং। মাঝে মাঝে দেখছেন ফু-চুংকে। আসিফ ও তানিয়ার বক্তব্য শেষ হলে বললেন, 'আমার সহকর্মীর কাছে শুনেছি আপনারা মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহুবার এ দেশের বিপদে সাহায্য করেছে সে। সুতরাং আপনাদের একটা কথাও অবিশ্বাস করব না। তবুও জানতে চাই, এক বছর আগে খনির কাজ বন্ধ করে দেয়ার পরেও কেন

উঠে আসছে এত পানি?'

'জবাব আমাদের কাছে নেই,' স্বীকার করল আসিফ, 'আপনাদের জিয়োলজিস্টরা হয়তো দিতে পারবেন এর ব্যাখ্যা। নানান টেস্ট ও এক্সপেরিমেন্ট শেষ না করে আমি নিজে কোনও মন্তব্য করব না।'

চুপ করে থাকলেন চাইনিয সিক্রেট সার্ভিস চিফ। তাঁর চেহারা দেখে তানিয়ার মনে হলো, কী যেন ভেবে বিব্রত বোধ করছেন জেনারেল।

'জেনারেল, আমরা মিথ্যা বললে নিজেদের স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিতাম?' বলল তানিয়া। 'আপনারা তো বছরের পর বছর আটকে রাখতে পারবেন আমাদেরকে। কিন্তু অন্তর থেকে বলতে পারি, আমরা গুপ্তচর নই। কারও কোনও গুটি নই। এসেছি জরুরি প্রশ্নের জবাব খুঁজে মানুষের উপকার করতে—সেই মানুষদের মধ্যে আপনারাও আছেন। আর তা করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এখন। হয়তো মারাই যাব। তবে চাই, মানুষ যেন জেনে নেয়, আসছে মহাপ্লাবন... সাক্ষাৎ মৃত্যু।'

ও থেমে যাওয়ার পর থমথম করছে ঘরের পরিবেশ।

'বিসিআই চিফের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি আমরা,' একটু পর বললেন জেনারেল মিং। 'তবু আপনাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিতে চাই। ভুললে চলবে না, এটা মহাচিন। একটাই রাজনৈতিক পার্টি। আমি বা ফু-চুং বড় কোনও ভুল করলে রক্ষা পাব না নিজেরাও। ...এবার বলুন, কী ধরনের প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে?'

'ভিডিয়ো তো দেখেছেন, সাগরের ওই ক্যানিয়নে রোভ নামালে পাবেন সব প্রমাণ,' বলল আসিফ, 'এ ছাড়া, দেখতে পারেন লো হুয়াং লিটনের ব্যক্তিগত ফাইল। ওখানে অনেক কিছুই থাকবে।'

চোখ সরু করলেন জেনারেল মিং। 'লো হুয়াং লিটন?

সেই মস্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট?'

'জী,' বলল আসিফ, 'আপনি একটু আগে সাগরের নিচে যে রোবটের হাত ও কাঁধ দেখলেন, ওগুলো তৈরি করেছে তারই কোম্পানি। এই একই লোক খুন করতে চেয়েছে আমাদেরকে জাপানে।'

জানালা দিয়ে দূরে তাকালেন জেনারেল।

কিছুক্ষণ পর বলল ফু-চুং, 'হুয়াং এসবে জড়িত হলে, তাকে অনুমতি দিয়েছেন পার্টির ওপর মহলের কেউ।'

'কতটা উঁচু পর্যায়ের লোক সে?' বলল তানিয়া, 'এমন কেউ যে যা খুশি করতে পারে কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে?'

চুপ করে রইলেন জেনারেল।

'স্যর, আপনাদের কাজ চিনকে নিরাপদ রাখা, তাই না?' মুখ খুলল আসিফ।

'অবশ্যই!' মাথা দোলালেন জেনারেল।

'আপনাদের কাছে প্রমাণ আছে, চিনের পুব সাগরের নিচে মাইনিং হয়েছে,' বলল আসিফ। 'ওই ক্যানিয়নের তলার ফাটল থেকে উঠছে প্রতি ঘণ্টায় কোটি কোটি গ্যালন পানি। আরও জানেন, চওড়া হচ্ছে এসব ফাটল। কিছু দিন পর কিছুই গোপন থাকবে না। তার আগেই চেষ্টা করা উচিত বিপর্যয় ঠেকাবার। নইলে গোটা পৃথিবীর মানুষ অভিশাপ দেবে আপনাদেরকে।'

মাথা দোলালেন জেনারেল মিং। 'সমস্যার মাত্রা আরেকটু খুলে বলুন।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল আসিফ, তারপর বলল, 'চিনের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা। হয় সমস্ত দোষের দায় নিজেদের ঘাড়ে নেবে মহাচিন সরকার, নয়তো এ দায় চাপবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট লো হুয়াং লিটনের কাঁধে। আমার ধারণা, তার কারণেই ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবীর বুকে এই মহা বিপর্যয়।

এসব করেছে ক্ষমতা ও আরও টাকার মালিক হওয়ার জন্যে।'

'মহাচিনের বদলে দায় নেবে হুয়াং,' বিড়বিড় করলেন জেনারেল।

'সে দায়ী হলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ,' মন্তব্য করল ফু-চুং।

'তাতে মুখ রক্ষা হবে চিনের,' বলল তানিয়া। 'সবাই জানবে ওই লোকের জন্যে ডুবে মরতে বসেছে কোটি কোটি মানুষ। এটা প্রমাণ হলে তার পেছন থেকে সরে যাবে চিন সরকার। কিন্তু যা করার করতে হবে দেরি না করে। হাতে বেশি সময় পাবেন না আপনারা।'

টেবিল থেকে নেমে বললেন জেনারেল, 'আপনারা এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বাইরে থাকবে গার্ড। কোনও বিপদ হবে না। কেউ জানবে না আপনারা আছেন এ ভবনে।' ফু-চুঙের দিকে ফিরলেন জেনারেল। হাতের ইশারায় দেখালেন দরজা। 'আমার অফিসে অপেক্ষা করছি আমি। তুমি ওপরতলায় যাও। কথা বলে দেখো যেইন নিং-এর সঙ্গে। তবে বাধ্য না হলে গ্রেফতার করবে না।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল।

পিছু নিল চিনের দুর্ধর্ষ গুপ্তচর মাসুদ রানার প্রিয় বন্ধু লিউ ফু-চুং।

বিশাল ভবনের দশমতলায় এলিভেটর থামতেই করিডোরে বেরিয়ে এল লিউ ফু-চুং। সরাসরি করিডোরের শেষমাথার অফিসে পা রাখতেই পরের ঘরের দরজা আগলে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল দু'জন গার্ড। ফু-চুংকে দেখে আরেকটু আড়ষ্ট হয়েছে তারা। ভাল করেই জানে, এই লোক চিন সিক্রেট সার্ভিসের দ্বিতীয় ব্যক্তি।

'ভেতরে যেইন নিং আছেন?' দুই স্ট্রিপওয়ালা এক কর্পোরালের কাছে জানতে চাইল ফু-চুং।

'জী, স্যর,' বলল যুবক সৈনিক। 'তবে তাঁকে বিরক্ত করতে মানা করে দিয়েছেন।'

'জরুরি কাজে দেখা করব,' বলল ফু-চুং।

'কিন্তু, স্যর... তিনি...'

'কাজটা জরুরি, দরজা ছেড়ে দাঁড়াও।'

নিচু পদের সৈনিকরা বড় সমস্যায় পড়ে ওপরমহলের দু'জন দুটো আলাদা নির্দেশ দিলে। যেইন নিং রাজনৈতিক নেতা হলেও মিলিটারিতে লিউ ফু-চুং-এর পদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের। সৈনিক মাত্রেই জানে ওই পদের মালিকের দাপট কতখানি। চুপচাপ দরজা ছেড়ে দিল দুই কর্পোরাল।

ঘরে ঢুকে যেইন নিংকে কাউচে বসে থাকতে দেখল ফু-চুং। বয়স্ক মানুষটা দেখছে জাপানি নেটওঅর্কের সকালের খবর।

মুখ তুলে তাকাল না যেইন নিং। 'আমি কিন্তু বলেছি কেউ যেন বিরক্ত না করে আমাকে।'

'গার্ডদের অন্য নির্দেশ দিয়েছি,' নিচু গলায় বলল ফু-চুং।

বেশিরভাগ মানুষ ক্ষমতা পেলেই তা প্রয়োগ করে। তবে এমনি এমনি খামোকা প্রতিক্রিয়া দেখাবার লোক নয় নিং। মোলায়েম সুরে বলল, 'আপাতত আমাকে বিরক্ত করবেন না, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। তবে ওই বাঙালি-আমেরিকান গুপ্তচরদেরকে ধরে থাকলে, সে কথা আলাদা।'

মিলিটারি এবং পুলিশে প্রবল প্রভাব আছে এ লোকের। আসিফ ও তার স্ত্রীকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে হাজার হাজার অফিসার ও তাদের লাখ লাখ অধীনস্থরা। কয়েক পা সামনে বাড়ল ফু-চুং। 'জী, খুঁজে পাওয়া গেছে তাদেরকে। অদ্ভুত এক কাহিনী বলেছে তারা আমাদেরকে।'

এবার ওর প্রতি মন দিল নিং। 'ওরা কোথায়? নিজ চোখে দেখতে চাই তাদেরকে।'

'আপাতত সেটা সম্ভব হবে না,' বলল ফু-চুং।

কথাটা শুনে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। রাগে বিকৃত হয়েছে চেহারা। 'আপনি জানেন আমি কে? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বুদ্ধিমান অফিসার!'

মুহূর্তের জন্যে ফু-চুঙের মনে হলো, মস্তবড় ভুল করেছে ও। চেতিয়ে দিয়েছে দেশের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী লোকটাকে। ফলাফল হয়তো ভয়ানক। সাইবেরিয়ার কাছে বরফে ছাওয়া কোনও স্টেশনে পাঠানো হবে ওকে বাকি জীবনের জন্যে। পার্টির পেছনে বসে থাকলেও এর নির্দেশে চলে কোটি কোটি সদস্য। কিন্তু আগে কখনও কোনও কাজে পিছিয়ে যায়নি ফু-চুং। ঠিক করল, আজও নিজেকে ছোট করবে না। তা ছাড়া, ওর হাতে রয়েছে খেলার মত তাস। নরম সুরে বলল ও, 'জাপানে কী করছে লো হুয়াং লিটন, স্যর? আমরা জানি সে যা করছে, আপনার নির্দেশেই করছে।'

'এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন বলে আপনাকে পাঠাতে পারি দেশের সবচেয়ে খারাপ জেলখানায়, তা কি জানেন?'

'তবুও ওই প্রশ্নের জবাবটা চাই আপনার কাছে।'

প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। বহু বছর পর কেউ চ্যালেঞ্জ করেছে নিংকে। সামান্য বিস্মিত চোখে তাকাল সে। কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল, পিছিয়ে যাবে না এই যুবক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোট একটা টেবিলের পেছনে বসল যেইন নিং। সামনে পেতে রাখা খেলার বোর্ড। কাপ থেকে নিয়ে কালো একটা পাথর বোর্ডে রাখল বৃদ্ধ।

'হাত বেশি নাড়াবেন না, লাও-শি,' বলল ফু-চুং।

'আপনি কি আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছেন?'

'লো হুয়াং জাপানে কী করছে, তার ওপর নির্ভর করে আপনাকে গ্রেফতার করব কি না,' বলল ফু-চুং। কিছুক্ষণ আগে রানার কাছ থেকে ফোন পেয়েছে। জেনেছে, কী ঘটবে আজ জাপানে। দেরি করেনি এ বিষয়ে জেনারেলকে জানাতে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে যেইন নিংকে

বিরক্ত করবে না, নইলে বিপদ হবে। নিচু গলায় বলল ফু-চুং, 'আরও একটা ব্যাপার এখানে জড়িত। আমরা জানতে চাই আপনারা কী করেছেন সরীসৃপের ঢোয়ালে।'

'ও... তো দু'একটা ব্যাপার জেনেছেন আপনি।' খেলার বোর্ডে মনোযোগ দিল নিং। চিন সিক্রেট সার্ভিসের সেরা এজেন্টের দিকে ঘুরেও তাকাল না। হাড্ডিসর্বস্ব তর্জনী তুলে দেখাল টিভি স্ক্রিন। 'সংবাদ পাঠিকার দিকে নজর দিন, একটু পর নিজেই দেখবেন কী ঘটছে।'

আটান্ন

উপসাগর থেকে পাথুরে সৈকতে উঠেই পা থেকে ফিন খুলল রানা ও সোহেল। নরম তালুতে পাথরের কুচির খোঁচা খেতে খেতে ছুটল ট্রায়াথলনের দুই প্রতিযোগীর ভঙ্গিতে। সৈকত পেরিয়ে উঠে এল রাস্তায়। বেশিক্ষণ লাগল না কাছের পার্কিং লটে পৌঁছুতে। পছন্দমত গাড়ির কাঁচ ভাঙল ওরা। ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ শুরু করল গাড়ির অ্যালার্ম। তবে মাত্র তিন সেকেণ্ডে ওটার মুখ বন্ধ করে দিল সোহেল। পরের পাঁচ সেকেণ্ডে তার ছিঁড়ে ইঞ্জিন চালু করল রানা। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল দুই বন্ধু।

হাতে সময় নেই।

উপসাগরীয় সড়কে ঝড়ের বেগে চলেছে ওদের গাড়ি। ড্রাইভ করছে রানা। তিক্ত সুরে বলল, 'সইয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে ফ্রেণ্ডশিপ প্যাভিলিয়নে।'

'পুলিশের কাছে গেলে কেমন হয়?' বলল সোহেল।

'গিয়ে কী বলব?' মাথা নাড়ল রানা। 'আমাদের মত দেখতে কয়েকটা রোবট গুলি করে খুন করবে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে? ডাক্তার ডেকে এনে ঘুমের কড়া ওষুধ দিয়ে অচেতন করে সোজা পাঠিয়ে দেবে হাসপাতালে।'

'তাতে অ্যালিবাই থাকবে আমাদের,' বলল সোহেল। 'যদি হাসপাতালেই থাকি, তো আমরা খুন করব কী করে প্রধানমন্ত্রীকে?'

'তাতে বাঁচাতে পারব না প্রাইম মিনিস্টারকে,' বলল রানা। 'ধরাও পড়বে না লো হুয়াং। কিন্তু আমরা চাই দুই কাজই হোক একইসময়ে।'

'তা কী করে করবি?'

'অপরাধের সময়ে ধরতে হবে হুয়াংকে। এদিকে টিভি ক্যামেরার সামনে খুলে দিতে হবে রোবটের মুখোশ।'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'কিন্তু আমরা একটা মিনিট দেরি করলে...'

'জানি,' বলল রানা। সামনে গাড়ির জ্যাম। গিয়ার বদলে ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ আওয়াজে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলল ও। 'ভুল হলে খুন হব আমরা।'

এক মাইল যাওয়ার পর বন্ধ এক বড় দোকানের সামনে গাড়ি থামাল রানা। দোকানের তালা ভেঙে শাটার তুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। মাত্র তিন মিনিট ব্যয় করল র‍্যাক থেকে নিজেদের পছন্দের পোশাক নিতে। আরও কিছু জিনিসপত্র খুঁজতে লাগল দুই মিনিট। সব নিয়ে গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেল ওরা।

'আমাদের দেখলে ভীষণ লজ্জা পাবে ডাকাতদল,' বলল সোহেল। 'প্রথমে চুরি করেছি বোট, তারপর একটা গাড়ি, তারপর পোশাক আর নানান জিনিসপত্র। সবই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর। এভাবে চালাতে পারলে উবোন হিমুরা দাবি করবে,

তার কথাই ঠিক— জাপানের বেশিরভাগ অপরাধের পেছনে আছে বিদেশিরা।'

'আশা করি এসব বলার সুযোগ পাবে সে,' বলল রানা। 'আর আমরা খুন হলে কে কী বলল তাতে কী যায় আসে?'

কিছুক্ষণ পর অসম্ভব হলো যাওয়া। প্যাভিলিয়নের আশপাশে গিজগিজ করছে দর্শক, মিডিয়ার লোক ও সিকিউরিটি টিমের সদস্যরা। প্রতিটি রাস্তার মুখে ব্যারিকেড অথবা হলদে ফিতা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে পথ।

'গাড়ি ফেলে চল,' পরামর্শ দিল সোহেল। 'হেঁটে যাই।'

গাড়ি পার্ক করে নামল ওরা। একটু পর দাঁড়াতে হলো লাইনে। সবাইকে যেতে হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টরের মাঝ দিয়ে। নইলে ঢুকতে পারবে না কেউ প্যাভিলিয়নে।

'এত কড়া পাহারা, ঢুকবে কী করে রোবট?' প্রায় ফিসফিস করে রানার কাছে জানতে চাইল সোহেল।

'পেছন দরজা দিয়ে,' বলল রানা, 'তাতে কাজে আসবে উবোন হিমুরার আইডি কার্ড।'

'পাব কোথায় ওদেরকে?'

'অন্যদের কথা জানি না, তবে আমার নকল থাকবে সইয়ের সময় কাছেই কোথাও,' বলল রানা। 'যাতে সবাই দেখতে পায় গুলি করে প্রধানমন্ত্রীকে খুন করছে মাসুদ রানা। অন্যরা বোধহয় খুলে রাখবে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। এখন প্রথম কথা, আমরা ওদেরকে ঠেকাব কীভাবে? এসব রোবট আমাদের চেয়ে শক্তিশালী। বলতে পারিস প্রায় বুলেটপ্রুফ।'

নির্মল হাসল সোহেল। 'রোবটের সঙ্গে তোকে লড়তে গিয়ে হারতে দেখেছি। তখন থেকেই ওই কথা বারবার ভাবছি।'

'তারপর? কী ভেবে বের করলি?'

'তোর মনে আছে, শিমেযুর দুর্গে আমাদের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে দিল বড় এক ইলেকট্রোম্যাগনেট

ব্যবহার করে? ওই একই জিনিস প্রয়োগ করতে পারি আমাদের রোবট যমজের ওপরে।'

সোহেলের কথা শুনে হেসে ফেলল রানা। 'চট্ করে তৈরি করতে পারবি?'

'না পারার কী আছে? লাগবে বড় পেরেক বা পিন, লম্বা কর্ড আর একটা প্লাগ। বিদ্যুৎ চালু আছে এমন আউটলেট পেলেই কেল্লা ফতে!'

খুব সমারোহের সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে দু'দেশের চুক্তি সম্পাদনের অনুষ্ঠান। বেশিরভাগ পলিটিকাল প্রোগ্রামের মতই, বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমকে। নির্দিষ্ট জায়গায় টিভি ক্যামেরা, ট্রাইপডসহ তৈরি ফোটোগ্রাফাররা, সামনের মেঝেতে ইকুইপমেন্ট। পরের সারিতে রিপোর্টাররা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে চালু করছে রেকর্ডিং ডিভাইস।

জড় হওয়া হাজারো দর্শকের ওপর চোখ বোলাল লো হুয়াং লিটন। কিছুক্ষণ পর খুন হবেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। বিজয়ীর বেশে চিনে ফিরবে সে। এটা ভাবতে গিয়ে খুশিতে হাসি চলে এল তার।

এইমাত্র পৌঁচেছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও চিনা রাষ্ট্রদূত। পুরো তিরিশ সেকেণ্ড ধরে একে অপরের হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন তাঁরা। ছবি তো তুলতে দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। দপদপ করে নানাদিকে জ্বলে উঠছে দামি সব ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট।

পডিয়ামে উঠে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন চিনা দূত। তিনি পিছিয়ে আরামদায়ক চেয়ারে বসার পর পালা এল জাপানি প্রধানমন্ত্রীর। দীর্ঘ বক্তব্য দিতে লাগলেন তিনি। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গর্বিত লো হুয়াং লিটন। একটু পর শেষ হবে এই খেলা।

রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে বারবার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ কুঁচকে ফেলছে হুয়াং। মনে মনে

খুঁজছে মাসুদ রানার রোবটটাকে। আসলে তিনটে রোবট কাজ করছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। রানার মেশিনটা চিৎকার করে বলবে জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না। পরক্ষণেই পিস্তল দিয়ে গুলি করবে সে। সই হয়ে যাওয়ার আগেই হবে ওটা।

পেছনের করিডোরে অপেক্ষা করবে উবোন হিমুরার চেহারার রোবট। পাহারা দেবে ওদিকে। সাহায্য করবে রানার রোবটকে পালিয়ে যেতে। এদিকে সোহেল আহমেদের রোবটকে দেখা যাবে মাত্র ক'মুহূর্তের জন্যে। তবে ক্যামেরায় ধরা পড়বে তার চলাচল। কাজটা বোধহয় এরই ভেতর হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে উবোন হিমুরার কাছ থেকে পাওয়া পুলিশের গাড়ির ড্রাইভিং সিটে ফিরবে ওটা। অন্যদুটো রোবট এলেই রওনা হবে গন্তব্যের দিকে।

গুছিয়ে নেয়া হয়েছে সব। কোথাও কোনও খুঁত নেই।

উনষাট

ভবনের পেছনের করিডোরে অপেক্ষা করছে জাপানি পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরার নকল। ভাবনার সুযোগ নেই, তবে প্রসেসর ভালই জানে, গোলাগুলির পর একটু দূরের ওই দরজা বন্ধ করবে সিকিউরিটির লোক।

তার আগেই সে যাবে পার্কিং লটে। একইসময়ে পৌঁছুবে অন্য দুই রোবট। গাড়ি তৈরি, দেরি হবে না এই এলাকা থেকে সরে যেতে।

আপাতত মানুষকে অনুকরণ করছে হিমুরার রোবট।

পায়চারি বাদ দিয়ে পরখ করল দরজা খোলা কি না। অপটিকাল প্রসেসরে ধরা পড়ল, পেছন থেকে আসছে দুই পরিষ্কার কর্মী। পরনে একই ইউনিফর্ম। দ্বিতীয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোবট বুঝল, এরা বিপজ্জনক নয়। তৃতীয় প্রোগ্রামের কল্যাণে ওদের দিকে চেয়ে হাসল সে, মৃদু বাউ করল।

একইসময়ে আরেক অ্যালগোরিদমের কারণে স্ক্যান করল লোকদু'জনের চেহারা। তখনই প্রসেসর বুঝল, মেমোরিতে আছে ওই দুই মুখ। তবুও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল না নকল হিমুরা। মাথার ক্যাপ এত নিচু করে রেখেছে লোকদুটো, পুরো নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

তাদের তরফ থেকে হামলা হচ্ছে না জেনে, অটল প্রহরীর মত আগের জায়গায় থাকল রোবট। কাজ করছে মানুষ অনুকরণের প্রোগ্রাম। ওখানে লেখা আছে, ঠিক কতক্ষণ পর ফেলবে চোখের পাতা বা হাঁটতে হবে। এত প্রোগ্রাম চালাতে গিয়ে সামান্য ধীর হয়েছে হিমুরা-রোবট। একবার কর্মীদের দেখে নিয়ে তিন সেকেণ্ড পর চোখ সরিয়ে নিল সে। বাম কনুই ওপরে তুলে ডানহাতে খুলতে লাগল কবজির বোতাম।

রোবটের অপটিকাল সেন্সর সম্পূর্ণ মগ্ন বাম কবজির দিকে। সময় গুনছে সিপিইউ। ধারণা নেই কী হচ্ছে।

কিন্তু সবই ঘটছে প্রোগ্রামের অগোচরে।

সত্যিকারের মানুষকে নকল করে হাতা গুটিয়ে নিল রোবট। বড় করে দম ফেলে তাকাল দরজার মাঝের ছোট্ট জানালার দিকে। আর তখনই চোখা কিছুর গুঁতো খেয়ে ঝাঁকি খেল সেন্সরগুলো। ফুটো হয়েছে নিতম্বের প্যাডিং! কাজ করল আত্মরক্ষামূলক প্রোগ্রাম। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল নকল হিমুরা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পিস্তলের দিকে। কিন্তু বাঁট ধরার আগেই থামল প্রতিটি প্রসেসর। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রোবট।

রাবারের গ্লাভ পরা হাতে ওটার নিতম্বের প্যাডিং থেকে

পিন খুলল রানা। ওই পিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তামার তারের কয়েল। ওটা থেকে গেছে পুরো এক শ' ফুট দূরে সরু বৈদ্যুতিক কর্ড। সেটার শেষমাথা ঢুকেছে সকেটে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সোহেল।

রোবটের পেছনে রানা পিন ফুটিয়ে দেয়ায় বাকি কাজ করেছে জাপানিস ইলেকট্রিকাল সিস্টেম। তৈরি হয়েছে সাইক্লিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড।

ব্যথা পেয়ে চমকে প্রতিক্রিয়া দেখায়নি রোবট। ছিল না আগুনের ফুলকি। জ্যাম ধরে যায়নি কোনও কলে। স্রেফ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া কমপিউটারের মত শাট ডাউন করেছে ওটা। বিকল হয়েছে শক খেয়ে। বড় কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে সিপিইউ থেকে মুছে গেছে সব প্রোগ্রাম।

ম্যানিকিনের মত দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওটার চোখের সামনে হাত তুলে দেখল রানা।

নড়নচড়ন নেই।

কর্ড গোটাতে গোটাতে প্রায় দৌড়ে এল সোহেল। 'কী বুঝলি?'

'মাথাটা খারাপ হলেও তুই জিনিয়াস,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'কিন্তু আবারও যদি জেগে ওঠে? পিটিয়ে হাড্ডি গুঁড়ো করে দেবে দু'জনের।'

'যে বেমক্কা শক খেয়েছে, সিপিইউ চালু হলেও দরকারি প্রোগ্রামিং ফাইলের অভাবে এই হিমুরা এখন শিশু।'

'থামাতে হবে আরও দুটোকে,' বলল রানা। 'পেছনের যে ক্লসিটে এসব ইউনিফর্ম পেয়েছি, ওখানে নিয়ে চল এটাকে। হাতে এখনও অনেক কাজ।'

জাপানি প্রাইম মিনিস্টার তাঁর রেলগাড়ির সমান দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লো হুয়াং লিটন।

এবার শুরু হবে সত্যিকারের খেলা।

এল বারোটি দামি কলম। ডেস্কে রাখা হবে একের পর এক ছয় কপি চুক্তিনামা। প্রতিটির কপি সইয়ের পর নেয়া হবে নতুন কলম।

পঞ্চম কপি সই হওয়ার পর চিনা দূতের হাত ফস্কে পড়ে গেল কলম। ঢুকে গেছে টেবিলের তলে। একইসঙ্গে ঝুঁকে কলম তুললেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও চিনা দূত।

হাসি-হাসি মুখে বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'একেই বলে সহযোগিতা।'

খুশি মনে হেসে ফেলল দর্শকরা।

পঞ্চম চুক্তিনামা সই হওয়ার পর টেবিলে দেয়া হলো ষষ্ঠ চুক্তিনামা।

থরথর করে কাঁপছে তার হাত, টের পেল লো হুয়াং। নিশ্চিত হতে ঝট্ করে তাকাল ভিড়ের দিকে। অনেক কাছে চলে এসেছে নকল রানা। ধাক্কা দিয়ে কয়েকজন সাংবাদিককে ঠেলে সরিয়ে পৌঁছে গেল মঞ্চের খুব কাছে। এবার ঝট্ করে বের করবে পিস্তল। কিন্তু গণ্ডগোল বেধে গেছে!

'না! আয়-হায়!' ফিসফিস করল হুয়াং। 'না!'

চুক্তিনামার কাগজে কলম নামালেন প্রধানমন্ত্রী। ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল নকল মাসুদ রানা। তার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে এক ফোটোগ্রাফার। চিৎকার করে উঠল রোবট: 'জাপান কখনও চিনের বন্ধু হবে না!'

পিস্তল তুলেই গুলি করল রোবট, কিন্তু ঠিক তখনই ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেউ। সে সিকিউরিটির কেউ নয়। আসল মাসুদ রানা! পর পর চারটে গুলি করল রোবট। তবে নল নিচু হওয়ায় বুলেট বিঁধল মঞ্চের নিচের পাটাতনে। ভীষণ ভয়ে পালাতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ।

নিজ চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না হুয়াং। মুহূর্তের জন্যে বরফের মূর্তি হলো সে, পরক্ষণে ঘুরেই দৌড় দিল দরজার দিকে।

পেছন থেকে রোবটের পিঠে পিন গেঁথে দিয়েছে রানা। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি ওটার। হাতের প্রচণ্ড এক ঝটকা দিয়ে রানাকে ছিটকে ফেলল নকল রানা।

পাখির পালকের মত কয়েক ফুট উড়ে কয়েকটা খালি চেয়ারের ওপর গিয়ে পড়ল রানা। ঘুরেই আবারও গুলি করল রোবট। কিন্তু ততক্ষণে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে ফেলেছে তাঁর সিকিউরিটি ডিটেইলের সবাই। সরিয়ে নেয়া হচ্ছে তাঁকে। পর পর তিনটে গুলি ফেলে দিল সিক্রেট সার্ভিসের তিন এজেন্টকে। চতুর্থজন পাল্টা গুলি করলেও পরের গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে।

উঠে হাতের পিনের দিকে তাকাল রানা। ঠিক সময়ে বেঁকে বসেছে জিনিসটা। নিশ্চয়ই পালিয়ে যাওয়ার সময় কারও পায়ে লেগে সকেট থেকে খুলে গেছে কর্ড।

একটা চেয়ার তুলে রোবটের পিঠে ভাঙল রানা।

ভারসাম্য হারাল মেশিনটা। তবে মাটিতে পড়ল না, ঘুরেই রানার পেটে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল। উড়ে গিয়ে এক ক্যামেরার ট্রাইপডের ওপর পড়ল রানা। সব ভেঙে হুড়মুড় করে নামল মেঝেতে।

আবারও ঘুরে গুলি করল রোবট। এবার প্রধানমন্ত্রীকে আড়াল দিয়েছে সাধারণ কেউ। একপাশ থেকে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সে। নিজের দেহে নিয়েছে বুলেট।

রোবটের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না, ভাল করেই জানে রানা। উঠে কর্ডের প্লাগ খুঁজে নিল ও। কয়েক পা সরে প্লাগটা গুঁজে দিল এক টিভি ক্যামেরার আউটলেটে।

প্রধানমন্ত্রীর বুকে গুলি করবে বলে সামনে বাড়ছে রোবট। মঞ্চের দিকে দৌড়ে গেল রানা। পিন গেঁথে দিল রোবটের শিরদাঁড়ায়।

বেকায়দা ভঙ্গিতে থামল রোবট। কাজ করছে না

সিপিইউ। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল যন্ত্রমানব। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আবারও শক দিল রানা।

এদিকে বিশাল ঘরে ঢুকেছে পুলিশ ও প্যারামিলিটারি ইউনিট। রানাকে ঘিরে ফেলল কয়েকজন। রোবটের ওপর থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে দাঁড় করাল। ঘুরে চেয়ে থমকে গেল তারা। রানা আর মেঝের লোকটার চেহারা একই! জীবন্ত লোকটাই ঠেকিয়ে দিয়েছে হামলা, নইলে গুলি খেয়ে মরতেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্যাখ্যা দেয়ার সময় রানার নেই। পিনের খোঁচা দিয়ে রোবটের ঘাড়ের ত্বক ছিঁড়ল ও। এক টানে চড়চড় করে তুলে নিল মেশিনের মুখের চামড়া। কাঁচের চোখ চেয়ে রইল ফাঁকা দৃষ্টিতে।

তবুও রানার ওপর থেকে সন্দেহ দূর হওয়ার কারণ নেই। কয়েকজন পুলিশ ঘিরে রেখেছে ওকে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল তাদের গাড়ির দিকে।

কিন্তু তখনই বলে উঠল কে যেন, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

মুখ তুলে তাকাল রানা। এইমাত্র খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকেছেন পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেন্ট হিমুরা। তাঁকে দেখে রানার মনে হলো কবর থেকে উঠেছে ফ্যাকাসে মুখের কোনও লাশ। পরনে এখন অফিশিয়াল পুলিশের জ্যাকেট।

'এত মার খাওয়া চেহারা না দেখলে ভাবতাম আপনিও রোবট,' বলল রানা।

'রোবট হলে এত ব্যথা থাকত না,' বললেন অফিসার।

মৃদু হাসল রানা। 'আপনি কখন এলেন?'

'এসেছি একটু দেরিতে।' রানাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন হিমুরা। ওরা দু'জন উঠে পড়ল মঞ্চে। বিশাল ঘর থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে। হাজির হয়েছে প্যারামেডিকরা। সিকিউরিটি টিম আর সিভিলিয়ান মেয়েটাকে চিকিৎসা দিচ্ছে তারা।

মেয়েটার পাশে বসে নরম সুরে ডাকল রানা, 'হিনা।'

প্রধানমন্ত্রীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে পিঠে গুলি খেয়েছে বেচারি। বিড়বিড় করল, 'আমি তো আগেই বলেছি, ভালই লড়তে পারি।'

'ফুটো হয়েছে ওর ফুসফুস,' জানাল এক প্যারামেডিক। 'বাঁচবে। দেরি না করে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে।'

'দেরি করবেন না,' তাড়া দিলেন হিমুরা।

তুলে দেয়া হলো হিনাকে স্ট্রেচারে। ক'জন মিলে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে।

'নিশ্চয়ই সাঁতরে আসেননি?' জানতে চাইল রানা।

'ভোরের পর এক জেলে-নৌকা পেয়ে ওটা নিয়ে সৈকতে এসেছি,' বললেন হিমুরা, 'থামিনি কোথাও। কিন্তু আইডি তো কেড়ে নিয়েছে, তাই পথে ব্যাখ্যা দিতে দিতে এত দেরি হয়ে গেল। মঞ্চের কাছে আসার আগেই শুনলাম গুলির আওয়াজ। দৌড় শুরু করলেও আমাকে পেছনে ফেলে দিল হিনা।'

'সাহসের কাজ করেছে,' বলল রানা। 'কথা দিয়েছিল বাঁচাবে ডক্টর শিমেযুকে। সেটা পারেনি, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমাকে বাঁচাতে। আর পরে প্রধানমন্ত্রীকে।'

'সাহস আছে মেয়ের,' বললেন হিমুরা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'এবার ঠেকাতে হবে লো হুয়াং লিটনকে। কাজ শেষ হয়নি।'

'হ্যাঁ, একবার চিনে ফিরলে আর কখনও তার টিকি দেখব না।'

'ভাববেন না,' বলল রানা, 'ধরা পড়বে।'

ষাট

গুলি হতেই আর সবার মতই প্রাণভয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে বিলিয়নেয়ার লো হুয়াং লিটন। তার উদ্দেশ্য আলাদা। ছুটছে অন্যদিকে। প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি বেয়ে নেমে ক'জন পুলিশ অফিসারকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গেল নিচতলায়।

এ ঘরের দরজা পাহারা দেয়ার কথা নকল হিমুরার, কিন্তু কোথাও নেই ওটা। খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না হুয়াং, বাইরে যাওয়ার দরজা খুলে ঢুকল পার্কিং লটে।

ভিআইপি লট-এ রয়েছে লিমাযিন। ওদিকে পা বাড়িয়েও থমকে গেল সে। ওই গাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশ অফিসাররা। খোলা হলো ড্রাইভিং দরজা। সিট থেকে টান দিয়ে মেঝেতে ড্রাইভারকে ফেলল এক অফিসার। দু'হাতে আটকে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ।

ঘুরে অন্যদিকে চলল লো হুয়াং। বুঝে গেছে, যে-কোনও সময়ে ধরা পড়বে সে। সহজ হবে না পালিয়ে যাওয়া। তখনই মনে পড়ল, বাইরে গাড়িতে রানা রোবটের জন্যে অপেক্ষা করবে হিমুরা আর সোহেল আহমেদের রোবট। ওগুলোর নির্দেশ ওভাররাইড করতে পারবে সে ভয়েস কমাণ্ড ব্যবহার করে।

প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে পুলিশের গাড়িটা খুঁজতে লাগল বিলিয়নেয়ার। ওটা আছে বেরোবার পথের কাছেই। মাথার ওপর দপ-দপ করে জ্বলছে পুলিশের নীল বাতি। খুশি হলো

হুয়াং। ওই গাড়িতে চেপে চলে যেতে পারবে।

ধীর পায়ে গাড়ির দিকে চলল সে। কাড়তে চাইছে না কারও মনোযোগ। সেডানের পেছন দরজা খুলে উঁকি দিল ভেতরে। আগের নির্দেশ মতই ড্রাইভিং সিটে বসে আছে সোহেল আহমেদের নকল। তবে কোথাও নেই পুলিশ অফিসার হিমুরা। তাতে কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি।

পেছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করল লো হুয়াং লিটন। 'পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যাও। সোজা যাবে ফ্যাক্টরিতে।'

একবার কপ্টারে উঠতে পারলে একঘণ্টায় পেরোতে পারবে জাপানি আকাশ সীমা। তারপর কে ধরে তাকে!

গাড়ির গিয়ার ফেলল নকল সোহেল। এগোতে শুরু করেও থেমে গেল। 'ভাড়া কি নগদে দেবেন না বাকি?'

'কী?'

'ট্র্যান্সপোর্টেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী নগদ দিতে হবে।'

ভুল শুনছে, ভাবছে হুয়াং। রোবটের কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট। ভাল কাজ দেখাতে পারেনি সাবেলা। কড়া সুরে বলল সে, 'ওভাররাইড করো সব প্রোগ্রাম। আমাকে পৌঁছে দাও এনসিআর ফ্যাক্টরিতে। দেরি করবে না!'

পুরনো টিভির মত আওয়াজ বেরোল রোবটের স্পিকার থেকে: 'ইন্সট্রাকশন এরর... এরর... কমপিউট করতে... পারছি না... পারছি না... এরর...'

'আমি লো হুয়াং লিটন,' ধমকে উঠল বিলিয়নেয়ার। 'সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে!'

সামনের সিটের রোবট ঘুরল তার দিকে। হাতে পিস্তল! চওড়া হাসি দিল সোহেল। এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'তুমি আমার বস নও, হুয়াং। আমি সোহেল আহমেদ।'

কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ল বিলিয়নেয়ার। খপ্ করে ধরল দরজার হ্যাণ্ডেল। কিন্তু তখনই গাড়িটা ঘিরে ফেলল একদল পুলিশ অফিসার। নেতৃত্বে সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট উবোন

হিমুরা। সঙ্গে মাসুদ রানা।

বাইরে থেকে হ্যাণ্ডেল খুলে কলার চেপে ধরে হুয়াংকে হ্যাঁচকা টানে বের করল রানা। নরম সুরে বলল, 'বুঝলে, হুয়াং, কাজের নয় তোমার রোবট। একদম বাজে জিনিস।'

শাংহাই-এ যেইন নিং-এর অফিসের টিভিতে জাপানি ওই দুর্ঘটনার লাইভ দেখেছে লিউ ফু-চুং। বারবার দেখানো হচ্ছে একই দৃশ্য। শ্বাসরুদ্ধ স্বরে তথ্য দিচ্ছে ধারাভাষ্যকাররা। বিলিয়নেয়ার হুয়াঙের যন্ত্র-মানবের মুখোশ মাসুদ রানা টেনে খুলে দিতেই চমকে গেছে দুনিয়ার মানুষ।

যথেষ্ট দেখেছে ফু-চুং। 'লাও-শি, ক্ষমতার লোভে বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন আপনি,' বলল ও।

হেলিকপ্টার থেকে তোলা ভিডিয়োতে দেখা গেল ঘিরে ফেলা হয়েছে প্যাভিলিয়ন ভবন। চারপাশে গিজগিজ করছে পুলিশ অফিসার ও মিলিটারির সদস্যরা। উপায় নেই যে পালিয়ে যেতে পারবে লো হুয়াং লিটন।

'আর উপায় ছিল না,' আনমনে বলল বৃদ্ধ রাজনীতিক, 'নইলে আমেরিকার খপ্পর থেকে বের করা যেত না জাপানকে।'

'একবার ভেবেছেন, এসব করে কোথায় নামিয়েছেন মহাচিনকে?'

'ওসব নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, ছোকরা!' কড়া গলায় বলল নিং। 'সব দায় আমি আর লো হুয়াং মাথা পেতে নিলেই মিটে যাবে সব। এবার যাও তো, কয়েক মিনিট শান্তিতে থাকতে দাও।'

'সাগরতলের খনিতে আপনারা কী ধরনের অপারেশন করেছেন, আর কী করেছে লো হুয়াং লিটন— প্রতিটি ফাইল বুঝিয়ে দেবেন আমাকে,' উঠতে উঠতে বলল ফু-চুং।

'পাবে সবই,' বলল বৃদ্ধ। ঘুরে তাকাল টিভি স্ক্রিনের

দিকে। হারিয়ে গেছে উঠে দাঁড়াবার শারীরিক ও মানসিক শক্তি। বিড়বিড় করল, 'অনেক বয়স। এবার বিদায় নেয়াই ভাল।' পাশের ড্রয়ার থেকে কালো একটা কৌটা নিল সে।

লোকটা কী করবে বুঝে গেছে ফু-চুং। বাধা না দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে। যে যা করে, তার দায় তাকেই নিতে হয়। করিডোরে পা রাখার আগে গার্ডদের উদ্দেশে বলল ফু-চুং, 'বিরক্ত করবে না লাও-শিকে। দীর্ঘ বিশ্রামে যাচ্ছেন তিনি।'

মাথা দুলিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল দুই গার্ড।

ছয়টি লাল বড়ি গিলে চেয়ারে হেলান দিল নিং। মাত্র নয় সেকেণ্ডে ঘুমিয়ে পড়ল চিরকালের জন্যে।

নিজেদের অফিস লক্ষ্য করে হেঁটে চলেছে ফু-চুং। আজকের ঘটনায় চেপে গেছে ওর কাঁধে নানান ধরনের জরুরি কাজ।

একষট্টি

সাত দিন পর।

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বিশাল ভবনটাকে বাইরে থেকে দেখে স্বচ্ছ কাঁচের বাড়ি ভাবলেও ভুল হবে না। একটু আগে ওখানে হাজির হয়েছে রানা, সোহেল, আসিফ, তানিয়া, হিনা ও পুলিশ সুপারইন্টেণ্ডেন্ট উবোন হিমুরা।

আধুনিক, রুচিশীল আসবাবপত্রে শোভিত প্রধানমন্ত্রীর অফিসে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অতিথিদেরকে বসাল সুন্দরী

মেইডরা। চলে গেল ঘর ছেড়ে।

একমিনিট পেরোবার আগেই আবারও খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকলেন জাপানি প্রাইম মিনিস্টার। সবার উদ্দেশে বাউ করলেন তিনি।

তাঁকে সম্মান দেখাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাউ করল সবাই।

আগে সবাইকে বসতে ইশারা করলেন প্রধানমন্ত্রী। বসার পর নিজ চেয়ারে বসে হাতের দু'কনুই রাখলেন কাঁচ ঢাকা টেবিলে। নরম সুরে বললেন, 'আমি কৃতজ্ঞ, অনুরোধে সাড়া দিয়ে আজ এসেছেন আপনারা। মিস্টার রানা, মিস্টার আহমেদ, হিনা বা সুপারইন্টেণ্ডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেদিন আপনারা না থাকলে বিদায় নিতাম পৃথিবী ছেড়ে।' একটু থেমে বললেন, 'মিস্টার রেজা এবং তাঁর স্ত্রীর কারণে মস্তবড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে এ বিশ্ব। আমরা জাপানের সবাই আপনাদের কাছে ঋণী।'

চুপ করে আছে অতিথিরা। লিউ ফু-চুং-এর কাছ থেকে জরুরি কিছু তথ্য পেয়েছে রানা। তবে ওরা কেউ জানে না আজ কেন ডাকা হয়েছে ওদেরকে।

'মিস্টার রানা,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার। 'ঠিক আপনার নির্দেশিত জায়গাতেই আমরা পেয়েছি জাতীয় সম্পদ সেসব তলোয়ার। সেজন্যে আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল থাকার কথা। তাই বলছি, লো হুয়াঙের তৈরি রোবট ব্যবহার করেই চিন ও জাপানের প্রকৌশলীরা বন্ধ করেছেন সাগরতলের সব ফাটল। আমরা এখন নিশ্চিত, মানব-সভ্যতা সাগরের নিচে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' বলল সোহেল। 'শুনে খুশি হলাম।'

'আরও কিছু বিষয়ে আলাপ হয়েছিল ফোনে আপনার

সঙ্গে,' বলল রানা। 'সে বিষয়ে কিছু বলবেন, স্যর?'

মৃদু মাথা দোলালেন জাপানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটা। 'আপনার কথা শোনার পর কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। একে একে বলছি।' উবোন হিমুরার দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। উঠে মোটা খাম বাড়িয়ে দিলেন পুলিশ অফিসারের দিকে। 'খুলুন।'

খাম নিয়ে সাবধানে খুললেন হিমুরা। ভেতর থেকে বের করলেন কাগজ। পড়তে শুরু করেছেন। দু'মিনিট পর মুখ তুলে একবার প্রাইম মিনিস্টার আরেকবার রানাকে দেখলেন তিনি। দুই চোখ ভরে গেছে অশ্রুতে।

'মিস্টার রানার কথায় নিয়েছি জরুরি পদক্ষেপ,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার। 'একজন অফিসার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পঙ্গু হলে কেন তাঁকে চাকরি থেকে অবসর দিতে হবে? কেবিনেটের সবার সঙ্গে আলাপের পর ঠিক হলো, দেশের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এমন মানুষগুলোকে পঙ্গু আখ্যা দিয়ে তাঁদের জীবনটা নষ্ট করে দেব না আমরা। হিমুরা, আপনি পড়েছেন নতুন নিয়োগপত্র। এরপর কী করবেন আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। তবে আমি চাই, যোগ দেবেন নাগাসাকির পুলিশ কমিশনার হিসেবে। গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বলে আপনাকে দেয়া হয়েছে একইসময়ে কয়েকটি পদোন্নতি। এ সবই আপনার প্রাপ্য ছিল।'

রানার দিকে চাইলেন হিমুরা। টপটপ করে গালে পড়ল অশ্রু। ভাঙা গলায় বললেন, 'মিস্টার রানা, আপন ভাইও এত করত না আমার জন্যে। দুটো ছেলে-মেয়ে আমার। মানুষ করতে হবে। ভেবেছিলাম শহরের কোনও গলিতে ছোট একটা দোকান নিয়ে বসব। তবে আপনি যা করলেন আমার জন্যে, কখনও শোধ দিতে পারব না, স্যর...' প্রচণ্ড আবেগে মুখ থেকে কথা হারিয়ে গেছে মানুষটার।

'বসে পড়ুন, কমিশনার,' তাঁকে বসতে ইশারা করলেন

প্রাইম মিনিস্টার। উবোন হিমুরা বসার পর বললেন, 'আরও একজন আছে, যার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার কথাও বলেছেন মিস্টার রানা। ভেবে দেখলাম, আইন সামান্য বদলে নিলে ক্ষতি কী?' আরেকটা খাম ড্রয়ার থেকে নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর দিয়ে। 'হিনা, এটা তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?' অবাক হয়েছে মেয়েটা।

'খুলে দেখো কী আছে।'

খাম ছিঁড়ে কাগজ নিয়ে পড়ল হিনা। কপালে উঠল ওর দুই চোখ।

হাসলেন প্রাইম মিনিস্টার। 'আপত্তি না থাকলে যোগ দাও পুলিশ অফিসারের পদে। তুমি চাইলে কাজ জুটিয়ে দেব কমিশনার হিমুরার অফিসেই। ...কী, রাজি?'

একপলক প্রাইম মিনিস্টারকে দেখল হিনা, তারপর চেপে ধরল রানার হাত। 'আপনি কি মানুষ, রানা, না দেবতা?'

'জঘন্য লোক,' মৃদু হাসল রানা। 'এসব করার সাধ্য আমার নেই, সব করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী।'

'তবে খুন হলে কিছুই করতে পারতাম না, তাই আবারও বলছি: আপনাদেরকে ধন্যবাদ,' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

রানা ও প্রাইম মিনিস্টারের উদ্দেশে বলল হিনা, 'অফিসার হিমুরার দোকান করার উপায় ছিল, কিন্তু আমার সে টাকাও নেই।' মাথা নাড়ল। 'ভেবেছিলাম ফিরব ইয়াকুযা দলে। বাকি জীবন পার করব ক্রীতদাসী হিসেবে। ভাবিনি হঠাৎ এভাবে খুলবে জীবনের পথ। আমি আপনাদের সবার কাছেই কৃতজ্ঞ। খুশি মনে কাজ করব হিমুরা স্যারের অফিসে।'

'এবার অন্য বিষয়,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার, 'মিস্টার রানা ও মিস্টার আহমেদ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের অফিসের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা কোনও পুরস্কার নিতে পারবেন না। কিন্তু এ আইন নেই আসিফ রেজা এবং তাঁর স্ত্রী তানিয়া রেজার অফিস নুমায়। তাই তাঁদের জন্যে জাপান থেকে দেয়া হচ্ছে

বিশেষ সম্মাননা।' আবারও চেয়ার ছেড়ে মখমলে মোড়া মাঝারি দুটো ফ্রেম আসিফ ও তানিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

চেয়ার ছেড়ে ও-দুটো নিল স্বামী-স্ত্রী।

'নাগরিকত্ব সনদ,' বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'এটা জাপানের কোটি মানুষের শ্রদ্ধা আপনাদের প্রতি।' আবারও রানা ও সোহেলকে দেখলেন। 'আমাদের কপাল এত ভাল নয় যে মিস্টার রানা ও মিস্টার আহমেদকে এ দেশের মানুষ বলে ধরে নেব। তবে জেনেছি, মানুষের বিপদে তাঁরা জীবন বাজি ধরতেও দ্বিধা করেন না। অনুরোধ করব, তাঁরা যেন ক'টা দিন বেড়িয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।'

খুশি হয়ে রানার দিকে তাকাল সোহেল। আরও কিছু কাজ আছে ওর এ দেশে। হিনাকে কথা দিয়েছে, দু'জন মিলে মেরামত করবে পুরনো একটা গাড়ি।

'আমার আপত্তি নেই,' বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। মৃদু আওয়াজ তুলেছে পকেটে মোবাইল ফোন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কল রিসিভ করল ও। 'জী, স্যর।'

ফোন বিসিআই চিফের।

'জরুরি কাজে ইমিডিয়েটলি ফিরছ সোহেল ও তুমি। নতুন করে অর্গানাইয করবে এ দেশের ড্রাগ লর্ডদের বিরুদ্ধে পুলিশ-বাহিনীকে।' খুট করে কেটে গেল কল।

সোহেলের দিকে তাকাল রানা। 'তোর ছুটি শেষ।'

'আর তোর?'

'আমারও!'

চেয়ে আছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'পরের ফ্লাইটেই দেশে ফিরতে হচ্ছে। তবে কখনও এ দেশে এলে, আপনার সময় থাকলে দেখা করে যাব আমরা।'

'বুঝলাম জরুরি কাজ,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার, 'তবে

আপনারা নিশ্চয়ই চান না আমি অর্ধেক খুন হই? তাই বলছি, লাঞ্চ করবেন আমাদের সঙ্গে। আপনাদের সবার সম্মানে নিজে রান্না করছেন আমার স্ত্রী।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা ও সোহেল।

টুকটাক কথা শুরু হলো সবার ভেতর।

একটু পর এল খাবারের ডাক।

'চলুন, মহিলা খেপে যাওয়ার আগেই আপনাদেরকে নিয়ে যাই ডাইনিং রুমে,' উঠে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে ভাবলেন, সত্যিই সোনা দিয়ে তৈরি এদের অন্তর। বিশেষ করে ওই মাসুদ রানা! খুব ভাল হতো নির্ভর করার মত এমন কাউকে পাশে পেলে!

***